দীপংকর চক্রবর্তী



জন্ম : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪১ মৃত্যু : ২৭ জানুয়ারি ২০১৩

ধ্রুবতারা অস্ত গেলে,
আকাশপটে তবু জ্বলে
লক্ষ তারার মানিক।
আলোর স্বপ্ন বুকে করে
তোমার পদচিহ্ন ধরে
পথ চলবে 'অনীক'।

ফাঁকা

অনীক

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৩
বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ৭-৮

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

যোগাযোগ (হাতে ও ডাকে):
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ
৯৮৩০১৪৩৩৬৫
৯৪৩৩৭২৪৪৬২

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা

ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী।
কলকাতা ৭০০ ০০৯
(ডাক যোগাযোগের জন্য নয়)

❑মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা

❖ পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা ❖

- অনীক প্রতি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়।
- সাধারণ সংখ্যার দাম ১৫ টাকা।
- গ্রাহক চাঁদার হার ১৫০ টাকা। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই গ্রাহক করে নেওয়া হয় এবং বুকপোস্টে পত্রিকা পাঠানো হয়।
- পিপলস বুক সোসাইটি-র প্রযত্নে মানি অর্ডারে/হাতে টাকা পাঠাতে পারেন। চেক হলে তা 'ANEEK' নামে হবে।
- গ্রাহক চাঁদা নবীকরণের ক্ষেত্রে, চাঁদা সময়মতো পরিশোধ না করলে, চাঁদা শেষ হবার পরের সংখ্যা গ্রাহক চাঁদা (১৫০ টাকা) + ভিপি ডাক খরচ (২৫ টাকা) ধরে ভিপি-তে পাঠানো হয়।

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

অনীক : যোগাযোগের ঠিকানা

অনীক । প্রযত্নে : পিপলস্ বুক সোসাইটি । ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট।
কলকাতা - ৭০০ ০০৯ (*ফোন* : ০৩৩-২২১৯-৯২৫৬)

সম্পাদকীয়

আক্রান্ত মানুষ : আক্রান্ত অধিকার

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী মানুষ আক্রান্ত। আক্রান্ত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে। তার মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকার প্রতিদিন সংকুচিত হয়, তার সন্তানের শিক্ষা নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে। সমাজের কোনো কোনো অংশ আবার বিশেষভাবে আক্রান্ত। 'উন্নয়নের স্বার্থে' আদিবাসী-মূলবাসী মানুষের বাসভূমি হয় লুণ্ঠিত, মানুষ হন উচ্ছিন্ন। এই সমাজে নারীর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে থাকে হাজারো বাধা। এসবের বিরুদ্ধে মানুষ যখন রুখে দাঁড়ান, তখন চলে নিপীড়ন। কখনো রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বাহিনীগুলির হাতে— লাঠি, গুলি, জেল, অত্যাচার, এমনকি নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ। কখনো বা সরাসরি শাসক শ্রেণীর হাতে— শ্রমিক-ছাঁটাই থেকে খুন। শুধু জমি আর মানবশ্রম নয়, লুঠ হয়, ধর্ষিত হয় প্রকৃতিও। পরিবেশ চরম দূষিত। জমি সম্পদ-রিক্ত। ভূ-উষ্ণায়ণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে।

সাধারণভাবে এগুলি মুনাফা-তাড়িত পুঁজিবাদের ফল হলেও বিশেষ করে গত দু-দশকের বিশ্বায়নে এতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য পুঁজিবাদ, আরও বিশেষ ভাবে বললে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি এবং তাদের দোসর দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি, এই ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা বিশ্বে— বিশ্বের প্রতিটি কোণের প্রতিটি মানুষকে শোষণ করে বাঁচতে তারা মরিয়া। তাই দরিদ্র মানুষ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বসবাস করবেন, কিন্তু প্রথম বিশ্বের মানুষদের জন্য, তৃতীয় বিশ্বের ধনীদের জন্য, উৎপাদন করবেন নামমাত্র মজুরিতে। প্রথম বিশ্বের ধনীদের জন্য উৎপাদন করতে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের মাটি, জল, বাতাস হবে দূষিত। প্রথম বিশ্বের দেশগুলো তাদের জল সংরক্ষণ করবেন, আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ফসলের মধ্য দিয়ে অতি-মূল্যবান জল চলে যাবে প্রথম বিশ্বে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর খনিজ সম্পদ নামমাত্র মূল্যে চলে যাবে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির ব্যবহারের জন্য, কখনো বা ধনী দেশে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখার প্রয়োজনে। আর এর মূল্য চোকাতে হবে তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে। সেখানকার মানুষ ভুগবেন অপুষ্টিতে, ভগ্নস্বাস্থ্যে, বেকারির জ্বালায়, বাসস্থানহীনতায়, দূষণে। তাদের প্রতিটি অধিকার হবে পদদলিত।

এখানেই শেষ নয়, এই কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের চাই চরম রাজনৈতিক আধিপত্য। প্রতিটি দেশের সরকারকে হতে হবে তাদের তাঁবেদার। তা না হলে কখনো ঘটবে ইরাক, আফগানিস্তান, কখনো লিবিয়া, সিরিয়া। কখনো সরাসরি আক্রমণ, কখনো গুপ্তহত্যা, কখনো ক্যু, কখনো ড্রোন হানা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সরকারগুলিও এই কাজে প্রায়শই তাদের সঙ্গী। সব মিলিয়ে চরম আক্রান্ত মানুষ।

অনীক-এর বর্তমান সংখ্যাটি পরিকল্পিত হয়েছিল 'আক্রান্ত মানুষ, আক্রান্ত মানুষের অধিকার' নিয়ে। আলোচনাটা আমরা করতে চেয়েছি মূলত তথ্যের ভিত্তিতে, প্রধানত আমাদের দেশকে কেন্দ্র করে।

আক্রান্ত দেশ মানে প্রধানত আক্রান্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষ। আগ্রাসী পুঁজিবাদের এই যুগে শ্রমজীবী মানুষকে যে পরিমাণ শোষণ করা হচ্ছে তা মনে করিয়ে দিচ্ছে পুঁজিবাদের প্রথম যুগের কথা। বিগত দীর্ঘ সময় ধরে একদিকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ আর অন্যদিকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং শাসকশ্রেণীগুলির সমাজতন্ত্র-ভীতির কারণে কিছু কিছু অধিকার অর্জন করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষ। সেই অধিকার এখন অনেকাংশেই হাতছাড়া। বিশ্বায়নের দু দশক পর এদেশের শ্রমজীবীদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রী রতন খাসনবিশ, তাঁর প্রবন্ধ 'শ্রমজীবীর ভারতবর্ষ'। শিল্পে, এমনকি সংগঠিত শিল্পেও, শ্রমিকদের উপর শোষণ ও অত্যাচার কীভাবে বাড়ছে, কারখানাগুলি ভরে যাচ্ছে ঠিকা শ্রমিকে— তা নিয়ে আলোচনা

করেছেন শ্রী নব দত্ত। তাঁর প্রবন্ধ 'আক্রান্ত শ্রমিক, আক্রান্ত শ্রমিক আন্দোলন'। আর শ্রমজীবী মানুষদের সংগ্রামের ওপর আক্রমণের কিছু কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রী শ্যামল দাস— প্রবন্ধের নাম 'আক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষ'।

ভারতবর্ষের মতো দেশে শ্রমজীবী মানুষের বেশির ভাগ অংশই কাজ করেন কৃষিতে। কৃষি মানে অন্ন, কৃষি মানে অধিকাংশ মানুষের কর্মসংস্থান। গত কয়েক দশকে এদেশের কৃষি অনেকটাই পাল্টে গেছে, প্রধানত সবুজ বিপ্লবের কারণে। কৃষিতে বহুজাতিকের অনুপ্রবেশ এখন জাঁকালো। এই অবস্থায় কৃষির, কৃষকের সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন শ্রী শুভ্রকেতন বসু 'আক্রান্ত গ্রামবাসী' প্রবন্ধে এবং শ্রী প্রণব দে 'আক্রান্ত কৃষক' প্রবন্ধে।

সাম্প্রতিককালে বিশেষ ভাবে আক্রান্ত এদেশের আদিবাসী-মূলবাসী মানুষ। কখনো 'উন্নয়ন'-এর জন্য, কখনো দেশের খনিজ সম্পদ বেচে দেওয়ার জন্য, কখনো অরণ্য বাঁচানোর নামে তাঁদের বাসস্থান লুঠ করা হচ্ছে। উচ্ছিন্ন মানুষগুলো প্রতিবাদ করলে নেমে আসছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। মাওবাদী আন্দোলন ও তাদের সংহারে রাষ্ট্রীয় হামলা এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আদিবাসী-মূলবাসী মানুষের ওপর আক্রমণের কথা লিখেছেন শ্রী বিশ্বজিৎ রায় তাঁর 'আক্রান্ত আদিবাসী-মূলবাসী' প্রবন্ধে।

আগেই বলেছি, পুঁজিবাদী মুনাফা অর্জিত হয় একদিকে মানুষের শ্রম আর অন্যদিকে প্রকৃতিকে অতি-শোষণ করে। সেই শোষণ বিশ্বের নানা অঞ্চলে নানা রূপ ধারণ করে। কিন্তু ফল একই— বিপন্ন আমাদের বিশ্ব, বিপন্ন পরিবেশ। 'আক্রান্ত পরিবেশ' রচনায় এ বিষয়ে লিখেছেন শ্রী শুভাশিস মুখোপাধ্যায়।

মানুষের মতো বাঁচতে গেলে প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য। একদিকে প্রথম বিশ্বের প্রায় সমমানের বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা, অন্যদিকে প্রায় কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা ছাড়াই অপুষ্ট, রোগজর্জরিত মানুষের কোনোমতে বেঁচে থাকা। তার ওপর বিশ্বায়িত ব্যবস্থার নতুন নতুন আক্রমণ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে। পুরনো সমাজের যেটুকু সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা চলে যাচ্ছে, অথচ নতুন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্য-জনস্বাস্থ্য হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদী আক্রমণের একটা বড় ক্ষেত্র। এ নিয়ে লিখেছেন শ্রী সিদ্ধার্থ গুপ্ত, রচনার নাম 'আক্রান্ত স্বদেশ : আক্রান্ত জনস্বাস্থ্য'।

আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশের হাতে, মূলত কেরানি তৈরি উদ্দেশ্যে। আজকের বিশ্বায়িত ভারতে বহুজাতিক ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির প্রয়োজন সিদ্ধ করতে তাকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে লিখেছেন শ্রী দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী। লেখাটির নাম : 'শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার নিয়ে এত নাচানাচি কেন?'

বর্তমান বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের ওপর শোষণ শ্রমজীবী মানুষ মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে— এমন নয়। বিশ্ব জুড়েই চলছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। কখনো তা লাতিন আমেরিকায় শাভেজের পথ ধরে, কখনো ভারতের মধ্যাঞ্চলে মাওবাদীদের হাত ধরে, কখনো গণ-আন্দোলনের পথে। মানুষের প্রতিবাদ স্তব্ধ করতে হলে এই আন্দোলনগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এই কাজে রাষ্ট্র আনে নানান কালা কানুন। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রী অমিতদ্যুতি কুমার, 'কালা কানুন: সাদা চোখে' প্রবন্ধে এবং নারায়ণ সরকার, 'অধিকার হননের কালা হাতিয়ার: ইউএপিএ' প্রবন্ধে।

নারীদের উপর যে শোষণ-নিপীড়নের বাড়তি মাত্রা আছে সেটি সমাজজীবনের এক বিশেষ দিক। বিশ্বায়ন এই শোষণকে তীব্রতর করেছে। কিন্তু গত ডিসেম্বরে দিল্লীর ধর্ষণ কাণ্ড ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন নারীর জীবনের এই বিশেষ দিকটিকে প্রবলভাবে সামনে এনে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সংখ্যায় আমরা নারীর ওপর আক্রমণের এই বিশেষ দিকটিই নির্দিষ্ট করি। এ বিষয়ে তিনটি রচনা প্রকাশিত হলো। লেখক শ্রী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী মিতা দত্ত ও শ্রী সোমা মারিক— শেষোক্তটি অন্যত্র প্রকাশিত, আমরা তার অনুবাদ প্রকাশ করলাম।

এছাড়া থাকছে ঘটনাপ্রবাহ, দৃষ্টিকোণ, কবিতা।

সবশেষে বলি, এ সংখ্যার বিশেষ রচনাটির কথা। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরেই ভারত-চীন সম্পর্ক ও ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা লেখালেখি করে এসেছেন। নতুন কিছু তথ্যের প্রেক্ষিতে সেই বিষয়টি নিয়ে নতুন লেখার প্রয়োজন অনুভব করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। তাঁর এই শেষ রচনাটি আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করছি। এবারের মূল বিষয় নিয়েও তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করছিলেন। অসমাপ্ত সেই লেখাটি আমরা এখনও উদ্ধার করতে পারি নি।

এই সংখ্যা প্রকাশে বিশেষ সাহায্যের জন্য প্রেসের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

আর ধন্যবাদ জানাই অগণিত শুভানুধ্যায়ীকে, যাঁরা এই কঠিন সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়াচ্ছেন। সবার কাছে আমাদের অনুরোধ, শুধু অনুরোধ নয়— দাবি, *অনীক*-এর চলার পথে আমাদের পাশে থাকুন। *অনীক* তো শুধু *অনীক* সম্পাদকমণ্ডলীর কর্মীদের নয়, *অনীক* তার সব পাঠকের, বাম আন্দোলনের।

॥ শেষ রচনা ॥

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য

দীপংকর চক্রবর্তী

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ ও যুদ্ধের কথিত কাহিনী

গত নভেম্বরে ১৯৬২-র ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। এই সীমান্ত বিরোধ প্রাথমিকভাবে বাস্তবত শুরু হয়েছিল ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকে, কিন্তু বিরোধের মীমাংসা না হওয়ায় তা চলেছিল এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, এবং শেষ পর্যন্ত তীব্রভাবে তার বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৬২-র ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধে। যদিও পরবর্তীকালে নতুন করে তেমন উল্লেখযোগ্য সীমান্ত সংঘর্ষ আর ঘটে নি, সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধানও হয় নি। সাধারণত যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষই প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যবিশিষ্ট এই দু'টি দেশের মধ্যে এধরনের বিরোধ জিইয়ে রাখার বিরোধিতা করবেন, এবং বিরোধের গভীরে গিয়ে তার মূল কারণগুলিকে খুঁজে বের করতে এবং তার একটি যুক্তিসম্মত ও দু'পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মুস্কিল হচ্ছে, চীনের দিক থেকে সব সময় আলোচনার মাধ্যমে বিরোধটি মিটিয়ে নেবার প্রস্তাব এলেও ভারতের শাসকবর্গ প্রথম থেকেই কার্যত তার বিরোধিতা করে এসেছে। তা না হলে এই বিরোধের মীমাংসা না হবার কোনো যুক্তিই ছিল না। অথচ আমরা ভারতীয়রা অধিকাংশই, আমাদের শাসকদের প্রতি হাজার রকম ন্যায্য অভিযোগ থাকলেও, শাসকশ্রেণীর গড়ে-তোলা উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যায় ভেসে গিয়ে সে পথ এতদিন পরিহার করে এসেছি। তাই আজও অধিকাংশক্ষেত্রে নতুন করে পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই সংঘর্ষের ঘটনা স্মরণ করা হচ্ছে বিকৃতভাবে— সে ঘটনা থেকে ইতিবাচক শিক্ষা নেবার জন্য নয়, বরং সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে নতুন করে উগ্র ও জঙ্গি জাতীয়তাবাদ খুঁচিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে —যাতে করে সেইসময়কার প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে মূলত অজ্ঞ বর্তমান প্রজন্মের মানুষকে অজ্ঞতার ও জঙ্গি জাতীয়তাবাদের মোহে এখনও আবিষ্ট করে রেখে বাস্তবকে মুছে ফেলা যায়। অথচ এই ঘটনাটিকেই সামনে রেখেই সে-সময় আমাদের দেশের সরকার কর্তৃক অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ-অনুসারী বা সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারমূলক ভ্রান্ত নীতির পুনর্বিচারের ভিত্তিতে আজ সঠিক অবস্থানে পৌঁছোনোর চেষ্টা করা যেতো। দুঃখজনক হলেও ঘটনা এটাই যে, সেটা হয় নি। এ ব্যাপারে যুক্তিযুক্তভাবেই যাঁরা উদ্যোগ নিতে পারতেন, এবং সে সময় চরম সীমান্ত-বিরোধ ও যুদ্ধ চলাকালীন এ নিয়ে তাঁদের অনেকে সোচ্চার ছিলেন এবং সেজন্য 'দেশদ্রোহী' অপবাদ ও শাস্তি পর্যন্ত ভোগ করেছেন, সেই বামপন্থীরাও তেমন কোনো ভূমিকা নিলেন না। সংসদীয় বামপন্থীরা তো নন‌ই, এমনকি যাঁরা সংসদীয় ব্যবস্থাতে অংশ নিলেও সংসদীয় পথে মুক্তি আসবে বলে মনে করেন না, কিংবা সংসদ নীতিগতভাবে বয়কট করে শুধুমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা পর্যন্ত সে কাজটা করার জন্য এগিয়ে এলেন না। উপরন্তু সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-প্রণোদিত সর্বনেশে জনগণবিরোধী নিও-লিবারাল অর্থনৈতিক পন্থার বিরুদ্ধে সংসদীয় বামপন্থীদের মেরুদণ্ডহীন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদের কিংবা এমনকি ক্ষমতাসীন অবস্থার স্বার্থে ব্যাপক মেহনতি মানুষের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণের পরিণতিতে 'বামপন্থা' সম্পর্কেই ব্যাপক মানুষের যখন প্রশ্ন ও সমালোচনা জাগছে, তখন সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৬২-র ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে গুপ্ত গহ্বর থেকে নতুন করে বেরিয়ে পড়ছে দক্ষিণপন্থী প্রতিবিপ্লবী দৈত্যদানবেরা, বামপন্থার বিরুদ্ধে বা মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণী কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে প্রচারিত চরম মিথ্যে বা অর্ধ-সত্যের মোহজালে মানুষকে আবদ্ধ রাখার নতুন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শকেই কলঙ্কিত করার সুযোগ নিচ্ছে।

এই পটভূমিতেই জরুরি হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক প্রকৃত তথ্যগুলিকে, বিভিন্ন সময়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে প্রকাশিত অভিমতগুলিকে, বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের সামনে আর একবার তুলে ধরা। এই প্রক্রিয়া অবশ্য আমরা দু'বছর আগেই শুরু করেছি (দ্রষ্টব্য: দীপংকর চক্রবর্তী : 'প্রসঙ্গ: ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ', *অনীক*, জুন ২০১২)। চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বৃটিশ সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সওয়েল এবং ভারতীয় কূটনীতিবিদ করুণাকর গুপ্ত ও লেখক-সাংবাদিক এ জি নুরানি প্রভৃতিদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের ভিত্তিতে লেখা *অনীক*-এ প্রকাশিত উল্লেখিত প্রবন্ধটিতে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছিল যে, ১৯৪৭-পূর্ববর্তী সময়কালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ঔপনিবেশিক ভারতের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য সেই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী থেকে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনুসরণ করে অধিকৃত ভূখণ্ডের আয়তন বাড়াবার চেষ্টা চালিয়েছে— কখনও

গরম, কখনও বা একটু নরম নীতি নিয়ে। ১৯৪৭-এ তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবার সময় পর্যন্ত ভারতের উত্তর দিকে একমাত্র মধ্যাঞ্চল বাদে উত্তর-পশ্চিমে বা উত্তর-পূর্বে ভারতের সাথে চীনের সীমান্ত ছিল অনির্দিষ্ট ও অচিহ্নিত। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষিত হবার আগে পর্যন্ত ভারতের নেতৃবৃন্দ ভারতের সীমান্ত নিয়ে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরোধিতা করে এলেও, বিস্ময়করভাবে ১৯৪৭-এ ক্ষমতাসীন হবার পর কংগ্রেস সরকার ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী সীমান্ত-নীতিকে বিনা দ্বিধাতেই গ্রহণ করে বসলো। যার ফলে এমনকি নেহরুর বন্ধু বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টয়েনবি পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: ''ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরি এইসব সীমান্তরেখাকে বর্তমানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্য বলে আঁকড়ে ধরা হচ্ছে।''

প্রথম থেকেই কংগ্রেস সরকার চীনের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এককভাবে এতোদিনকার বিতর্কিত এবং ইচ্ছেমতো পরিবর্তিত সীমান্তরেখার ভিত্তিতে বিরাট ভূখণ্ড একতরফাভাবে নিজেদের বলে দাবি করেই শুধু থেমে থাকে নি, বস্তুত বহুক্ষেত্রে তারা বৃটিশদের দাবির চেয়েও বেশি সেটাকে নিজেদের মানচিত্রে ঢুকিয়ে নিয়েছে এবং গায়ের জোরে এগিয়ে যাবার নীতি অনুসরণ করে সৈন্য পাঠিয়ে সেখানে অধিকার কায়েম করতে চেষ্টা করেছে। এমনকি ১৯৫৪ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে 'পঞ্চশীল' চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর দু'দেশের সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠা সত্ত্বেও ভারত সরকারের অবস্থান ছিল : ''আমাদের উত্তর সীমান্তকে এক দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট সীমান্ত বলে গণ্য করা উচিত, এবং এ নিয়ে কারো সঙ্গে কোনোরকম আলোচনায় বসতে আমরা রাজি নই।'' আসলে এটা ছিলো সংঘর্ষের পথ— এই পথ তৈরি করেছেন নেহরু এবং তার উপদেষ্টারা, কোনো জাগ্রত জনমত এ ব্যাপারে তখন চাপ সৃষ্টি করেনি। পরবর্তীকাল রাজনৈতিক চাপের জন্য নেহরুর পক্ষে এই পথ ত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল বটে, তবে এ জন্য দায়িত্ব নেহরুরই— সামনে খোলা থেকেছে শুধু এই দাবিকে গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত করার পথ।

অন্যদিকে প্রথম থেকেই সমস্ত প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রেই ১৯৪৯-পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক চীনের অনুসৃত নীতি ছিল : অতীতের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের ধারাবাহিকতা অস্বীকার করে প্রত্যেকের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বাস্তবসম্মতভাবে এবং সীমান্ত অনির্দিষ্ট ধরে নিয়ে বিরোধের সমস্ত প্রশ্নে নতুন করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা ও সীমান্ত নির্দিষ্ট করে নেওয়া। অর্থাৎ সীমান্ত প্রশ্নে ভারত ও চীন প্রথম থেকেই মূলগতভাবে এক পরস্পর-বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছে। ১৯৫৯-এর পর থেকেই ভারতের এই 'এগিয়ে যাবার নীতি'-র পরিণতিতে বারবার সীমান্ত-সংঘর্ষ ঘটেছে। চীন প্রতিবাদ জানিয়ে বারংবার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছে, এমনকি স্থিতাবস্থাকে মেনে নিয়ে সমস্যার সমাধানে পৌঁছোবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। তবু ভারত সরকার নিজেদের অনমনীয় মনোভাব থেকে সরতে রাজি হয় নি। ১৯৬০-এ চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই আলোচনার জন্য ভারতে এসে খোলাখুলিভাবে জানিয়েছিলেন, ''আপনাদের অধিকারে যা আছে তা আপনাদেরই থাক; যে অংশ নিয়ে বিরোধ আছে, অথচ বাস্তবত যেটা কারও অধিকারে নেই, সেটাও আপনারা নিন; আমাদের অধিকারে যেটুকু আছে, সেটুকু শুধু আমাদের থাক।''সেটাও ভারত সরকার মানে নি। এবং এরই পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত ঘটেছে সীমান্ত-যুদ্ধ।

চীন শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, ভারত সরকার কিছুতেই বলপ্রয়োগের পথ ছেড়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় আসবে না। কারণ, একদিকে স্বাধীনতার দেড় দশক পরেও ভারত অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়ে গেছে, জনগণের বিক্ষোভকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া ভারতের শাসকশ্রেণীর কাছে জরুরি হয়ে উঠেছে; অন্য দিকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে ক্রমাগত সংঘর্ষের পথে ঠেলছে, এবং তাদের লবি ভারতে ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে। তখন চীন সিদ্ধান্ত নিতে কার্যত বাধ্য হয়েছে যে, ভারতকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে চীনও দরকার হলে শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে পিছু-পা হবে না। ১৯৬২-র ৯ অক্টোবরে ভারত 'অপারেশন লেগহর্ণ' শুরু করে ভারত সীমান্তে এগোতে শুরু করে। চীন পাল্টা প্রতিরোধে সে আক্রমণকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে আবার যুদ্ধের পথ ছেড়ে আলোচনায় আসার জন্য ভারতের কাছে প্রস্তাব পাঠায়। নেহরু সাংবাদিকদের জানান, চীনা সৈন্যদের 'হটিয়ে দেবার জন্য' ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চীনের দিক থেকে একমাত্র/বিকল্প পন্থা হয়ে দাঁড়ালো— ভারতের চ্যালেঞ্জকে এমন প্রচণ্ড শক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে পাল্টা আঘাত হেনে প্রতিহত করতে হবে, যাতে সেটা হয় খুবই ব্যাপক ও 'চৈতন্য-উদয়কারী', এবং ''যুদ্ধের অবসান ঘটে''। ১৯শে অক্টোবর রাতে চীনের সেনাবাহিনী পাল্টা আঘাত শুরু করে। ২০শে অক্টোবর ভোর থেকে অগ্রসরমান ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয় উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দুই সীমান্তেই। সর্বত্রই ভারতীয় সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

ততদিনে ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছে। নাগরিকদের সমস্ত অধিকার বাতিল করা হয়েছে। চীন-বিরোধী জঙ্গি জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ''বিদেশ থেকে সামরিক সাহায্য নেওয়া নিরপেক্ষতা নীতির বিরোধী''— নেহরু তাঁর সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। তৃতীয় বিশ্বের কোনো

দেশই ভারতের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইজরায়েল, ফরমোজা প্রভৃতি দেশের কাছে ভারত সামরিক সাহায্যের জন্য হাত পেতেছে। প্রতিদিন আটটি মার্কিন জেট প্লেন ভর্তি মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্র এসেছে। ব্রিটেন থেকে সামরিক সাহায্য এসেছে। নেহরুর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মার্কিন প্লেনবাহী জাহাজ ভারত মহাসাগরের দিকে পাঠিয়েছে, এক স্কোয়াড্রন সি-১৩০ টার্বো জেট প্লেন ভারতে পৌঁছে গেছে। এদিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বিরাট ভারতীয় ভূখণ্ড জয় করে নিয়ে চীনা সৈন্যরা যখন ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, তখন সবাই ধরে নিল যে, চীন এই বিশাল ভূখণ্ড দখল করে রাখবে। কিন্তু বিজয়ের সেই চরম মুহূর্তে, ২০শে নভেম্বর রাতে চৌ এন-লাই চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তের কথা জানালেন, এবং ঘোষণা করলেন— ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত থেকে চীনা সৈন্যরা সমগ্র ভারত-চীন সীমান্তে যুদ্ধ-বিরতির সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে শুরু করবে; চীনা সৈন্যরা এই সীমান্ত-যুদ্ধে অধিকৃত সমস্ত ভারতীয় ভূখণ্ড ছেড়ে ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখের বাস্তব অবস্থার ২০ কিলোমিটার পেছনে সরে আসবে। আসলে এই প্রস্তাবই চীন আগে করেছিল, তখন ভারত সেটা মানতে রাজি হয় নি। তবে তফাৎ হলো এই যে, এটা এখন আর একটি প্রস্তাব মাত্র রইলো না। চীন একাই এই প্রস্তাব কার্যকর করতে শুরু করলো, এবং ভারতকে আবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল— ভারত সীমান্তে 'এগিয়ে যাবার নীতি'কে আবার কার্যকর করতে গেলে, ''চীনেরও অধিকার থাকবে পাল্টা আঘাত হানার''। যুদ্ধের অবসান ঘটলো। বিশ্বখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল সীমান্ত-প্রশ্নে ভারতের মিথ্যে অবস্থান ও মিথ্যে প্রচারের ফানুসকে ফুটো করে দিয়ে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ''চীনের অবস্থান আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সঠিক... বিজয় অর্জন করার পরেও কোনো সেনা-বাহিনীকে তাদের নিজেদের সরকারই থামিয়ে দিয়েছে— এরকম আর কোনো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।''

আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর প্রচারিত মিথ্যের মোহজাল ছিঁড়ে ফেলে এই নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরে ব্যাপক মানুষের সামনে তাদের প্রকৃত স্বরূপটি উদঘাটিত করাটা এই মুহূর্তে প্রত্যেক সচেতন ও গণতান্ত্রিক শক্তিরই মৌলিক দায়িত্ব। ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : সীমান্ত-প্রশ্নে চীনের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছোতে ভারত সরকার এতো অনিচ্ছুক ছিল কেন? আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ফেলিক্স গ্রীন এ প্রশ্নের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন : এই জটিল প্রশ্নের উত্তর সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কিত কূট-তর্কের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ভারতের শাসকশ্রেণীর সংকটের মধ্যে। ভারত ও চীন স্বাধীনতালাভ করেছে প্রায় একই সময়ে। তবু পরবর্তী এক দশকে চীনের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল, তার তুলনায় ভারত ছিল অনেক পিছিয়ে, ভারতের ব্যাপক মানুষ সে উপলব্ধিতে পৌঁছোতে শুরুও করেছিলেন। ফলত ভারত-চীন বিরোধের মূলে আসলে যা ছিল এক বিরল মুহূর্তে তার প্রকৃত উত্তরটা দিয়ে গেছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ : ''চীনের সাথে যুদ্ধ কার স্বার্থে? বৃহৎ শিল্পপতিদের মুনাফা, ক্ষমতালাভের জন্য খেয়োখেয়ি এবং শাসকদলের প্রসাদ লাভের জন্য হুড়োহুড়িকে টিকিয়ে রাখার জন্যই কি?''(রোনাল্ড সেগাল : *দি ক্রাইসিস অফ ইণ্ডিয়া*, পৃ. ২৯৪)

এর সাত বছর পর *ভারতের চীনযুদ্ধ* গ্রন্থে এর বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে এই বাস্তব অবস্থাটিকেই তুলে ধরেছিলেন নেভিল ম্যাক্সওয়েল : ''চীনের সীমান্ত-নীতি সম্পর্কে যে ভুল ধারণার উদ্ভব হয়েছে, তার একটি বিশেষ কারণ এই যে, ...অধিকাংশ ভারতীয়ই বস্তুত জানেন না যে, কীভাবে নেহরু ও তাঁর ক্ষমতালোলুপ আমলারা সীমান্ত-বিরোধ বাধিয়ে তুলে তার মীমাংসাকে অসম্ভব করে তোলেন, এবং শেষে একটি সশস্ত্র সংঘর্ষের সৃষ্টি করেন''(*চায়না নাউ*/লন্ডন/মে ১৯৭০ সংখ্যা)। প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে চীনের সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধ নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর ও বাস্তবসম্মত মীমাংসার পথে যেতে ভারত সরকারের অস্বীকৃতিই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই মীমাংসার পথে প্রধান বাধা। এই বাস্তব সত্যটির উপলব্ধিই নেহরু-ইন্দিরা রাজীব জমানার পরে ১৯৯৩-এ প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওকে বাধ্য করেছিল ভারত সরকারের প্রাসঙ্গিক অনমনীয় অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন আনতে। বাস্তবে যে যেখানে আছে সেখানেই যাতে থেকে যায় এবং সীমান্তে শান্তি বজায় থাকে, সেজন্য তিনি চীনের সঙ্গে একটা 'স্ট্যান্ড-স্টিল চুক্তি' সম্পাদন করে সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার পর থেকে সীমান্ত নিয়ে অফিসার পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ধীরগতিতে হলেও চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নেহরুর জমানার প্রাসঙ্গিক অনমনীয় অবস্থান (''ভারত-চীন সীমান্ত সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়— সীমান্তের বিন্যাস নিয়ে কোনোরকম আলোচনা বা দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না'') পরিবর্তিত না করা পর্যন্ত সেই আলোচনায় প্রকৃত অর্থে অগ্রগতি ঘটা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ এক কথায়, যতদিন ভারত সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনুসৃত পথ ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ ও কার্যকর করার অবস্থানের মৌলিক ভ্রান্তি নৈতিক ভাবে স্বীকার না করবে— ততদিন তাই ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না।

সম্প্রতি-উদঘাটিত আরও বক্তব্য

সম্প্রতিকালে প্রচলিত রীতি অনুসারে এতদিন সরকারি বিধি-নিষেধের অজুহাতে অপ্রকাশিত কিছু সরকারি তথ্য এবং ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের ৫০ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে কিছু নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। তার আলোকে এই সীমান্ত বিরোধের ছবিটি আমরা আরেকটু স্পষ্টভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে পারি।

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই বি আর আম্বেদকর যে কোনো দু'টি দেশের মধ্যে সীমান্ত-সম্পর্কিত বিরোধের বিষয়ে একটি সঠিক মন্তব্য করেছিলেন : "(দু'দেশের) *সীমান্ত চিহ্নিত করাটা সার্ভেয়ারদের কাজ, আর সীমান্ত কী হবে তা ঠিক করেন দেশনেতারাই।*" আমরা এই সঠিক মন্তব্যের আলোকে প্রকৃত বাস্তবকে উপলব্ধি করতে পারি নতুন করে কয়েকটি আত্মানুসন্ধানী প্রশ্ন দিয়ে : চীন কি সত্যিসত্যি এই বিরোধের মীমাংসা চেয়েছিল? যদি না চেয়ে থাকে, তাহলে চীনের কি এ ব্যাপারে এমন কোনো বিশেষ স্বার্থ ছিল, যে কারণে তারা এই বিরোধের মীমাংসা চায় নি? তাদের দিক থেকে শেষ পর্যন্ত ১৯৬২-র সামরিক অভিযান চালিয়ে ভারতকে পর্যুদস্ত করার, এবং আবার তাদের অধিকৃত ভারতের বিশাল ভূখণ্ড বিস্ময়করভাবে এককভাবে ছেড়ে দেবার যুক্তি কী ছিল? কিংবা ভারতের দিক থেকেও কি সংঘর্ষের পথ পরিহার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল? যদি সত্যিসত্যি থাকে, তবে তাদের 'এগিয়ে যাবার নীতি' (the Forward Policy) গ্রহণের যুক্তি কী ছিল? চীনের সামরিক অভিযানের পিছনে এই নীতির কী কোনো ভূমিকা ছিল? আমাদের উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট যে, এই প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক উত্তরটা যাবে ভারতের বিরুদ্ধে।

আর অন্যদিকে চীনের প্রেক্ষিত থেকে দেখলে ধরা পড়বে, চীন তার প্রত্যেক প্রতিবেশী দেশের সাথে (অবশ্যই ভারত বাদে) শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত-সম্পর্কিত চুক্তি করেছে। পুরোনো তথ্য ঘাঁটলে ধরা পড়বে, তারা সেক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছে: (এক) সীমান্ত নিয়ে মতপার্থক্যের সমাধান করে সীমানাটা ঠিক কী হবে সে সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছে চুক্তি (পাকিস্তান:১৯৬৩); (দুই) অন্য দেশের সাথে যৌথ কমিটি তৈরি করে তার ঐকমত্য সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চুক্তি (মায়নামার:১৯৬০, নেপাল:১৯৬০); এবং (তিন) এধরনের কোনো প্রারম্ভিক ভূমিকা ছাড়াই চুক্তি (মঙ্গোলিয়া-১৯৬৩, আফগানিস্তান-১৯৬৩); তাছাড়াও এই সব বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে চুক্তি : সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৯১), কাজাকিস্তান (১৯৯৪), রাশিয়া (১৯৯৪), ভূটান (১৯৯৮)। সাধারণভাবে এই সব চুক্তির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান ছিল এই যে, অতীতে সাম্রাজ্যবাদীরা বা চীনের শক্তিশালী কোনো প্রতিবেশী দেশ গায়ের জোরে যে সব চুক্তি চীনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলিকে নীতিগতভাবে তারা মানবে না, কিন্তু বর্তমানে সেটাই যদি বাস্তব পরিস্থিতি হয় (এমনকি তা সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ধারিত অতীতের স্বীকার-না-করা সীমান্ত হলেও), তবে সেটাও তারা মেনে নেবে, কিন্তু সেজন্য তাদের সাথে নতুন করে চুক্তি করতে হবে। ভারতের সাথে সীমান্ত নিয়ে বিরোধের ক্ষেত্রেও তারা সেই একই নীতি প্রথম থেকে অনুসরণ করে এসেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, চীনের তখন অনুসৃত সাধারণ নীতি অনুসারেও, তাদের মৌলিক স্বার্থই জড়িত ছিল প্রতিবেশীদের সাথে অশান্তি বা সংঘর্ষের পথ পরিহার করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সদ্য-স্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। সেই উদ্দেশ্যেই তারা জোর দিয়েছিল পঞ্চশীল নীতি ও জোট-নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর উপর। ভারতের কাছে সীমান্ত বিরোধের সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব পাঠাবার সময় তারা তাই বার বার সে কথা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করে গেছে। তাই, সেসময় কেউ (সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অনুচররা এবং ভারতের দক্ষিণপন্থীরা ছাড়া) এমন অভিযোগ তুলতে পারে নি যে, চীন গায়ের জোরে কিছু চাপিয়ে দেবার পথ নিচ্ছে।

তাহলে চীন কেন ১৯৬২-র নভেম্বরে ভারতে সামরিক অভিযান চালিয়ে বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করলো, আবার নিজেরাই পিছিয়ে গিয়ে পূর্ব-স্বীকৃত অবস্থানে ফিরে গেল। এ প্রশ্নের যে উত্তর সে সময় নেভিল ম্যাক্সওয়েল, ফেলিক্স গ্রীন প্রভৃতিরা দিয়েছিলেন, যেটা আমরা একটু আগেই দেখেছি, তারই আরও গোপন তথ্যভিত্তিক প্রমাণ নতুন করে মিলেছে সদ্য-উদঘাটিত বিভিন্ন তথ্য থেকে। যেমন, দিল্লীর নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত *আর কে নেহরু পেপার্স* (আর কে নেহরু ছিলেন ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের চরম পর্যায়ে— ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩— ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি জেনারেল) থেকে ধরা পড়েছে যে, চীনের তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতার প্রচারিত কাহিনী ছিল নিতান্তই মিথ বা আজগুবি প্রচার; এমনকি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর যে 'আদর্শবাদী' রোম্যান্টিক অবস্থানকে তখনকার ভারতীয় দক্ষিণপন্থীরা ভারতের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করতো, তারও কোনো ভিত্তি নেই। আর কে নেহরু ১৯৬১ সালে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে চীনের সাথে আলোচনার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে পিকিং-এ চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই-এর সাথে কথা বলেন, এবং ২০ জুলাই দিল্লীতে ফিরে জানান, "চীন সরকার যে আন্তরিকতার সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসা চাইছেন, তাতে সন্দেহ

নেই'' (This Day That Age, *The Hindu*, July 21,1961)। সীমান্ত বিরোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলিতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্তরের গোপন তথ্য-সম্বলিত বি কে নেহরুর এযাবৎকাল অপ্রকাশিত তিনটি নথি থেকে এ জি নুরানি তাঁর সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে(A.G. Noorani, A Nehru Dissents, *Frontline*, June 30-July 13,2012) উদ্ধৃত করেছেন : (1). An undated paper "*India & China: Policy Alternatives*", 2. A paper entitled "*Our China Policy: A Policy Alternative*", (2). A paper entitled "*Our China Policy: A Personal Assessment*" dated July 30, 1968, (3). The transcript of *his interview on July 1, 1971, by B.R. Nanda, Director, NMML*, in its Oral History Programme), তা থেকে আমাদের এতদিনকার ধারণাই নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে।

আর কে নেহরু নিজেই মূল প্রশ্নটি উত্থাপিত করেছেন: ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধে ভারতের অবস্থান ও অনুসৃত নীতি ভুল বলে প্রমাণিত হলো কেন? তাঁর সিদ্ধান্ত : ১৯৬০-এর আগে পর্যন্ত ঠিক কতোটা ভূখণ্ড ভারতের, সে-সম্পর্কে ভারত সরকারেরই খুব স্পষ্ট ধারণা বা অবস্থান ছিল না। কিন্তু চীনের দিক থেকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে উদ্যোগের অভাব ছিল, এমনটা বলা যাবে না। "১৯৫৩-তেও আমাদের বিশেষজ্ঞদের অভিমত ছিল: আকসাই চীন সম্পর্কে আমাদের দাবি খুব যুক্তিযুক্ত ছিল না... আমার এ-ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, তখন যদি সীমান্ত নিয়ে আলোচনা আমরা শুরু করতাম, তবে আকসাই চীন এবং দু-একটি জায়গায় সামান্য পরিবর্তনের ভিত্তিতে চীন আমাদের সীমান্ত সম্পর্কিত অবস্থান মেনে নিত। নেহরুও তখন এরকমটাই মনে করছিলেন। নেহরুর তখন পর্যন্ত সমস্ত বক্তব্যে মূলত জোর দেওয়া হয়েছিল নেফার (উত্তর-পূর্ব সীমান্তের) উপরে, আমার জ্ঞানত আকসাই চীনে চীনারা রাস্তা তৈরি করার আগে পর্যন্ত আমরা সেই ভূখণ্ড সম্পর্কে কিছু বলিই নি... আমরা ১৯৫৮-তে প্রতিবাদ জানালেও, এবং পরে লোকসভায় একে 'আক্রমণ' বলে নিন্দা করলেও, আমরা এ-সম্পর্কে স্পষ্ট অবস্থানে ছিলাম না। এমনকি আমাদের বিশেষজ্ঞরা প্রতিবাদ জানানো উচিত হবে কিনা, সে-সম্পর্কেই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু নেহরু বলেছিলেন, আমাদের মানচিত্রে যখন আমরা আকসাই চীনকে আমাদের বলে দেখিয়েছি, তখন প্রতিবাদ জানানো উচিত।'' কিন্তু ঐতিহাসিক এস গোপাল (নেহরুর জীবনীলেখক— দী.চ) সরকারের এতদিনকার সিদ্ধান্ত পাল্টে আকসাই চীনের উপর দাবিকে যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত দেওয়ার পক্ষে অভিমত দেওয়ায় (উল্লেখ্য যে, ম্যাক্সওয়েল তাঁর বইয়ে তথ্যের ভিত্তিতে গোপালের ওই অবস্থানকে ভুল বলে প্রমাণ করেছেন; বস্তুত আজ পর্যন্ত ভারতীয় বা বিদেশি অন্য কোনো বিশেষজ্ঞই আকসাই চীনে ভারতের দাবিকে যুক্তিসঙ্গত বলেন নি- দী.চ) নেহরু লোকসভায় আকসাই চীনকে 'অনির্দিষ্ট' ও বিতর্কিত বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও রাতারাতি তাঁর অবস্থান পাল্টে নিয়েছিলেন। বিরোধের মীমাংসার জন্য উদ্যোগ নেবার অনুরোধ জানিয়ে চীনের ১৯৫৯'র ১৬ মে-র 'নোট' সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রত্যাখ্যান করায় আর কে নেহরু দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তারপর বলেছেন, "১৯৬১-র প্রথম দিকে আমি... প্রধানমন্ত্রীকে আমার এই অভিমত জানাই যে, চীনের সঙ্গে আমরা সংঘর্ষের পথে এগোচ্ছি, যার জন্য আমাদের যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নেই, এবং যা আমাদের স্বার্থেই এড়াবার চেষ্টা করা উচিত... তাঁকে আমার এই অভিমতও জানাই যে, আমাদের চীনের নেতাদের সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনায় বসা দরকার, যাতে কোনো সমাধান-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়... ১৯৬১-তে আমাকে চীনে পাঠানো হয়... চীনা নেতারা উত্তেজনা কমাবার জন্য বিশেষ আকাঙ্খার পরিচয় দেন।'' ১৯৬০-এ চৌ ভারতে শীর্ষবৈঠকে এসে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি করে "তাঁরা 'সাম্প্রতিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ'-এর ভিত্তিতে কিছু এদিক-ওদিক করে 'দক্ষিণ লাডাক' ও নেফা-র উপর ভারতের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে রাজি বলে, এবং সেই একই ভিত্তিতে তাঁদের উত্তর অঞ্চলের, অর্থাৎ আকসাই চীন ও লিংজিয়াং-এর উপর চীনের দাবি আমাদের মেনে নেওয়া উচিত বলে জানিয়েছিলেন।... আমার মনে হয়েছিল, আমাদের সেই প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা করা দরকার ছিল... কিন্তু জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী শুধু ওই প্রস্তাবটিকেই প্রত্যাখ্যান করেন নি, সাথে সাথে, আমাদের সামরিক প্রস্তুতির অভাব থাকা সত্ত্বেও, এগিয়ে যাবার নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন (জনমতের যে চাপের জন্য মূল দায়িত্ব কিন্তু ছিল সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারীর ভূমিকা পালনকারী ভারতের রাষ্ট্রনেতাদেরই- দী.চ)।... আমরা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম যে, আমাদের এগিয়ে যাবার নীতি সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়ে দেবে। ১৯৬২-র জুলাইতেও আমি প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনা শুরু করাটাই ভালো হবে বলে আমার অভিমত জানিয়েওছিলাম... ১৯৬২-র যুদ্ধের পর চীন ইচ্ছে করলে তাওয়াং দখল করে রাখতে পারতো, কিন্তু তারা তা করে নি। শুধু যেখানে তাদের রণনীতিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ আমাদের চেয়ে বেশি সেটুকুই— আকসাই চীন— তারা নিজেদের অধিকারে রেখেছিল।'' ১৯৬৮-তে তিনি আবার এ প্রসঙ্গে লিখছেন, "চীনের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়টি আবার ভেবে দেখা দরকার... চীনারা আমাদের সাথে মীমাংসার আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়েছিল। আমরাই গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে আলোচনা করতে অস্বীকার করেছিলাম... আমাদের এগিয়ে যাবার কারণেই অনিবার্য সীমান্ত-যুদ্ধ ঘটিয়েছিল, চীন কিন্তু

১৯৬৫ পর্যন্তও কলম্বো প্রস্তাবের (নিরপেক্ষ জোট কর্তৃক উত্থাপিত ভারত-চীন মীমাংসার প্রস্তাব- দী.চ) ভিত্তিতে আলোচনায় আগ্রহী ছিল।'' ১৯৭১-সাক্ষাৎকারে আর কে নেহরু আরও স্পষ্টভাবে নিজের অভিমত জানিয়েছেন, ''১৯৬১-তে চীনের নেতারা তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনাদেরকে আমরা অনেক বেশি (পাকিস্তানের তুলনায়- দী.চ) গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বলে মনে করি, আপনাদের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাই, সীমান্ত বিরোধেরও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করতে চাই।'' কিন্তু লোকসভায় প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সেটা আর সম্ভব হয় নি... আমি তাঁকে বলেছিলাম, চীনারা সব বিষয়ে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এমনটা আপনি আশা করতে পারেন না।'' এই পটভূমিকায় ১৯৬২-র যুদ্ধ তাই আর কে নেহরুর কাছে আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিল না।

আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত যে ছিল একেবারেই 'অনির্দিষ্ট' (''undefined''), এটা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চেয়ে ভালো কেউ জানতো না। দ্বিধাবিভক্ত স্বাধীন ভারত গঠিত হয়েছিল যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭ অনুসারে, তাতে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, *অবিভক্ত ভারতের যে অংশ ভূখণ্ডগতভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, শুধু সেই ভূখণ্ড নিয়েই ভারত গঠিত হচ্ছে।* সেই মানচিত্র অনুসারে, বা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক সমস্ত সরকারি দলিলে প্রকাশিত ভারতের অধিকাংশ মানচিত্রে ভারত-চীন সীমান্ত যেভাবে দেখানো হয়েছিল, ভারত নিজেই তাকে এককভাবে পাল্টে নিয়েছে। ১৯৫৪ সালে পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি জেনারেলকে লেখা নেহরুর সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে 'অসুবিধেজনক' মানচিত্রগুলির প্রচার বন্ধ করে নতুন করে ভারতের ইচ্ছেমতো মানচিত্রে সীমান্তরেখা বদলে দেওয়া হয় (*Selected Works of Jawaharlal Nehru*; volume 26, page 482)। বস্তুত এটাই ছিল ভারতের সেই দৃষ্টিভঙ্গি যা সংঘর্ষকে কার্যত ডেকে এনেছিল।

আর কে নেহরু আরও বলেছেন, ''যখনই প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন, 'তিনি আমার সাথে একমত হয়েছেন', কিন্তু তার পরেই আবার যোগ করেছেন, 'জনমত আমাকে এখন আর মীমাংসা করতে দেবে না।' লোকসভায় তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা থেকেই ধরা পড়বে, তিনি দু'টি অবস্থানের মধ্যে সব সময় দোদুল্যমান ছিলেন। কখনও তিনি চীন থেকে বিপদের আশঙ্কাকে প্রশমিত করছেন, আবার লোকসভায় হৈ চৈ হলেই চীনকে নিন্দা করেছেন।'' বস্তুত এ প্রসঙ্গে জোর দিয়েই বলা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে নেহরু চিরকাল এরকম দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়ে বারবার বিপত্তি ঘটিয়েছেন (এ প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্তই সম্ভবত যথেষ্ট হবে। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নে ১৯৪৬-এ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ দু'পক্ষই মেনে নিয়েছিল, পরিণতিতে ভারত-পাকিস্তান বিভাজন এড়িয়ে যাবার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপরই নেহরু-র প্রকাশ্য একটি বেফাঁস ও অযৌক্তিক মন্তব্যের ফলে (ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবগুলি ''স্বাধীনতার পর আমরা পাল্টে নেবো'') আশঙ্কিত হয়ে লিগ সেই প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে বসে। ফলত ভারতের বিভাজন আর আটকানো যায় নি। কাজেই পণ্ডিত নেহরু সীমান্ত-বিরোধের প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত যে 'জনমতের চাপ'-এর অজুহাত বার বার সবাইকে দিয়ে ভারতের আগ্রাসী নীতির পক্ষে ওকালতি করেছেন, তার জনক যে ছিলেন তিনি নিজেই এ নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। স্বাধীনতার পর অন্তত দশ বছর পর্যন্ত দেশে তাঁর যে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল, তাতে প্রথম থেকেই তিনি যদি বৃটিশদের সাম্রাজ্যবাদী সীমান্ত নীতির উত্তরাধিকার অস্বীকার করতেন এবং চীনের মতো স্বাধীন ও যুক্তিসম্মত অবস্থানের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে চাইতেন, তাহলে কোনো দক্ষিণপন্থী শক্তি বা তথাকথিত জনমত তাঁর বিরোধিতা করতে পারতো না। ফলত সীমান্ত বিরোধের সমাধান না হবার এবং ভারত-চীন যুদ্ধের জন্য মূলত কাউকে যদি দায়ী করতে হয় তবে তা হচ্ছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার— এই সিদ্ধান্তটিই আগে দেশি বা বিদেশি অধিকাংশ প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞ বা আমাদের মতো বামপন্থীরা বার বার তুলে ধরেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে সীমান্ত-বিরোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশাসনিক স্তরে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, সেই আর কে নেহরুও কার্যত একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

ফলত, আমরা এই নিবন্ধের প্রথম অংশের শেষে যে কথা বলেছিলাম, তার পুনরাবৃত্তি করে আবার বলতে হচ্ছে : যতদিন ভারত সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনুসৃত পথ ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ ও কার্যকর করার অবস্থানের মৌলিক ভ্রান্তি নৈতিক ভাবে স্বীকার না করবে— ততদিন তাই ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত নেহরুর জমানার প্রাসঙ্গিক অনমনীয় অবস্থান (''ভারত-চীন সীমান্ত সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়— সীমান্তের বিন্যাস নিয়ে কোনোরকম আলোচনা বা দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না'') পরিবর্তিত না করা পর্যন্ত সেই আলোচনায় প্রকৃত অর্থে অগ্রগতি ঘটা সম্ভব নয়। সে কারণেই নরসিংহ রাওয়ের সময় থেকে নতুন করে এই সীমান্ত নিয়ে দু'দেশের মধ্যে সরকারি স্তরে যে আলোচনা এখনও চলছে, কার্যত তাতে কোনো অগ্রগতির সম্ভাবনা আদৌ নেই। অন্যদিকে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চীনের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে কিছুটা কঠোর

হয়েছে। ফলত প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করতে অস্বীকার করলে সমাধান পৌঁছোনোটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। প্রকৃত সত্য অনেক সময়েই খুব নির্মম হয়, তাই বলে দেশের স্বার্থেই সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে নিজেদেরই পরে অনুতাপ করতে হয়, যেমন করেছেন আর কে নেহরু। তাই আজ দেশের স্বার্থে আজ সেই নির্মম সত্যটাকে শুধু স্বীকার করলেই হবে না, এতোদিন যাদের এই ব্যাপারে অজ্ঞ করে রেখে উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশের যে কোটি কোটি ভারতীয়কে বিভ্রান্ত ও বিপথে চালিত করা হয়েছে, তাদের সামনেও প্রকৃত সত্যটাকে তুলে ধরতে হবে। একমাত্র এভাবেই এতোদিনকার অজ্ঞতার ও মিথ্যাচারের জঞ্জাল দূরে হটিয়ে বিপরীতমুখী এক জনমত তৈরি করার এবং তার উপর ভিত্তি করে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের কার্যকর সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

তাই সীমান্ত বিরোধের সামগ্রিক ইতিহাস অনুশীলনের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে ভারত কী কী প্রশ্নে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিয়েছে, সেটা সংক্ষেপে তুলে ধরে মানুষের সামনে স্বীকার করতে হবে : (১) ১৯৫৪-তে একতরফাভাবে ভারতের মানচিত্র, বিশেষত ম্যাকমোহন লাইনের পরিবর্তন, (২) ১৯৫৪-৫৮ সময়কালে যখন চীনের সঙ্গে মতানৈক্যের বিষয়টি ধরা পড়েছিল, তখনই তার মীমাংসার জন্য আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণে অসম্মতি, (৩) ১৯৫৯-এ নিজের ভ্রান্ত অবস্থানকেই একমাত্র সত্য বলে মিথ্যে দাবির ভিত্তিতে চীনের সমস্ত আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, (৪) আকসাই চীন সম্পর্কে চীনের দাবির অযৌক্তিক নস্যাৎকরণ, (৫) ১৯৬০-এ শীর্ষবৈঠকে চৌ এন-লাই কর্তৃক উত্থাপিত ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সুবিধেজনক ও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। এবং এই প্রক্রিয়াকে আরও অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার স্বার্থে ১৯৬২-র সামরিক বিপর্যয় সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৯৬৩-তে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হেন্ডারসন ব্রুকস্-ভকত রিপোর্ট এবং ভারতের উত্তর সীমান্তের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে পররাষ্ট্র দপ্তরের যুদ্ধ-পরবর্তী প্রধান জ্যাকেরিয়ার গোপন রিপোর্ট এই দু'টি আজও পর্যন্ত অপ্রকাশিত রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশের দাবি তোলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, নেভিল ম্যাক্সওয়েল দাবি করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি রিপোর্টটির মূল বক্তব্য দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তাতে 'ভারতের চীন যুদ্ধ'-এর ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নৈতিক ও বাস্তব অবস্থানের এবং সাথে সাথে সামরিক নীতি ও তার বাস্তবায়নের প্রচণ্ড সমালোচনা করা হয়েছিল (Neville Maxwell: Remembering *a War:The 1962 India-China Conflict,*2002)। এর সত্যতা যাচাই করার উপায় না থাকলেও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম কিন্তু মূলত তাঁর বক্তব্যকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে।

আর এ কাজটা যদি আমরা এখনই শুরু না করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ ইতিহাস এই প্রশ্নে আগের মতোই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

এই লেখায় উল্লেখিত বর্তমান লেখকের প্রাসঙ্গিক আগেকার লেখাটিতে (অনীক: জুন,২০১০) নিচের তথ্যসূত্রগুলি দেওয়া হয়েছিল :

1. Neville Maxwell : *India's China War*, New York,1970
2. Neville Maxwell: Remembering *a War:The 1962 India-China Conflict,*2002(http://www.rediff.com/news /2002 /oct/08max1.htm, www.rediff.com/news/2002/ oct/08 max 2.htm, www.rediff.com/news/2002/oct/ 08max3.htm
3. Neville Maxwell :'Renewed tension on the India-China border: Who's to blame?', *East Asia Forum*, Sept 3, 2009
4. Bertrand Russel : *Unarmed Victory*, Penguin,1963
5. Felix Greene: *The Wall Has Two Sides*, Jonathon Cape, 1962
6. Felix Greene : *A Curtain of Ignorance*, Jonathon Cape, 1965
7. Karunakar Gupta: 'The McMahon Line : The British Legacy', *The China Quarterly*, No. 47(Jul – Sep'71)
8. Karunakar Gupta: *The hidden history of the Sino-Indian Frontier*, Minerva, 1974
9. A.G. Noorani: 'Fact of History", *India's National Magazine*, 30 September 2003
10. A.G. Noorani: '*Sino-India border dispute'*(http:// www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/editorial/sinoindia-border-dispute-210)
11. Ananth Nath Krishnan: 'India, China play down border dispute', *The Hindu*, March 17, 2010
12. Venkatesan Vembu: 'China, India and the fruits of Nehru's folly', *DNA*, June 6, 2007
13. http://en.wikipeds.org/wiki/Hendeson_Brooks-Bhagat_Report

বর্তমান লেখাটির তথ্যসূত্র হিসেবে সেই তালিকার সঙ্গে নিচের লেখাগুলি ও যুক্ত করা দরকার :

14. Neville Maxwell : India-China Dispute Revisited: How It Could Be Resolved, *Economic & Political Review*, December 22, 2012
15. A.G. Noorani: The Truth about 1962, *Frontline*, Nov 17-30,2012
16. A.G. Noorani: A Nehru's Dissent, *Frontline*, June 30-July 13,2013
17. A.G. Noorani:Maps and Borders, *Frontline*, Oct. 11-24, 2008

গ্রাহক–পাঠক–শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি—

অনীক-কে শক্তিশালী করুন।

অনীক-এর দিশার প্রতি আমরা দায়বদ্ধ।

ঘটনাপ্রবাহ

গুজরাট ও নরেন্দ্র মোদী

গৌতম সেনগুপ্ত

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে গুজরাটে পরপর তিনবার জিতে চতুর্থবারের জন্য নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়করির হিসাব বর্হিভূত সম্পদ নিয়ে বিতর্কে জেরবার বিজেপি মোদীর জয়ে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। জয়ের পর মোদীর দৃষ্টি শুধুমাত্র গুজরাটে সীমাবদ্ধ নেই। পাখির চোখ দেখার মত তাঁর দৃষ্টি এখন দিল্লীতে নিবদ্ধ। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তথা এনডিএ তাঁর নেতৃত্বেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চালাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নীতিন কাঁটা সত্ত্বেও শোনা যাচ্ছে সংঘ পরিবার মোদীর নেতৃত্বে শীলমোহর লাগিয়েছে।

এদিকে শাসক জোট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ নেতা-মন্ত্রী স্তরের দুর্নীতি থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা, খোদ রাজধানীতে নারীদের প্রতি জঘন্যতম অত্যাচার বৃদ্ধি ও তার বিরুদ্ধে আন্দোলন, লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতিতে জেরবার। ১০ থেকে ১১-র মধ্যে ঘোরাফেরা করা প্রবৃদ্ধি সূচক গোঁত্তা খেয়ে নেমেছে ৫-৬-এ। দেশীর একচেটিয়া থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পান্ডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধমকে দ্বিতীয় দফার সংস্কার (খুচরো ব্যবসায় এফডিআই ইত্যাদি) চালু করতে গিয়ে ইউপিএ জোট টিকিয়ে রাখাই দায়।

নব্য উদারবাদের দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, ফিনান্স-পুঁজির দালালরা, একজন নতুন পোস্টার বয় পেয়েছেন। যিনি রাজ্য-রাজনীতিতে একনাগাড়ে ১৫ বছর ধরে সফল। সচেতন ভাবে কাজের লোক হিসাবে তাঁর পরিচিতি নির্মাণ করা হয়েছে। যাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন দুর্নীতির অভিযোগ নেই। যাঁকে ভবিষ্যত দেশনেতা হিসাবে রাখছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর নাম থেকে ২০০২ সালে (প্রথমে আমেদাবাদ পরে সমগ্র গুজরাট) ঘটে যাওয়া নারকীয় দাঙ্গার দাগ মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সাবরমতির পুণ্য বারি সিঞ্চনে। যদিও গুলবর্গা সোসাইটির পুড়ে যাওয়া বাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে রক্ত আর দাঙ্গার চিহ্ন নিয়ে। নারোরা-পাটিয়া আজ ভুলে যাওয়া ইতিহাস। এভাবেই তো আমরা ভুলে গেছি ১৯৮৪-র দিল্লীর সেই বীভৎস শিখ-বিরোধী দাঙ্গার কথা। সেই দাঙ্গার বীভৎসতার ওপর দাঁড়িয়েই 'অসাম্প্রদায়িক' কংগ্রেস দলের বিপুল জয়। এমনকি সাম্প্রদায়িকতাকে আটকাতে আইনি বামেরা সেই কংগ্রেসের উপরই নির্ভরশীল।

প্রচারমাধ্যমের একটা অংশের সচেতন প্রয়াস হচ্ছে এটাই বোঝানো যে গুজরাটের অর্থনৈতিক সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্ব। অথচ আমরা জানি যে ব্যবসা, বন্দর ও সুতো-কাপড়কলের দৌলতে ১৯৪৭-পূর্ববর্তী সময় থেকেই গুজরাট ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় একটি উন্নত রাজ্য। ঐতিহাসিকরা এটা দেখিয়েছেন যে মুঘল যুগের মাঝামাঝি সময় থেকে গুজরাটে ব্যবসায়িক পুঁজির শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো।

নরেন্দ্র মোদীও তাঁর সাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি মুছে ফেলার জন্য গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা মুক্তারা আব্বাস নাকভি, রাজ্য হজ কমিটির প্রধান ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের প্রধানকে নিয়ে সভা করেছেন সমগ্র গুজরাট জুড়ে। প্রচারে রেখেছেন যে গুজরাটে সরকারি চাকরিতে শতকরা ৯ শতাংশ উপস্থিতি আছে মুসলমান সম্প্রদায়ের। পশ্চিমবঙ্গে এই হার শতকরা ২ শতাংশ। এই প্রচার কাজেও দিয়েছে। ভয়েই হোক বা প্রচারের জাদুতেই হোক, মুসলমান - প্রধান ১২টি আসনের মধ্যে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি জিতেছে ৮টিতে।

১৯৯০ পরবর্তী পর্বে সমগ্র ভারত জুড়ে নগরায়ন বেড়েছে অত্যন্ত দ্রুততায়। গুজরাটে এই গতি আরও বেশি। ২০১১-র জনগণনার তথ্য অনুযায়ী গুজরাটের ৪৩ শতাংশ মানুষ এখন শহরবাসী। দশ বছর আগে এই হার ছিল ৩৩ শতাংশ। গোটা দেশের তুলনায় গুজরাটে নগরবাসীর সংখ্যা ১০ শতাংশ বেশি। বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে এই নগরায়ন একদিকে জন্ম দিয়েছে নগরভিত্তিক বিশাল এক অসংগঠিত ক্ষেত্রের। আবার জন্ম দিয়েছে নগরবাসী নব্য মধ্যবিত্তের। প্রচারে মোদী রেখেছেন নগরায়ন-জনিত এই দুই ধরনের নগরবাসীর জন্যই ঢালাও প্রতিশ্রুতি। ৩০ লক্ষ চাকরি ও ৫০ লক্ষ গৃহ নির্মাণের। চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য এই সব প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি এবং এর জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকা ধার্য্য করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং গরিবের জন্য গৃহ আর তা নির্মাণের জন্য নব্য মধ্যবিত্তের চাকরি বা ঠিকাদারি। ফল পেয়েছেন হাতে গরম। আহমেদাবাদ, ভদোদরা, সুরাট, ভাবনগর ও রাজকোট— গুজরাটের এই প্রধান প্রধান শহরের ৪৪টি আসনের মধ্যে ৪০টি জিতেছে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি।

নরেন্দ্র মোদী এখন বিনিয়োগ আকর্ষণ করার 'কাল্ট ফিগার'। এমনকি সাম্প্রদায়িক বিজেপি-র স্বঘোষিত চিরশত্রু পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও নরেন্দ্র মোদির শিল্প ক্যারিশমায় বিমোহিত। 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাটের' সাফল্যের জয়গান করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায়। পর পৃষ্ঠার তথ্যে 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাটে'র সাফল্যের খতিয়ান কিন্তু অন্য কথা বলে।

বছর	*প্রস্তাবিত শিল্প সংখ্যা*	*প্রতিশ্রুত বিনিয়োগ*	*বাস্তবায়িত শিল্প সংখ্যা*	*বাস্তব বিনিয়োগ*
২০১১	৮৩৮০	২০,৮৩,০৮৭	২৪৮	২৯,৮১৩
২০০৯	৮৬৬০	১২,৩৯,৫৬২	১৩৪২	১,০৪,৫৯০
২০০৭	৩৬৩	৪,৬৫,৩০৯	১৬০	১,০৭,৮৯৭
২০০৫	২২৬	১,০৬,১৬০	১১৫	৩৭,৯৩৯
২০০৩	৭৬	৬৬,০৬৮	৪২	৩৭,৭৪৬

সূত্র ঃ Economic Times — 01/07/2012

অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ। প্রস্তাবিত শিল্প প্রস্তাবিত বিনিয়োগ নিয়ে যত হৈচৈ হয়, বাস্তবায়িত হয় তার চেয়ে অনেক অনেক কম। সর্বত্রই এই চিত্র। এগুলি আসলে অত্যন্ত কম দামে, সরকারি আর্থিক সহায়তায়, কখনও শিল্প করার নামে, আবার কখনও *সেজ* করার নামে সবচেয়ে ভালো জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ কোম্পানির হাতে তুলে দেবার সুচতুর প্রয়াস।

শিল্প যদি নাই হয় তবে পুঁজিপতিরা তাদের নতুন 'পোস্টার বয়'-কে নিয়ে এত মাতামাতি করছেন কেন। কারণ জনসংখ্যার বিচারে গুজরাট ভারতের জনসংখ্যার ৫ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও সে রাজ্য থেকে দেশে বিনিয়োগ আসে মোট বিনিয়োগের ১৫ শতাংশ। এবার আমরা দেখব, গুজরাট কেন্দ্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিতে ২০০2 থেকে ২০১২ এই কালপর্বে শেয়ার মূল্যে কী রকম বৃদ্ধি হয়েছে। পাশের তালিকা থেকে আশা করি উপরের সিদ্ধান্তটির সমর্থন পাওয়া যাবে।

সুতরাং পুঁজিপতিদের নতুন 'পোস্টার বয়'-এর জন্য উল্লাসের সংগত কারণ আছে বৈকি। শেয়ার/ফাটকার এই বৃদ্ধি হয়েছে মোদীর রাজত্বের গুজরাটে। এটুকু নজরানা নরেন্দ্র মোদী দাবি করতেই পারেন। দিল্লির পথ সুগম করার জন্য তাঁর সমর্থন প্রয়োজন মালিকদের, থুড়ি উদ্যোগপতিদের।

এবার আমরা দেখার চেষ্টা করবো 'আম-আদমির' গুজরাট কেমন আছে। ২০০১-এ প্রকাশিত ভারতের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে গুজরাটের স্থান ছিল পঞ্চম। ২০০৬ সালে তার স্থান হয়েছে নবম, অর্থাৎ ৪ ধাপ নেমে গেছে। সে রাজ্যের ৫ বছর বয়স পর্যন্ত ৪৪.৭ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। (যদিও ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অপুষ্টি সম্পর্কে মোদী বলেছিলেন যে আজকের সৌন্দর্য-সচেতন মেয়েরা মোটা হতে চায় না বলে অপুষ্টিতে ভোগে।) আদিবাসী অঞ্চলে এই হার আরও বেশি। ২০১২ সালে সৌরাষ্ট্রে ৩৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। কারণ, ফসল না হওয়া। সৌরাষ্ট্রে গত এক মাসে আত্মহত্যা করেছেন ১১ জন কৃষক। জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালে ৫২৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছিলেন। আর ২০১১ সালে তা বেড়ে ৫৭৮ হয়েছিল। ২০১০-এর পর থেকে বেকারিও ক্রমবর্দ্ধমান। যদিও মোদির মতে, "...গুজরাটের অধিকাংশ কৃষকই গাড়ি কেনার ক্ষমতা রাখে"।

ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এবং তাঁদের মার্কিন ও পশ্চিম ইউরোপীয় বন্ধুবর্গ ভারতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে আরও বিস্তৃত করার নতুন 'পোস্টার বয়' পেয়ে গেছেন। সদ্য অভিষিক্ত এই যুবরাজের সামনে ২০১৪-র চ্যালেঞ্জ। ইনি এক পোড়-খাওয়া এবং তৃণমূল থেকে উঠে আসা ক্ষমতার রাজনীতির অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। ভারতের শ্রমজীবী মানুষ, পরিবর্তিত ভোকাবুলারিতে যাঁরা 'আম-আদমি' আসলে নাম-গোত্রহীন, তাঁরা ২০১৪-র ফাইনাল খেলায় শুধুই দর্শক থাকবেন।

মোদির রাজত্বে গুজরাট কেন্দ্রিক কোম্পানিগুলির শ্রীবৃদ্ধি

সংস্থার নাম	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (কোটি টাকায়)	শতকরা বৃদ্ধি ২০০২ থেকে ২০১২
আরভি ডেনিমস্	১৫২	২৫৫৩৩%
আদানি এন্টারপ্রাইজ	৩১,০৫৯	৮৬১৫%
অ্যালেমেবিক	২২০	২০৫%
অরভিন্দ	২,৪৮৫	১২৫৪%
এলকন ইঞ্জিঃ এন্ড কেমিঃ	৪৯৯	৭১৩৮%
গুজরাট অম্বুজ এক্সপোর্ট	৩৫৩	১৩১৮%
গুজরাট অ্যাপোলো ইন্ডাস্ট্রিজ	২১২	১৬৮৩%
গুজরাট গ্যাস কোঃ	৩,৯১৩	৫৫৩%
গুজরাট এনআরই কোক	১,২০০	৮৭৬৬%
জিএসএফসি	২,৬৯৮	১২৮৪%
রতনমনি মেটাল্স	৬৩৪	৭৪২৫%
সান ফার্মা	৭৬,২৫০	২৩৩৪%
টরেন্ট ফার্মা	৫,৬৮০	১১৫৩%
ইউনাইটেড ফসফরাস	৫,৭৯৭	৮৭৯৯৫%
ওয়েলস্পান ইন্ডিয়া	৫৪৫	৫৭%
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস্	৪,৬১,৬২৫	১৩৫৭%
এসার অয়েল	৯,৮১২	৪৫০৭%
মোট	৬,০৩,৮৯০	১৫১৬%
বি এস ই ১০০	৫৪,৬৯,৭৫৪	১২৮৬%

সূত্র ঃ K R Choksey Securities (Outlook ডিসেঃ ২৫-৩১, ২০১২)

ওষুধের ন্যায্য দামে গভীর অসুখ

আশিস কুসুম ঘোষ

সুস্থ ভাবে বাঁচতে হলে প্রয়োজন হয় চিকিৎসার, যার অন্যতম উপকরণ ওষুধ। যে কোনো দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়ার অবস্থায় থাকা আবশ্যিক (access to essential medicines)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৪ সালের প্রতিবেদনে দেখিয়েছে যে ভারতের প্রায় ৭০ কোটি মানুষ অত্যাবশক ওষুধ ব্যবহার করার সুযোগ পান না, যদিও ভারত বিশ্বের চতুর্থ ওষুধ-উৎপাদক দেশ। মার্চ-২০১২-র হিসেবে দেশের ওষুধ-শিল্পের বিক্রি ১০৪৯৪৪.৩৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে দেশে ওষুধ বিক্রি হয় ৬৫৯৬৩ কোটি টাকা, বৃদ্ধির হার প্রায় ১৬ শতাংশ। ২০০টি দেশে ওষুধ ভারত থেকে রপ্তানি হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক মে-২০০১ এর সমীক্ষায় প্রতিভাত হয়েছে প্রতি বছর ২.২ শতাংশ ভারতবাসী চিকিৎসা ব্যয় সামলাতে ঘটি-বাটি বিক্রি করে দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্যখাতে সরকার খরচ করে মাত্র ১৬ শতাংশ আর নিজের পকেট থেকে দিতে হয় মোট খরচের ৮৪ শতাংশ। 'জাতীয় নমুনা সমীক্ষা' ৪৬১, ৫৫তম রাউন্ডের সমীক্ষায় প্রকাশিত যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ খরচ হয় শুধু ওষুধ কিনতে। দরিদ্রতম ২০ শতাংশ মানুষের ওষুধের জন্য ব্যায় হয় মোট খরচের ৮৫ শতাংশ। ইউনাইটেড নেসনস-এর মতে ২১ লক্ষ শিশু তাদের ৫ বছরের জন্মদিন দেখতে পায় না। প্রতিদিন আমাদের দেশে ১০০০ শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায়। প্রতি মিনিটে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ৪ জন। ডায়রিয়া, টাইফয়েড, হাম ও নিউমোনিয়া অসুখই এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

২০১১ সালের 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স' অনুযায়ী ৮১টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৫-তম। ক্ষুধা ও অপুষ্টির যুগলবন্দি দেশের সর্বত্র ধ্বনিত হয়ে চলেছে। শনি - সত্যনারায়ণ-পীর-গাজী-জানগুরু-ওঝাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে, তাবিজ-কবজ-ঝাড়ফুঁকে রোগমুক্তি না ঘটলে ক্রয় ক্ষমতার বিচারে সব থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষের শেষ ভরসা বা আশ্রয় সরকারি হাসপাতাল। আর সেখানে সরকারের শিলমোহর লাগান ওষুধের দোকান থাকলে ন্যায্য দামে ওষুধ পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষ দুহাত তুলে তা-তা-থৈ-থৈ করবেন এটাই স্বাভাবিক। জীবনের প্রতিটি সময়ে হেরে যাওয়া মানুষের স্মরণে থাকে না যে চক্চক্ করলেই সোনা হয় না। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান হঠাৎ খুলতে হচ্ছে কেন? এর আগে হাসপাতালগুলিতে যে 'জনঔষধি' দোকান ছিল সেগুলোর কী অবস্থা হয়েছে? ন্যায্য দাম কী ভাবে নির্ধারিত হবে? বলিউড তারকা আমির খানরা যে দামে কিনতে পারবেন ওষুধ সেটা ন্যায্য, না 'হাসিম শেখ রামা কৈবর্তরা' যে দামে কিনতে পারবেন সেই দামটা ন্যায্য। ন্যায্য দাম প্রচুর ছাড় দিলেই হয় না। সবটাই নির্ভর করে যিনি বা যাঁরা ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁর বা তাঁদের ক্রয় ক্ষমতার ওপর। মনে রাখা প্রয়োজন দেশের বেশির ভাগ মানুষের দিনে ২০ টাকার বেশি খরচ করার ক্ষমতা নেই।

সমগ্র বিশ্বে দু-ধরনের ওষুধ বিক্রি হয়। একটি হচ্ছে জেনেরিক নামে ওষুধ যাকে বলা হয় জেনেরিক ওষুধ। অপরটি হচ্ছে পেটেন্ট করা ব্রান্ডেড ওষুধ। ভারতের অবদান ব্রান্ডেড-জেনেরিক ওষুধ। আমাদের দেশে তিন রকমের ওষুধ পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত যে নিয়ম চালু আছে তা মূলত হচ্ছে উৎপাদক সংস্থা যে দামে বিক্রি করেন— এম-আর-পি (খুচরো বিক্রির সর্ব্বোচ্চ মূল্য) তার মধ্যে ৮-১০ শতাংশ হোলসেল বা স্টকিস্টরা এবং দোকানদারদের অংশ কমবেশি ২০ শতাংশ ছাড় থাকে। জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রে এম-আর-পি আর দোকানদারদের কেনার দামে বিস্তর ফারাক। প্রায় কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সবটাই চাহিদা-নির্ভর। ন্যায্য দামের যে কথা বলা হচ্ছে তার খেলাটা এখানেই নিহিত আছে।

প্রথমদিকে থাকলেও পর্যায়ক্রমে সরকার ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় তুলে দিয়েছে। সর্ব্বোচ্চ আদালত ও সাধারণ মানুষের আর্তনাদে ৩৮৪টি প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের কথা চলছে তাতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয় নি।

১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনের সহায়তায়, এম-আর-টি-পি (Monopoly Restricted Trade Practice Act, 1969) এবং ফেরা (Foreign Exchange Regulation Act) আইনের কঠোর প্রয়োগ থাকায় দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি নিজস্ব কৃৎকৌশলের মাধ্যমে ওষুধের বিশাল উৎপাদন ও বিপননের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ভারতে সুলভে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছিল এবং বিদেশে রপ্তানি হচ্ছিল। ২০০৫ সালে আবার পেটেন্ট আইন পরিবর্তন হয়েছে। এম-আর-টি-পি আইন শিথিল করে হয়েছে কমপিটিশন অ্যাক্ট ২০০২ (Competition Act - 2002) এবং ফেরা শিথিল করে হয়েছে 'ফেমা' (Foreign Exchange Mangement Act 1999)। ডাব্লু-টি-ও (World Trade Orgganiotion)-এর শর্ত মেনে ওষুধ শিল্পে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আগেই শুরু হয়েছে।

সারা বিশ্বে ওষুধের বাজার প্রায় ৮৪৭০০ কোটি মার্কিন ডলার যার মধ্যে ৩৭.৮ শতাংশ আমেরিকার দখলে। তারপরে আছে জাপান, ১১.৭ শতাংশ। ভারতের অংশ মাত্র ১.৪ শতাংশ এবং বিশ্বের প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে ১৪-তম দেশ।

দেশের যে ওষুধের বাজার, তার ৪০ শতাংশ দখল করে নিয়েছে প্রথম দশটি ওষুধ সংস্থা। বিদেশে রপ্তানির ৫০ শতাংশ মাত্র ৫টি সংস্থার নিয়ন্ত্রণে। ভারতে ছোট, মাঝারি, বৃহৎ-দেশি-বিদেশি এবং সরকারি ও বেসরকারি সব নিয়ে প্রায় ২০,০০০ ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা আছে।

বিশ্বের ওষুধের বাজারে আমেরিকার ওষুধ কোম্পানিগুলির কাছে এমন সব পেটেন্টকৃত ওষুধ ছিল এবং এখনও কিছু আছে যার এক একটি ওষুধের বিক্রির পরিমাণ ভারতে সমগ্র ওষুধ বিক্রির পরিমাণের তিন-চার গুণেরও বেশি। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের ওষুধ আমেরিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পেটেন্ট সীমার বাইরে চলে যাবে। এর মধ্যে অনেক বায়োলজিকাল ওষুধ আছে। আগামীদিনে এই জাতীয় বিপুল বিক্রি হতে পারে এমন কোন ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয় নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ফলে বিশ্বের ওষুধের বাজার, পেটেন্টকৃত ওষুধের বাজার থেকে জেনেরিক ওষুধের বাজারে পরিণত হতে চলেছে। বিশ্বমন্দা উন্নত দেশগুলিকে বাধ্য করছে ওষুধের ব্যবহার কমাতে। বৈষম্যের দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ওষুধের বাজার সংকুচিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বহুজাতিক ওষুধ সংস্থাগুলি ভারতে তৈরি হওয়া ওষুধের বাজারকে 'পাখির চোখ' করেছে। একদিকে ইংরেজি জ্ঞান-সম্পন্ন দক্ষ বিপুল সংখ্যায় চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী এবং অন্যদিকে উৎপাদনের জন্য শস্তা শ্রমশক্তি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারের আনুকূল্য। দেশের ওষুধ শিল্পকে বিশ্বের ওষুধের বাজারে যোগান-ভাণ্ডার হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা চলছে। দেশে এমন প্রায় ২০০০-এর ওপর জি-এম-পি অনুমোদিত, ১৬১ টি ইউ-এস, এফ-ডি-এ এবং ৯০ টি ইউ-কে-এম-এইচ-আর-এ, অনুমোদিত ওষুধ উৎপাদন সংস্থাগুলি বহুজাতিক ওষুধ সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে দিচ্ছে। আর বহু সংস্থা শুধু বহুজাতিক সংস্থার ওষুধ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। পার্লামেন্টের একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি ওষুধের ক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ বিদেশি কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণের কথা জোরালোভাবে বললেও অনুমোদিত হয় নি। প্রথমে ঘোষণা ছিল শুধুমাত্র নতুন আবিষ্কৃত ওষুধের (গ্রিন ফিল্ড) ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ করা যাবে। চালু ওষুধের (ব্রাউন ফিল্ড) ক্ষেত্রে নজরদারি থাকবে। যোজনা কমিশনের শ্রী অরুণ ময়ড়াকে নিয়ে কমিটি তৈরি হয়। সি-সি-আই (Competion Commision of India) সংস্থার নজরদারিতে এই বিষয়গুলি থাকার কথা ছিল, কিন্তু এক্তিয়ারের প্রশ্ন ওঠায় আবার এফ-আই-পি-বি (Foreign Investment Promotional Board)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ৫টি দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়ে উচ্চ-পর্যায়ের মিটিং এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বিদেশি সংস্থাগুলিকে আরও উৎসাহিত করার জন্য গত বছরের বাজেট প্রস্তাবিত 'কর ফাঁকি প্রতিরোধ বিধি' (GAAR-General Anti-Avoidance Ruls)-এ বছরে বাজেটের আগেই ২০১৬ পর্যন্ত পিছিয়ে দেবার কথা ঘোষণা হয়েছে। ওষুধ শিল্পের সবটাই প্রায় বহুজাতিক এবং দেশীয় বৃহৎ পুঁজির কোম্পানির করকমলে নিবেদিত। চলছে একচেটিয়াকরণের প্রক্রিয়া। বার বার মন্দায় আক্রান্ত বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি অস্ত্র ব্যবসার পরে ওষুধ শিল্পেই মুনাফা নিশ্চিত করতে পারছে। বহু শিল্পে অন্ধকার নেমে এলেও ওষুধ শিল্পে সূর্য সদা মধ্য গগনে, মুনাফা পাহাড় প্রমাণ।

ভারতের ওষুধ শিল্পের সাথে রুজি-রোজগারের নিরিখে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ৪০ লক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে প্রায় এক কোটি মানুষ যুক্ত আছেন। এই শিল্পকে সমৃদ্ধির পথে রেখেও সাধারণ মানুষের জন্য সুলভে ওষুধ যোগান দেওয়া সম্ভব। যদি বাজার নির্ধারিত পথেই থাকতে হয় তাহলে ওষুধের বাক্সের ওপর সর্বোচ্চ উৎপাদন মূল্য ও সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য লেখার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হোক। আলু-পটল-তেল-সাবানের মত ওষুধও যখন পণ্য, তাহলে ক্রেতাকে যাচাই করে কেনার সুযোগ দেওয়া যাবে। অতীতে কেন্দ্রীয় স্তরে এই চেষ্টা হলেও বাস্তবায়িত হয় নি।

'সকলের জন্য স্বাস্থ্য', আলমা আটার অতীত ঘোষণার প্রতি যদি বিশ্বস্ত থাকেন দেশের কর্ণধাররা, তাহলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বিচার করে, সরকার নিয়ন্ত্রিত মৃতপ্রায় ওষুধ সংস্থাগুলিতে ওষুধ উৎপাদন করে, প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে, সরকারি সব হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হোক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশে ওষুধ বিক্রির মাত্র ২ শতাংশ জেনেরিক ও পেটেন্ট ওষুধ। স্মরণ করাতে চাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটেনের লেবার পার্টি জয়যুক্ত হয় কারণ তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল "ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিস"। প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। জনগণ লেবার পার্টিকে গদিতে বসিয়েছিল। পরাজিত হয়েছিলো বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর চার্চিলের কনজারভেটিভ দল এবং তথাকথিত পরিত্রাতা চার্চিল সাহেবের কথা জনগণ মনে রাখেনি।

দরিদ্র-ভূমিহীন কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত মানুষের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব না নিয়ে সম্পদ তৈরি কী ভাবে হবে? উজ্জ্বল ভারতে যারা আছেন একথা তাদের ভাবতে হবে। দেওয়ালের লিখন তাই বলছে।

তথ্য-সূত্র

১) Times of India, এই সময়
২) শানিত প্রহর উৎসব সংখ্যা
৩) এডাব্লুবিএসআরইউ/এনএফএসআরইউ প্রকাশনা।
৪) দিল্লী সাইন্স ফোরাম
৫) থার্ড ওয়াল্ড নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশের রূপপুর নিউক্লিয়ার চুক্তি: কিছু প্রশ্ন

পিটার কাস্টার্স

রূপপুরে দুটি নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র গড়ার চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেমন সমালোচনা বা প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠা প্রয়োজন। গত ২ নভেম্বর রাশিয়া ও বাংলাদেশ ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চুল্লি নিয়ে দীর্ঘকাল অপেক্ষমান নিউক্লিয়ার শক্তি চুক্তি সম্পন্ন করলো। এই চুক্তির পর পরই একটা বড় প্রতিরক্ষা চুক্তিও হয়ে গেল, যাতে ১০০ কোটি টাকার (বাংলাদেশের টাকা) সাঁজোয়া গাড়ি, ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র যোগান দেওয়া হবে। শেষোক্ত চুক্তিটা সই হয়েছে শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক মস্কো সফর কালে। নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি ক্রয় ও নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি যোগানোর কাজটা অস্ত্রশস্ত্র যোগানের পথ প্রশস্ত করেছে— চুক্তির এই ধরনটা ২০০৮ সালে ভারত-মার্কিন চুক্তির মতো। সেখানে ভারতে মার্কিন অস্ত্র রপ্তানির ব্যাপারটা ছিল গোপন— নিউক্লিয়ার চুক্তির অপর পিঠ। এই দুই ধরনের বাণিজ্যের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যদিও খালি চোখে দেখা যায় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া দুই রাষ্ট্রই কিন্তু বিশ্বের দক্ষিণের দেশগুলির কাছে তাদের নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি ও অস্ত্র বিক্রির ব্যবসা প্রসারিত করতে সমান উৎসুক। কিন্তু প্রচুর সরকারি টাকার ব্যয়ের রূপপুর চুক্তি ও তার পরবর্তী প্রতিরক্ষা চুক্তি কি সত্যিই বাংলাদেশের স্বার্থে? এটি এখনই ভেবে দেখা জরুরি।

এখানে আমি গত নভেম্বরে রূপপুর নিয়ে চুক্তি নিয়েই শুধু লিখছি। এই চুক্তিটিকে বাংলাদেশের নিউক্লিয়ার লবি বিরাট সাফল্য বলে আনন্দ করেছে। বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার শক্তি আনার স্বপ্ন আসলে বহুদিনের— বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল সেই তখনকার। প্রথমেই জরুরি যে বিষয়টা লক্ষ্য করতে হবে তা হলো এই নিউক্লিয়ার চুক্তির খুব কম অংশই বাংলাদেশের জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে।

২০১২ সালের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার কাছে বাংলাদেশ আত্ম-সমীক্ষার যে রিপোর্ট পেশ করেছে তা থেকে মনে হচ্ছে যে রাশিয়া বাংলাদেশকে ভিভিইআর-১০০০ নকশার দুটি নিউক্লিয়ার চুল্লি দেবে। এগুলি জল দিয়ে ঠান্ডা ও মডারেট করা চুল্লি— ১৯৭০-এর দশকের শেষাশেষি এই ডিজাইনটি তৈরি করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। নিউক্লিয়ার চুল্লিতে নিউক্লিয়ার জ্বালানির যে দণ্ডগুলি থাকে সেগুলি ঠান্ডা করতে প্রাথমিক চক্রে জল পাম্প করে ঢোকানো হয়, চাপ স্থির রেখে সেই জলকে ফোটা থেকে বিরত রাখা হয়। চুল্লিতে ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পর এই (দূষিত) জল আবার বাইরে ফেলতে হবে, অর্থাৎ তা পরিবেশে চালান করতে হবে।

এর থেকে যে প্রশ্নটা প্রথমেই মনে আসে যে রূপপুর যে উপ-জেলায় অবস্থিত সেই পাবনা উপ-জেলার ইশ্বরদির জেলেদের ওপর এই পরমাণু চুল্লি স্থাপনের কী ধরনের প্রভাব পড়বে। চুল্লির কাছাকাছি অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের যেসব জলাধার ইত্যাদি আছে, সেগুলির বাস্তুতন্ত্রর ওপর, জৈববৈচিত্র্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে কি? হ্যাঁ কি না?

রূপপুরের নিউক্লিয়ার জ্বালানি দণ্ডগুলি কীভাবে যোগান দেওয়া হবে আর ব্যবহারের পরে কীভাবে তা ফেলা হবে সেটা ভেবে দেখলেই আরও দরকারি প্রশ্ন উঠে আসে। যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে মনে হয় বাংলাদেশের জনগণের ওপর নিউক্লিয়ার বর্জ্যপদার্থের ভার চাপানো হবে না। খনি থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পর যে বিরাট পরিমাণ নিউক্লিয়ার বর্জ্য ফেলা হয় সেটাও বাংলাদেশে ঘটবে না। বর্জ্য জমা করে রাখার বিরাট বিরাট স্টোরেজ ট্যাংকে দীর্ঘকালীন ও উচ্চ বিকিরণের তরল রাখার কারণে এদেশের পরিবেশ, মাটি ও মাটির নিচের জল দূষণের ঘটনাও ঘটবে না। সেই দূষণের শিকার হবে অন্য দেশের মানুষ। কিন্তু তাতেও কি মানুষের ভয়ের কোনও কারণ থাকবে না? রাশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে, বাংলাদেশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ করবে না, চুল্লির জ্বালানি রাশিয়াই যোগান দেবে, আবার সেগুলির জীবনচক্র শেষ হলে তা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ইশ্বরদি ও পাবনার লোকেরা তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। কারণ, এখানে আসল ব্যাপার হলো ব্যবহারের পর এই পরমাণু বিকিরণ সহ জ্বালানি দণ্ড অস্থায়ীভাবে জমা রাখা আর তা রূপপুরের চুল্লিতে আনা ও ফেরত নিয়ে দেওয়ার সময় তার পরিবহন-কালীন সমস্যা। ইউরোপে নিউক্লিয়ার বিরোধী সমাজকর্মীরা বহুদিন ধরেই ব্যবহৃত জ্বালানি সড়ক পথে পরিবহনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ করে আসছেন।

তৃতীয়ত, নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনার বিপদের প্রশ্নটিও আছে। রাশিয়ার কর্তাব্যক্তিরা অবশ্য বলবেন যে ভিভিইআর-১০০০ নকশাটা ১৯৮৬ সালে ইউক্রেনের চের্নোবিলের গ্রাফাইট মডারেটরের নকশার চুল্লি থেকে অনেক সুরক্ষিত। চের্নোবিলের চুল্লিতে যে আরবিএমকে নকশা ছিল তা রাশিয়া রাষ্ট্র ও রাশিয়ার জনগণকে ভয়ানক সমস্যার মুখোমুখি করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্যান্সারে মারা গেছে। একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষি উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে। চুল্লিকে কবরস্থ দেওয়ার জন্য যে নির্মাণ কার্য চালাতে হয়েছে তার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু তারপর ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমা

দুর্ঘটনার পর যখন আবার পরীক্ষা করা হলো, দেখা গেল যে ফুকুশিমার যে খুঁতগুলো ছিল তার অনেকগুলিই রাশিয়ার চুল্লিগুলিতেও রয়েছে। রোসাটম ও রাশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মিলে ২০১১ সালের মাঝামাঝি যে যৌথ রিপোর্ট তৈরি করে তাতে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেলে সেদেশের চুল্লিগুলি বিপদমুক্ত থাকবে কিনা সে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ব্যবহৃত জ্বালানি কীভাবে স্থানাভাবে স্থানীয় স্টোরেজের জায়গাগুলিতে জমা হয়ে থাকবে, সরকারি রিপোর্টে তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের নিউক্লিয়ার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা কি রাশিয়ার সরকারি সংস্থাগুলির এই রিপোর্ট খতিয়ে দেখেছেন? আর তাদের নিজেদের দুশ্চিন্তা কি তারা দূর করতে পেরেছেন?

এখন সামনের দিকে এগোনোর সবচেয়ে ভালো উপায় কী? রূপপুর থেকে বাংলাদেশের মানুষের বিপদ কতখানি সেটা কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যাবে? যেসব বিজ্ঞানী বাংলাদেশের শক্তির প্রয়োজন নিয়ে ভাবিত তাঁরা বলবেন যে এ বিষয়ে তাঁরা শান্ত ও নিরপেক্ষ বিতর্ক চান। শুধু ভীতির জন্য এটির বিরোধিতা করা অন্যায় হবে। আমি বিজ্ঞানী নই, অতিসরলীকরণের বিপদ সম্পর্কেও অবহিত, কিন্তু আমার কথা এই যে, নিউক্লিয়ার শক্তির বিপদ নিয়ে যে বিরাট আন্তর্জাতিক বিতর্ক চলছে সেটি এদেশেও খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিবেশী ভারতে যেমন তথ্যভিত্তিক এক বিতর্ক চলছে, বাংলাদেশেও সেটি প্রাসঙ্গিক। ভারতে তামিলনাড়ুর কুদানকুলাম নিয়ে যে জোরদার বিরোধিতা চলছে সেটির কেন্দ্রেও কিন্তু রাশিয়ার দেওয়া সেই একই ভিভিইআর চুল্লি। বাংলাদেশে জন-ঘনত্ব যেহেতু খুব বেশি আর প্রতিবছর যেহেতু এখানে নদীগুলিতে বন্যা হয়, বাংলাদেশ এ ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে পারে না। তাই, রূপপুরে কী হবে, তা নিয়ে আগে তথ্যভিত্তিক গণ-বিতর্ক হওয়া দরকার, যে বিতর্কে অংশ নেবেন বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা, নতুন প্রজন্মের শহুরে সমাজকর্মীরা এবং পাবনার চাষি-জেলেরা।

কাসভের পর

বিশ্বজিৎ রায়

ঘাতকের গোপন মৃত্যুর পর উল্লাসে মেতেছে কসাইয়ের দল।
চতুর্দিকে বাজছে বলির বাজনা— আর রক্ত চাই মাতৃবন্দনায়।
লোলজিহ্বা নৃমুণ্ডমালিনী ছুটেছে প্রতিশোধের খড়্গ নাচিয়ে,
ডাকিনী-যোগিনীর দল খুঁজে ফিরছে বিধর্মী অসুর।
ভিতর-বাইরে যত শত্রুদমনে তুষ্ট হবে করালবদনী,
পুজো নেবে পাড়ায় পাড়ায়, জগৎসভায় ভয়ঙ্করী রূপে।
এসময় প্রণিপাতে যত্ন নিই সন্ত্রাস-সম্ভ্রমে
এই মৃত্যু-উপত্যকা জেনো আমার স্বদেশ।

যদি ঘাতকের মুখে খুঁজে পাই বেপথু ভাইয়ের আদল
যদি হারানো সন্তানের মতো লাগে তাকে বধ্যভূমিতে
যদি তার জিঘাংসার নেপথ্যে থাকে আমার ক্রূরতা
যদি তার মূঢ়তায় লেগে থাকে আমারও ফুসলানি,
যদি তার মগজের বৃশ্চিক বাসা বেঁধে থাকে আমারও শরীরে,
তবে সে ধ্বংস হলে কি আমিও ধ্বংস হই?
বালকের মুখচ্ছবি নিয়ে প্রতিবেশী ঘাতক ঘুমোলে,
হনন-যজ্ঞের ফাঁকে আমি কি চিনতে পারি নিজেকে?

এতকাল হায়না আর শেয়ালেরা পরস্পরকে শেখালো,
জঙ্গলের নিয়মকানুন, মানচিত্র ছিঁড়েখুঁড়ে দখলদারি।
বন্দুকের জোরে। বুদ্ধ হেসে হেসে ক্লান্ত পোখরানে,
গাজীরা ঘুমোয় গোরস্থানে। কে কাকে সব শেখালো?
ঘাতকের মাংসলোভী মুখে ক্ষমতালোভী যাচনা শুনে কি
চণ্ডাশোকের সভা ধর্মাশোকের বেদনার শব্দ শুনেছিল?

জেনারেলরা তাকে দিল রুটির বদলে কাবাবের প্রতিশ্রুতি,
ধর্মপসারিরা শেখালো আলোর বদলে অন্ধকারের উপাসনা।
জেহাদি জন্নতের বদলে সে যদি ঠাঁই পেল ঘৃণার দোজখে
আমি তবে কোন স্বর্গে যাব একা একা?

মানচিত্র ছিঁড়েছে সহজেই, মাটি আর স্মৃতি যে ছেঁড়ে না!

দৃষ্টিকোণ

শিল্প-বান্ধব অথবা শিল্পপতি-বান্ধব কেন্দ্রীয় সরকার

মালবিকা মিত্র

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার খবর, "নিমন্ত্রণ বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি অনুভব করতে পারেন সেখানে আপনার কদর কতটুকু। শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। শিল্প সহায়ক পরিবেশ থাকলে আপনাকে ডাকতে হবে না, বিনিয়োগকারীরাই এগিয়ে আসবেন।" বক্তা হলেন ভারতে জার্মান রাষ্ট্রদূত মাইকেল স্টাইনার। তিনি আরও বলেন, "শিল্পপতিরা এখন দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কথা ভাবছেন। তাদের বিশ্বাস আর আস্থা অর্জন করাটা জরুরি।... পশ্চিমবঙ্গকে সেটাই অর্জন করতে হবে।" সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২.১২.১২। রাজ্যের শিল্পায়নের ১২টা বাজানো। বাংলার শিল্প ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ঘুম নেই। সমগ্র সংবাদটি পরিবেশনায় এটা স্পষ্ট যে স্টাইনার আনন্দবাজারের মনের কথাই বলেছেন। ...'এই তো স্টাইনার বলছেন'। এরও আগে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদ্ কৌশিক বসুর ছবি... 'এই তো ইনিও বলছেন', খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ চাই। একটা মরাল সাপোর্টই চায় আনন্দবাজার... আমরা একা নই... ইনি আছেন, উনি আছেন। আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে।

'রুকাবতকে লিয়ে হামে খেদ হ্যায়'। প্রথম আপত্তি, আনন্দবাজারের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সংবাদ নয়, ফুল পেজ বিজ্ঞাপন থাকে। বিজ্ঞাপনের মোড়কে থাকে সংবাদ। অতএব... প্রথম পৃষ্ঠা নয়, তৃতীয় পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় আপত্তি, সেই কবে থেকে আনন্দবাজার আর্থিক সংস্কারের কথা বলছে। খুচরো পণ্যে বিদেশি বিনিয়োগের প্রধান সমর্থক। অবশেষে মনমোহন সব দ্বিধা ঝেড়ে সাহসী পদক্ষেপ... ছাড়পত্র দিয়েছে। আনন্দবাজারের আনন্দের সীমা নাই। খুবই স্বাভাবিক। এতে আপত্তি কেন?

আপত্তির কারণ আছে বইকি! কথা হল, বিনিয়োগে আগ্রহটা কার? গত ৯ই ডিসেম্বর ২০১২ ওয়ালমার্ট সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ, "প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ইস্যুতে ভারতের অবস্থানকে প্রভাবিত করতে... ভারতে ব্যবসার পথ সুগম করতে মার্কিন সেনেট, মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস, মার্কিন ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ও মার্কিন বিদেশ দপ্তরকে পয়সা দিয়েছে সংস্থাটি"। কত টাকা? ১২৫ কোটি টাকা। কবে দিয়েছে? ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত। জানেন তো, সেপ্টেম্বর ২০১২-ই কেন্দ্রীয় সরকার এদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে অনুমোদন দিয়েছে। তাই বলছিলাম, পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহটা কার? ১২৫ কোটি টাকা ঘুষ!

ঘুষ না। কোনো সংস্থা তার নিজেদের কাজ হাসিল করতে একটি গ্রুপ ঠিক করে। সেই সংস্থা লাভের জন্য রাজনৈতিক-কূটনৈতিক-অর্থনৈতিক মহলে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। এর নাম 'লবি' করা। মার্কিন মুলুকে এই লবি করা আইনসিদ্ধ।

হ্যাঁ, মার্কিন মুলুকে আইনসিদ্ধ, কিন্তু এদেশে ওটা ঘুষ। সাধে কি ওবামা-রবার্ট ব্লেক-তিমোথি গিথনার-হিলারি ক্লিন্টনের এত চাপাচাপি! প্রেসিডেন্ট-বাণিজ্যসচিব-বিদেশসচিব-অর্থসচিব সবাই ব্যস্ত। ১২৫ কোটি টাকা... লবি। কিন্তু মনমোহন-চিদাম্বরম-সোনিয়ার তৎপরতার নেপথ্যে... কী আছে? এখানে 'লবি' নেই, তাহলে? মনে রাখবেন টমাস রো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চিঠি লিখেছিল "The best way to do your business in it (India) is to find some Mogul, that you may entertain for 1000 rupees a year, as your solicitor at court... he will serve you better than ten ambassadors." ভারতে ব্যবসা করতে হলে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এমন একজন মোগলকে পাকড়াও করা যাকে বছরে ১০০০ টকা দিলে সে তোমার সব কাজ করে দেবে, ১০ জন রাষ্ট্রদূতও অত পারবে না। অতএব প্রশ্ন উঠবেই, টেবিলের ওপর ১২৫ কোটি হলে টেবিলের তলায় কত? বিনিয়োগের জন্য আগ্রহ ও ব্যস্ততা আসলে কার? আনন্দবাজার শিল্পপতিকে সেই দশা থেকে বাঁচাতে চায়। এর নাম শিল্প-বান্ধব পরিবেশ। যথার্থ Solicitor!

সংকটে পড়েছে পুঁজিবাদ, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। লগ্নির লাভজনক ক্ষেত্র খুঁজছে। ঢের বেশি আবাসন, ঢের বেশি মোটর গাড়ি, ঢের বেশি কম্পিউটার তৈরি হয়েছে। না বিকোলে লাভ নেই। তাই এবার লক্ষ্য খুচরো পণ্যের ব্যবসা; ভারতে এই ব্যবসার সম্ভাব্য পরিমাণ ৫৪ লক্ষ কোটি টাকা। চিরহরিৎ অরণ্য, এখানে মন্দার সম্ভাবনা নেই। অতএব ওটা দিতে হবে। দিলে তবে শিল্প বান্ধব পরিবেশ। "জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলতে বলতে মুখ্যমন্ত্রী কখনো ড্রয়ার টেনেছেন, কখনো বেল বাজিয়ে অন্য কাউকে ডেকে তার সাথে কথা বলতে বলেছেন স্টাইনারকে।" ছিঃ। কী লজ্জা! কোথায় মুখ্যমন্ত্রী হাতে ফুল-বেলপাতা নিয়ে করজোড়ে বিনিয়োগ চাইবেন, তা না!

আসলে সংকট শিল্পপতির। অতিলাভের স্বপ্নে সে অপরিকল্পিত উৎপাদন করেছে, সকলেই একা লাভ করবে ভাবছে। ফলে বাজারের প্রকৃত চাহিদাকে প্রত্যেকে 'ওভার এস্টিমেট' করেছে। ফলশ্রুতি অতি-উৎপাদন সমস্যা। এই অবস্থায় লোকসান পূরণ করার উপায় হলো: ১) সেইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, যেখানে কখনো চাহিদা হ্রাস পাবে না। অর্থাৎ, ধান-চাল-তেল-সবজি-মুদিমশলা। চিরহরিৎ ক্ষেত্র, যেখানে মন্দা নেই। ২) বিনিয়োগ-এর শর্ত হবে শুল্ক ছাড়, নিখরচায় জমি,

নিখরচায় বিদ্যুৎ-পরিকাঠামো। এছাড়াও শ্রমিক পীড়নের আইনি সুযোগ। খাটানোর সময়সীমা থাকবে না, মজুরির ন্যূনতম সীমা থাকবে না, ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে না, বিমা থাকবে না, পেনশন-গ্র্যাচুইটি-পিএফ থাকবে না। এটা নামই শিল্প-বান্ধব পরিবেশ। তস্কর লুটেরার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা দরজা জানলা পাঁচিল ভেঙ্গে ফেলার নাম শিল্প-বান্ধব পরিবেশ। দারুণ Solicitor!

সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখতে পাই বাম জমানায় ইনফোসিস জমি পেয়েছিল, কিন্তু নতুন সরকার তাকে 'সেজ' গড়তে দেবে না। ইনফোসিস অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার 'SEZ' চায়। স্ট্রাইনার *সেজ* চায়। ওয়ালমার্টও চায়। স্টাইনার খোলামেলা বলেছেন— "বিনিয়োগ আকর্ষণ অনেকটা সুন্দরী প্রতিযোগিতার মঞ্চের মতো। সৌন্দর্যের মুকুট ছিনিয়ে নিতে প্রতিযোগীরা যেভাবে সেজেগুজে নিজেদের মেলে ধরেন।" স্টাইনার পাত্রপাত্রী দেখার কথা বলেনি; কারণ সেখানে নানাবিধ বিচার্য বিষয়। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় এক একটি আবরণ খসিয়ে, নিরাবরণ করে ইঞ্চি সেন্টিমিটার এককে সৌন্দর্য পরিমাপ হয়। স্টাইনার-ওয়ালমার্ট-আনন্দবাজার সকলেই চায় আমার বঙ্গমাতার শরীর থেকে একটি একটি করে আবরণ খসাতে... তারা বঙ্গজননীকে শিল্পপতির 'সেজ' রক্ষিতা বানাতে চায়।

বিদেশি কোম্পানি ও তার দেশীয় সাঙাৎ বাদামী সাহেবরা তৎপর; তাদের এদেশীয় 'Solicitor'-রা সক্রিয়। তারা উৎসুক, তাদের লোলুপ দৃষ্টি র‍্যাম্পের প্রান্তে সার্চ লাইটের আশেপাশে ...এবার বিবসনা বঙ্গমাতা আসবেন, এলো বুঝি। না, মা আসেন নি, আসবেন না। মুখ্যমন্ত্রী ইনফোসিসকে জানিয়ে দিয়েছেন কোনো 'সেজ' নয়। জানিয়ে দিয়েছেন, খুচরো পণ্যে বিদেশি বিনিয়োগ নয়, বাংলায় পরমাণ বিদ্যুৎ নয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হাতে ফুল বেলপাতা নিয়ে স্টাইনারকে ভক্তিগদগদ ভাব দেখান নি। ভাল লেগেছে। উল্টে বলে কিনা, সরকার দুধের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করবে লিটার প্রতি দু টাকা। অথচ দুধের দাম বাড়াবে না। সলিসিটর আনন্দবাজারের চিন্তা, 'ভর্তুকি ২০ কোটি টাকা'! কি সর্বনাশ। "স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের আরও দুবার পরীক্ষায় বসার জন্য ফি দিতে হবে না।"। সর্বোনাশ! কমিশন ১১ কোটি টাকা আয় হারাবে। আবারও ভর্তুকি! রাজ্যটা এরা শ্মশান করবে নাকি? ইনফোসিস-ওয়ালমার্টের কী হবে তাহলে? সেই চিন্তা সলিসিটর আনন্দবাজারের। তাদের চিন্তা বুঝি আরও বাড়লো। কারণ তরুণ শিল্পপতিদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন, "তারা কৃষি জমি নিয়ে শিল্প করার বিরোধী"। ফিকি-র সভায় ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় ঘোষণা করেন, 'শিল্পের জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে না।'

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার আমজনতার উপর থেকে ভর্তুকি কমালেও ঘোষণা করছে, "কর ব্যবস্থা নিয়ে শিল্প মহলের যাবতীয় সংশয় ও আশঙ্কা দূর করতে হবে"। চিদাম্বরম বলেন, "দুই বহুজাতিক ভারতের মাটিতে বাণিজ্যিক লেনদেন করবে, সরকার সেখানে নাক গলাবে না" ...রাজকোষ কত কোটি শুল্ক আদায় থেকে বঞ্চিত হবে? চুপ, এসব না করলে শিল্প পালাবে। আমাদের শিল্পপতি-বান্ধব কেন্দ্রীয় সরকার। শিল্পের জন্য ভর্তুকি চলবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসেবে একটা গর্ব করার সুযোগ ছিল, এই রাজ্যের সরকারি দল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল সিপিএম উভয়েই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ বিরোধী, উভয়েই পরমাণু বিদ্যুৎ চায় না। আর এগুলো সমর্থক জাতীয় কংগ্রেস এ রাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক। অতএব সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আশা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম কই! হতাশ হলাম। দুশ্চিন্তা দূর হলো না।

প্রথম দুশ্চিন্তা; এই সরকার সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম-জঙ্গলমহলের জল-জমি জঙ্গল রক্ষায় আন্দোলনের ধারক, কিন্তু বাহক হবে কি? আন্দোলনের স্মৃতি এখনো টাটকা, তাই এখনই জমির প্রশ্নে *সেজ* প্রশ্নে এফডিআই প্রশ্নে ইতিবাচক অবস্থান ঘোষণা করেছে। সন্দেহ জাগে এই অবস্থান কতদিন? কারণ এই সরকার কোনো বিকল্প পথের কথা বলে না। শহরের আলোকসজ্জা... লন্ডন... সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি ঘোষণা থেকে বুঝতে পারি উন্নয়ন প্রশ্নে পূর্বতন শাসকের পথেই চলবে এই সরকার। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেল এই সরকারের কাছেও সমাদৃত। বিদেশি-দেশি পুঁজির আবাহনে বা সরকারি উদ্যোগের বিসর্জনে এই সরকার অনাগ্রহী নয়। সর্বোপরি খুচরো ব্যবসায় এফডিআই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেও তৃণমূল দল এ প্রসঙ্গে সর্বনিম্ন স্তরে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে যত্নবান নয়। এফডিআই-এর বিপদ সম্পর্কে দলীয় কর্মীদের শিক্ষিত করে না। ফলে ব্যক্তিগত ভাবে বহু তৃণমূল কর্মী মনে করে এই 'সামান্য কারণে' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ অনুচিত হয়েছে, পেট্রোলের দামে সরকারের ভরতুকি অনুচিত, রেলে যাত্রীভাড়া বাড়ানোই উচিত। এইমতো অবস্থায় আমার আশঙ্কা সরকার খুব বেশিদিন ঘোষিত নীতি ও অবস্থান হয়তো বজায় রাখতে সক্ষম নয়। অতএব একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে সরকারের কাজে নজর রাখছি।

দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা; সিপিএম সহ সরকারি বামেরাও খুচরো ব্যবসায় এফডিআই বিরোধী। কিন্তু একটা বন্ধ ছাড়া আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে এরা সদর্থক ইতিবাচক ভূমিকা নেয় নি। বরং এরা কেন্দ্রে ও এ রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল বিরোধে আহ্লাদিত, কালনেমির লঙ্কাভাগে ব্যস্ত। দীর্ঘ ৩৪ বছরের সংসদীয় ক্ষমতার স্বাদ... তাই আজ যে কোনো ইস্যুকেই এরা ক্ষমতায় ফিরে আসার সোপান হিসেবে দেখে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়ার ক্ষমতা এদের নেই। বরং সংসদীয় ক্ষমতার বাইরে এরা জল ছাড়া মাছ। লক্ষণীয়, এই

এর পর ৪৭ পৃষ্ঠায়

শ্রমজীবীর ভারতবর্ষ

রতন খাসনবিশ

নয়া উদারবাদী অর্থনীতির আক্রমণের টার্গেট হলো শ্রমজীবী জনগণ। নয়া উদারবাদী অর্থনীতি হলো পুঁজি-চালিত মুক্ত বাজার অর্থনীতি। পুঁজির সঙ্গে শ্রমের (অর্থাৎ শ্রমশক্তির মালিকের) যে যুদ্ধ চলে, সেই যুদ্ধে পুঁজির পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরির কাজটা করে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি। পুঁজির পক্ষে যা সবচেয়ে অনুকূল, শ্রমের পক্ষে তা সবচেয়ে প্রতিকূল। নয়া উদারবাদী অর্থনীতি শ্রমিকের জন্য তৈরি করে সবচেয়ে প্রতিকূল এক পরিস্থিতি, শ্রমজীবী জনগণ হয়ে পড়ে এই অর্থনীতির আক্রমণের টার্গেট। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির আক্রমণে এ দেশের শ্রমজীবী জনগণ কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সর্বশেষ (২০০৯-১০) তথ্য অনুসারে, এদেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা হলো আনুমানিক ৪৬ কোটি। এর মধ্যে ৪২.৭২ কোটি হলেন অসংগঠিত শ্রমজীবী। এঁদের না আছে কর্ম নিরাপত্তা, না আছে নিয়োগকর্তা প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা। অসংগঠিত শ্রমজীবীদের সবাই অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রেই কাজ করেন, এ ধারণা ঠিক নয়। ৪২.৭২ কোটি অসংগঠিত শ্রমজীবীর মধ্যে ৩৮.৫০ কোটি কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে, আর ৪.২২ কোটি কাজ করেন সংগঠিত ক্ষেত্রে। বড় সংস্থার সিকিউরিটি স্টাফ থেকে রিসেপশনের সুবেশা তরুণী অথবা অতি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মোটরগাড়ি কারখানার শপফ্লোরে দাঁড়িয়ে টানা বারো ঘন্টা কাজ করছেন যে তরুণ শ্রমিক— এঁদের নিয়েই গড়ে উঠেছে সংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রের বিশাল এক কর্মীবাহিনী যাঁরা হলেন সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত অসংগঠিত শ্রমিক, যাদের কর্মনিশ্চয়তা নেই, যাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে নিয়োগকর্তার দায় নেই।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে ৩৮.৫০ কোটি শ্রমজীবী জীবিকা অর্জন করেন, যাঁদের মধ্যে ২৪.৪৮ কোটির ঠিকানা হলো কৃষি (এখনও ভারতের মোট শ্রমজীবীর ৫৩ শতাংশ কৃষিজীবী)। বাকি ১৪.২ কোটি শ্রমজীবী কাজ করেন অকৃষিক্ষেত্রে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা পাঁচ বছর অন্তর এদেশের নিয়োগ ও নিয়োগহীনতা সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বড় ধরনের সমীক্ষা করে। সমীক্ষালব্ধ তথ্য অনুসারে এদেশে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হবার পর প্রথম দু দশকের মধ্যে জীবিকার বিন্যাসে যে পরিবর্তন এসেছে তা এই রকম। কর্মক্ষেত্র হিসাবে কৃষির গুরুত্ব কমছে মন্থরগতিতে। জীবিকার উৎস হিসাবে গুরুত্ব বাড়ছে অসংগঠিত অকৃষিক্ষেত্রের। সংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদনে নতুন নিয়োগ যা আসছে তার মধ্যে অসংগঠিত শ্রমিকের (অর্থাৎ যে শ্রমিকের কর্মনিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নেই) গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। সংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রে অসংগঠিত শ্রমিকের অংশ, ১৯৯৯-২০০০ সালে ছিলো ৩৭.৮ শতাংশ। ২০০৪-০৫-এর নমুনা সমীক্ষায় তুলনীয় অংশটি বেড়ে দাঁড়ালো ৪৬.৬ শতাংশ। সর্বশেষ (২০০৯-১০) সমীক্ষায় দেখা গেছে, সংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মরতদের ৫৭.৮ শতাংশই অসংগঠিত শ্রমজীবী— যাদের যখন খুশি ছাঁটাই করা যায়। যাদের সামাজিক নিরাপত্তার দায় বহন করতে হয় না নিয়োগকর্তাকে। পাকা চাকরির জায়গা ছিল সরকারি নিয়োগ ক্ষেত্র। নয়া উদারবাদ সরকারকেও 'ডাউনসাইজ' করেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে এদেশে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়ে (প্রতিরক্ষা ও রেল সহ) মোট সরকারি কাজের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ। ২০০৯-১০ সালে সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৯৬ লক্ষ ২০ হাজার। সরকারি নিয়োগ ক্ষেত্র থেকে গত দশ বছরে প্রায় ৪৬ লক্ষ কাজ স্রেফ উবে গেছে। শুধু তাই নয়, আউটসোর্স করা মারফত অসংগঠিত শ্রমজীবী নিয়োগের প্রবণতাও ক্রমবর্ধমান সরকারি সংস্থায়।

সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগক্ষেত্র মিলিয়ে নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারীর সংখ্যা কত এদেশে? জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুসারে, সংখ্যাটি হবে আনুমানিক ৭.৫১ কোটি। এদের আছে কর্মনিরাপত্তা, আছে নিয়োগকর্তা প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা। ৪৬ কোটি শ্রমজীবীর মধ্যে বাকি সবাই এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে ১৫.১৩ কোটি আছেন, যারা ক্যাজুয়াল শ্রমজীবী— অর্থাৎ নিয়মিত এবং নিশ্চিত কাজের সংস্থান এদের নেই। ২৩.২৭ কোটি শ্রমজীবী আছেন যাঁরা স্বনিযুক্ত। যাঁরা স্বনিযুক্ত তাঁদের সবাই খুব খারাপ থাকেন এমন নয়। এঁদের মধ্যে একাংশ উচ্চ আয়ের পেশাজীবী (ডাক্তার, উকিল, কনসালটান্ট) হলেও নিম্ন আয়ের বৃত্তিজীবী, যাদের মধ্যে আছেন ছোট দোকানদার, আছেন নিম্ন আয়ের হস্তশিল্পী, আছে ক্ষুদ্র কৃষক, জমির আয়ে যাঁদের সংসার চলে না।

কেমন আছে শ্রমজীবীর ভারতবর্ষ? উচ্চ আয়ের পেশাজীবী এবং নিয়মিত বেতনভোগীর ওপরের অংশের মানুষদের নিয়ে যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে, যাঁদের আনুমানিক সংখ্যা ৭ কোটি, পরিবারভুক্ত লোকজন নিয়ে ২৫ থেকে ৩০ কোটি, ভারতবাসীর এই জগতটির অধিবাসীরা বলাই যায় যে সুখেই আছেন নয়া উদারবাদী উন্নয়নের দৌলতে। এঁরা অতি দ্রুত অর্জন করছেন উন্নত পুঁজিবাদী দেশের উচ্চমধ্যবিত্ত যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, সেই ধরনের জীবনযাত্রা। এঁদের বড় অংশটাই শহরবাসী— মেট্রো সিটি কিংবা অন্য শহরে এঁদের বিত্ত-সম্পত্তি থাকে। এঁদের ছেলেমেয়েরা দামী স্কুলে পড়তে যায়, এঁদের চিকিৎসা হয় বেসরকারি দামী হাসপাতালে কিংবা নার্সিংহোমে। এঁরা বিদেশে

বেড়াতে যান, দেশের শপিং মল-এ দামী জামাকাপড়ও কেনেন এঁরা। নয়া উদারবাদের উগ্র সমর্থক এই বিত্তবানদের কেন্দ্র করেই এদেশে গড়ে উঠেছে গাড়ির বাজার সহ অন্যান্য স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের বাজার। উৎপাদন হয় এই বাজারের চাহিদার কথা মনে রেখেই। এই বাজারে মন্দা দেখা দিলেই বিশেষজ্ঞদের কপালে ভাঁজ পড়ে। এদের বাজার চাঙ্গা রাখার জন্যই ব্যাঙ্কের ওপর সুদের হার কমানোর চাপ বাড়ায় নীতিনির্ধারকরা। ২৫-৩০ কোটি ভারতবাসীর এই বাজারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে যে উৎপাদন সংগঠিত হয়, তাকে কেন্দ্র করেই অসংগঠিত শ্রমজীবীদের জীবিকা ক্ষেত্রের প্রসারও ঘটে। শপিং মল-এর কর্মচারী, গাড়ির সার্ভিস সেন্টারের মিস্ত্রি, ইনসিওরেন্স বেচার কাজে যুক্ত এমবিএ— সবার কাজের বাজার চাঙ্গা থাকে, যদি এই ২৫-৩০ কোটি ভারতবাসীর জগতে আয় সৃষ্টির গতি অব্যাহত থাকে।

এর বাইরে, প্রায় ৯০ কোটি ভারতবাসীর যে জগৎ, নয়া উদারবাদ যাদের প্রান্তে-এ ঠেলে দিয়েছে, সে জগৎ হলো এই প্রান্তবাসী ভারতবাসীর জগৎ। কেমন আয় করেন এঁরা? এঁদের মধ্যে যাঁরা ক্যাজুয়াল কর্মী, ২০০৯-১০এ যাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১৫.১৩ কোটি, তাঁদের আয় সংক্রান্ত তথ্যটি এই রকম। ২০০৯-১০-এর মূল্যমানে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত একজন ক্যাজুয়াল শ্রমজীবী মাসে যদি ২৫ দিন কাজ পেয়ে থাকেন, তবে গ্রাম ভারতে তাঁর আয় হবার কথা মাসে গড়ে ৩৫০০ থেকে ৪০০০ টাকা। শহরে এই আয়ের অঙ্কটি হবে ৪৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা। যে ২৩.২৭ কোটি স্বনিযুক্ত শ্রমজীবী আছেন এ দেশে তাদের ৯৫ শতাংশের অবস্থা এর চেয়ে ভালো হবার কথা নয়। এর পরোক্ষ প্রমাণ আছে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার এই তথ্যে যে ক্যাজুয়াল শ্রমজীবী এবং স্বনিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যার ওঠাপড়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে— ক্যাজুয়াল শ্রমজীবীর সংখ্যা বাড়লে স্বনিযুক্তির সংখ্যা কমে, আর স্বনিযুক্তির সংখ্যা যে সমীক্ষায় বাড়ে, দেখা যায় সে সমীক্ষায় আনুপাতিক হারে কমে ক্যাজুয়াল শ্রমজীবীর সংখ্যা। বোঝা যায়, স্বনিযুক্তদের একাংশ সুযোগ পেলে ক্যাজুয়াল কাজ করেন আর ক্যাজুয়াল কর্মীরা কাজ না পেলে স্বনিযুক্ত ক্ষেত্রে জীবিকার সন্ধান করেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাই অনুমান করা যায় স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে গড়পড়তা আয় ক্যাজুয়াল কাজের চেয়ে বেশি হবে না। এদেশে ৪.৬ কোটি শ্রমজীবীর মধ্যে কমপক্ষে ৩৮ কোটি শ্রমজীবীর গড় আর্থিক অবস্থা ক্যাজুয়াল শ্রমজীবীর ক্ষেত্রে নমুনা সমীক্ষার তথ্যে যা পাওয়া গেছে, সেটাই হবার কথা। গ্রামাঞ্চলে মাসে গড়ে মাথাপিছু ৩৫০০ থেকে ৪০০০ টাকা আর শহরাঞ্চলে মাসে গড়ে ৪৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা আয় করেন এই শ্রমজীবীরা। এই হিসেবটা ২০০৯-১০ সালের। বর্তমানে অঙ্কটি কিছু বেশি হবে মূল্যবৃদ্ধির কারণে। মূলগতভাবে পরিস্থিতিটার খুব বেশি হেরফের হবার কথা নয় দুবছরের মধ্যে।

এই ধরনের আয় নিয়ে কীভাবে বেঁচে বর্তে থাকেন এদেশের সুবিপুল সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী পরিবারগুলি? বেঁচে থাকার জন্য শুধু চালডাল জোগাড় করলেই চলে না, দরকার হয় জ্বালানির। বেঁচে থাকতে হলে বাসস্থান লাগে, লাগে জামাকাপড়। কী করে এত সবের পিছনে খরচ করার সামর্থ্য আসে এই সামান্য আয় থেকে? উত্তরটা সোজা। বেঁচে থাকার তাগিদে সব খরচই ছাঁটাই করতে হয়, এমনকি খাওয়ার খরচ পর্যন্ত। এঁরা অনাহারে থাকেন না, থাকেন অর্ধাহারে। ফলত এঁরা হন অপুষ্টির শিকার। নয়া উদারবাদের ফেরিওয়ালারা যখন ৮ থেকে ১০ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ডঙ্কা বাজায়, তখন ন্যাশনাল রুরাল ফ্যামিলি হেল্‌থ মিশনের সমীক্ষা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে এদেশে এই নয়া উদারবাদী উন্নয়নের জমানায় ৪৫ শতাংশ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি খর্বিত (stunted) থাকে। ৪০ শতাংশ শিশুর ওজন থাকে কম, ৭৯ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতায় ভোগে, ৫৭ শতাংশ শিশুর থাকে ভিটামিন এ-র অভাব আর ৩৩ শতাংশ শিশুর থাকে আয়োডিন-স্বল্পতা। এরা পর্যাপ্ত খাবার পায় না, এরা হয় অপুষ্টির শিকার। যে মায়েরা এদের পৃথিবীতে আনেন, অপুষ্টির কাহিনী শুরু হয় তাঁদের দিয়ে। ন্যাশনাল রুরাল ফ্যামিলি হেল্‌থ মিশনের তৃতীয় সমীক্ষা (২০০৫-০৬)-র তথ্য বলছে, এদেশে মহিলাদের ৫৬ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভোগেন। বডি মাস সূচক ১৮.৫-এর কম, এমন মহিলারা এদেশের সমস্ত মহিলার ৩৩ শতাংশ। অশক্ত মায়েরা পৃথিবীতে আনেন অপুষ্ট সন্তান আর এরাই শেষ পর্যন্ত অশিক্ষার পর্যায় পেরিয়ে শ্রমজীবীর বাহিনীতে যোগ দিয়ে চায়ের দোকান চালান, মেট্রো রেলের মাটি কাটেন। ক্ষুধা এঁদের আর তাড়িয়ে বেড়ায় না, কেননা অপুষ্টির মধ্য দিয়ে বড় হওয়া এই শ্রমজীবীর ক্ষুধাবোধও কমে যায়। সমস্যা একটা থাকে। সেটা হলো সমষ্টিগত (macro) অর্থনীতির সমস্যা। সমষ্টিগত অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটাতে হলে স্রেফ পুঁজি ঢাললেই হয় না, দরকার হয় উন্নত মানের শ্রমজীবী। যে শ্রমজীবী অপুষ্টিতে ভোগেন, যাঁর বিদ্যাশিক্ষা প্রাথমিক স্কুলও ছাড়ায় না, সেই শ্রমজীবীর কাছ থেকে উন্নত মানের কাজ পাওয়া যায় না। উন্নয়নও তাই অধরা থেকে যায়। আমাদের নীতিপ্রণেতারা বাজারমুখী সংস্কার নিয়ে যতটা লাফান, তার সামান্য অংশের উদ্যোগ তাঁরা যদি এই অপুষ্টি রোধ আর শিক্ষাবিস্তারে ব্যয় করতেন, তাহলে দেশের এই হাল হতো না। বলা বাহুল্য, এটা তাঁরা শুনবেন না, কারণ বাজারমুখী সংস্কারের কেতাবে লেখা আছে, এসবের জন্য খাদ্য ও শিক্ষা খাতে যে ভর্তুকি দিতে হবে সেই ভর্তুকির টাকা যোগাতে গেলে বেসরকারি উদ্যোগপতিদের বিনিয়োগের টাকায় টানাটানি পড়বে। এর ফলে বিনিয়োগের হার কমে যাবে। বিনিয়োগের হার কমে গেলে জিডিপি-র বৃদ্ধির হার কমবে এবং তার ফলে নয়া উদারবাদ যাকে উন্নয়ন বলে সেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমবে— যেটা নাকি কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। নয়া উদারবাদ তাই ভর্তুকি ছাঁটাই করবে। ফলত খাদ্য নিয়ে সমস্যা থাকবে। সমস্যা থাকবে শিক্ষা নিয়েও। এসব নিয়েই ভারত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮

শতাংশের ওপর তুলে দেবে। যে তিরিশ কোটি ভারতবাসী স্বচ্ছল, তাদের ওপর ভরসা করে এই উন্নয়ন চালিয়ে যাওয়া অবশ্যই সম্ভব। এই উন্নয়ন মার্জিনে ফেলবে ৯০ কোটি ভারতবাসীকে, যাদের জন্য থাকবে অপুষ্টি ও অশিক্ষা। তিন চার হাজার টাকা পেলে এরা সারা বছর ঝুপড়িতে বসে 'নোকিয়া' জুতো বানানোর কাজ করে যাবে আর তিরিশ কোটির ভারতবর্ষ সে জুতো পায়ে দিয়ে উন্নত ভারতের বিজ্ঞাপন হিসেবে কাজ করবে বিশ্বের দরবারে।

শ্রমজীবীর ভারতবর্ষের সমস্যাটি নয়া উদারবাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। এটা যে সমস্যা নয় তা 'প্রমাণ' করার জন্য এবং এর দায় যাতে কোনোমতেই তাদের ভারতরাষ্ট্রকে বহন করতে না হয় তার জন্য নয়া উদারবাদের প্রবক্তারা ক্রমাগত এই দাবি করে থাকেন যে এদেশে দারিদ্র্যের প্রকোপ ক্রমাগত কমে আসছে নয়া উদারবাদী উন্নয়নের জমানায়। এ দাবি প্রমাণ করার জন্য তাঁরা প্ল্যানিং কমিশনের দারিদ্র্য সংক্রান্ত রেখা হাজির করে, যে তথ্যের ভিত্তি নাকি জাতীয় নমুনা সমীক্ষার মাসিক গড় ভোগ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য। এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে প্ল্যানিং কমিশনের দারিদ্র্যরেখা নির্ণয়ের অঙ্কটিতে গুরুতর ধরনের গোলমাল থেকে গেছে। দারিদ্র্য রেখা নির্ণয়ের কাজটা যখন শুরু করা হয়, সেই ১৯৭৮-৭৯ সালে ব্যক্তির খাদ্য লভ্যতার মাত্রা ধরা হতো গ্রামে দিনে মাথাপিছু ২২০০ ক্যালরি এবং শহরে দিনে ১৮০০ ক্যালরি। মাত্রা দুটি ঠিক করে দিয়েছিল যোজনা কমিশন নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি, এবং এ নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। কালক্রমে যোজনা কমিশন এই ক্যালরি ভিত্তিক মাপটিতে জল মেশাতে শুরু করে। সরাসরি ক্যালরি লভ্যতার হিসেব না করে তারা আনতে থাকে কিছু পণ্যের মূল্যসূচক নির্ভর একটি ব্যয়রেখা। এই ব্যয়রেখার সঙ্গে ২২০০ বা ১৮০০ ক্যালরির সম্পর্ক আর থাকলো না। ফলত এক সময় (২০০৪-০৫) এরকম দাঁড়িয়ে গেল যে গ্রামে দিনে মাথাপিছু যারা ২৬ টাকা খরচ করতে পারে, তারা আর দরিদ্র নয় যোজনা কমিশনের হিসেব মাফিক। শহরে যারা মাথাপিছু দৈনিক ৩২ টাকা খরচ করতে পারে, তাদেরকেও আর দরিদ্র বলা যাবে না যোজনা কমিশনের মতে। মনে রাখতে হবে, এই ২৬ টাকার মধ্যে ১৬ টাকা যাবে খাদ্যদ্রব্য কিনতে আর ১০ টাকা যাবে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য পণ্য কিনতে। অর্থাৎ গ্রামে যে পরিবার মাথা পিছু ১৬ টাকা খরচ করতে পারে খাদ্য জোটাবার জন্য, যোজনা কমিশনের হিসেবে সে পরিবারটি আর গরিব হিসেবে গ্রাহ্য হবে না। বলা বাহুল্য, এই তথ্য প্রকাশিত হবার পরই সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মহা সোরগোল ওঠে। বিষয়টা সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়ায়। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার বিষয়টি খতিয়ে দেখবার জন্য একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করে (তেন্ডুলকর কমিটি)। বিশেষজ্ঞ কমিটি শেষ পর্যন্ত সরকারের মুখরক্ষা করতে একটা নূতন হিসেব করে দরিদ্রের সংখ্যা কিছুটা বাড়িয়ে দেন। তাতেও অবশ্যই ত্রুটি আছে। তেন্ডুলকর কমিটি বিলক্ষণ বুঝতে পারে যে ২২০০ ক্যালরি পাবার মতো খাদ্য জোটাতে হলে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার হিসেব অনুসারে একটি পরিবারকে খাদ্যের পিছনে মাথাপিছু ১৬ নয়, ১৯ টাকা খরচ করতে পারতে হবে। সেটাকে পাশ কাটিয়ে তাঁরা অঙ্কটিকে ১৬ থেকে ১ টাকা বাড়িয়ে কোনো মতে বিতর্কটা চাপা দিয়ে দেন।

এরকমই চলতে থাকবে এদেশে, কেননা নয়া উদারবাদের কাছে ৯০ কোটির ভারতবর্ষ হলো সস্তায় ক্যাজুয়াল শ্রম জোটাবার ভারতবর্ষ। এই শ্রম যে ভারতবর্ষকে পুষ্ট করবে, সেই ৩০ কোটির ভারতবর্ষই নয়া উদারবাদের চোখে আসল ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ চলবে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়মে। এই ভারতবর্ষের বাজার ধরবে দেশি ও বিদেশি বেসরকারি পুঁজি। এই পুঁজি যা চায়, ভারতকে সেটাই করতে হবে। সেটার নামই 'সংস্কার'। সংস্কার প্রান্তে থাকা ভারতবাসীর জন্য ভর্তুকি কমাবে। সেই উদ্দেশ্যে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিয়ে অ্যাকাডেমিক জোচ্চুরি করতে হবে। যার ফলে এখন যে খাদ্য যোগাড় দেওয়া হয় স্বল্পমূল্যে, শেষ পর্যন্ত তার চেয়েও কম পরিমাণ খাদ্য যোগানোর দায় নিতে হবে ভারত রাষ্ট্রকে। সংস্কার গণবন্টন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কমাতে আনবে 'ক্যাশ ট্রান্সফার'। নিট ফল দাঁড়াবে এই যে খাদ্যের দাম বাড়লেও 'ক্যাশ' টাকার পরিমাণ বাড়বে না। ফলত প্রকৃত দায় কমে যাবে ভারত সরকারের।

প্রান্তিক ভারতবাসীর ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমবে। ট্যাক্স ছাড় এবং কর বাবদ সাবসিডি কিন্তু ক্রমাগতই দেওয়া হতে থাকবে দেশি এবং বিদেশি কর্পোরেট পুঁজিকে। প্রান্তবাসী ভারতবাসীর কাছে যা সাবসিডি, কর্পোরেটের ক্ষেত্রে তার নাম ইনসেনটিভ। একই সঙ্গে চলবে সরকারের জনহিতকর কাজকর্মে ব্যয় সংকোচনের কোপ। সরকারকে বাজেট ঘাটতি কমাতেই হবে কারণ বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার বাজার থেকে টাকা তুলে নেবার জন্যই নাকি বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের অর্থ জোটাতে পারে না। বাজেট ঘাটতি অবশ্যই কমবে এবার। কেননা সরকারকেই এবার 'ডাউনসাইজ' করা হবে। সরকার খরচ কমাবে, বাজারের টাকায় বিনিয়োগ বাড়াবে কর্পোরেট সেক্টর। এতেও যদিও বিনিয়োগের অর্থ না জোটে, তবে সেই অর্থ জোটানোর সমস্যা মেটাবার জন্য ব্যাঙ্ক এবং বিমার টাকা এবার কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কর্পোরেট হাউস নিজেই ব্যাঙ্ক খুলবে এর পর থেকে। এসবের সঙ্গে থাকবে লুঠপাট, থাকবে ওয়ালমার্টের ঘুষের অর্থের হাত বদল। এর পরও থাকবে বেকায়দায় পড়া কর্পোরেট সেক্টরের জন্য 'বেইল-আউট' প্রোগ্রাম। সব কিছু নিয়ে একটা চমৎকার ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড গড়ে উঠবে ৩০ কোটির ভারতবর্ষে। এর বাইরে থাকবে থার্ড ওয়ার্ল্ডের রিকেটি ভারত। সেটি নিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা নেই। আছে রাজনৈতিক সমস্যা।

সে সমস্যা মেটাবার জন্য আছে কলাবতীর দুঃখে কাতর রাহুল গান্ধী কিংবা অপুষ্টির শীর্ষে থাকা গুজরাটের ভাইব্রান্ট হিন্দু নেতা মোদি। শ্রমজীবীর ভারতবর্ষ নিয়ে তাই কোনো দুশ্চিন্তা নেই নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রনায়কদের।

আক্রান্ত শ্রমিক, আক্রান্ত শ্রমিক আন্দোলন

নব দত্ত

দেশের নানান প্রান্তে কারখানায় বিক্ষোভ

অন্ধ্রপ্রদেশের ইয়ালাম বলে একটি স্থানে 'রিজেন্সি সিরামিকস' কারখানা। ৮০০ জনের মত শ্রমিক কাজ করেন, স্থায়ী চাকরি এবং বাড়তি বেতনের দাবিতে ২০১২-র জানুয়ারিতে এঁরা ধর্মঘট করলেন। ধর্মঘটি শ্রমিকদের উপর পুলিশ নৃশংসভাবে আক্রমণ করল। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করল। এর জবাবে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে কোম্পানির প্রেসিডেন্টকে দৈহিক আক্রমণ করল। এর ফলে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট মারা গেলেন। এছাড়া, কোম্পানির সম্পত্তিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হোল।

হরিয়ানার গুঁরগাও। 'ওরিয়েন্ট ক্রাফট' একটি পোষাক প্রস্তুতকারক সংস্থা, এটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি Tommy Hilfiger, DKNY, Gap ইত্যাদির জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করে। রপ্তানিকারক এই সংস্থার একহাজারের মতো ঠিকা-শ্রমিক দুদিনের ধর্মঘটের ডাক দিলেন। ঠিকাদার ও তার গুন্ডাবাহিনী অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল ধর্মঘটরত ঠিকা-শ্রমিকদের উপর। পাল্টা আক্রমণে কোম্পানির গাড়ি জ্বললো, পুলিশের সাথে সংঘর্ষে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর হোল। ঘটনায় গ্রেপ্তার হলো ঠিকাদার সহ একাধিক শ্রমিক। কোর্ট ঠিকাদারদের জরিমানা করে ছেড়ে দিলেও শ্রমিকদের জেল দিলেন।

২০১২ জুলাই মাসে হরিয়ানার মানেসরে সুজুকি কারখানায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। ঘটনাটির কথা আজ অনেকেই জানেন। খবরে প্রকাশ, শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে ম্যানেজারদের নির্মমভাবে মেরেছেন, এবং একজন ম্যানেজার নিহত হয়েছেন। সাধারণভাবে এই ঘটনা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু কেন ঘটনাগুলি ঘটে, এবং এই ঘটনার দায় কার? বেশ কিছু বছর ধরেই গাড়ি এবং গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরি হয় এমন শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ চলছে। শ্রমিক অসন্তোষ হয়েছে ২০০৯ মে এবং ২০১১ মার্চ মাহিন্দ্রাতে; গুরগাঁও সানবিম গাড়ী কারখানায় মে ২০০৯; ঐ বছরেরই জুলাই পুণের বোসক চেসিসে; আগস্টে হন্ডা মোটরসাইকেল কারখানায়, গুরগাঁও রিকো অটোয়। এছাড়া গুরগাঁওয়ের সমস্ত গাড়ি কারখানায় একদিনের ধর্মঘট হয়। প্রিকোল-কোয়াম্বাতুর আগস্ট, ২০১০, এমআরএফ টায়ার, চেন্নাইতে অক্টোবর, ২০১০ ও জুন ২০১১। জেনারেল মোটরস, হ্যালন্স, গুজরাতে, মার্চ ২০১১। মারুতি-সুজুকির মানেসর জুন-অক্টোবর ২০১১। বোসক বেঙ্গালুরু সেপ্টেম্বর, ২০১১। ডানলপ, হুগলি অক্টোবর, ২০১১। কাপারো শ্রীপেরুমবুডার, তামিলনাড়ু, ডিসেম্বর, ২০১১। ডানলপ, আম্বাতুর, তামিলনাড়ু, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। হুয়ান্ডি, চেন্নাই এপ্রিল ও ডিসেম্বর, ২০১১ এবং জানুয়ারি ২০১২।

বিভিন্ন রাজ্যের গাড়ি কারখানায় প্রায় ২২টার মতো উল্লেখযোগ্য শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে গত তিন বছরে। মানেসরের ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড়। অথচ এই ধরনের কারখানায় অসন্তোষের সত্যি কারণ যেটা সেটা খতিয়ে দেখার কাজ তাঁরা করলেন না। তাহলে তো অত্যধিক মুনাফা ও শ্রমিক শোষণের এক ভয়ঙ্কর ছবি সামনে চলে আসবে যা বর্তমানে শাসকদের সমর্থক-পুষ্ট হয়ে পুঁজি কীভাবে দিনের পর দিন সমস্ত ধরনের প্রচলিত আইনকে ভেঙ্গে চলেছে তা তুলে ধরবে।

বেশ কিছু বছর ধরে গাড়ি শিল্পে খুব দ্রুত উৎপাদন বেড়ে চলেছে। ২০০৪-০৫ এ সমস্ত গাড়ির মিলিত উৎপাদন ছিল ৮৫ লক্ষ, ২০১০-১১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে শুধু যাত্রী পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ির উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ১২ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ, উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি মোট আয় বৃদ্ধিতে শ্রমিকের অংশ ২.০৯ লক্ষ (২০০০-০১) থেকে বেড়ে ৭.৯ লক্ষ (২০০৯-১০) হয়েছে, অথচ এই আয় থেকে শ্রমিকদের বেতন বাবদ প্রাপ্য অর্থ ২৭.০৪ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১৫.০৪ শতাংশ। শ্রমিকদের দিনে ৮ থেকে ১৬ ঘন্টা কাজ করতে হয়। গুরগাঁও-মানেসর-বাওয়াল দিল্লীর বাইরের দিকে। এখানে দেশের গাড়ি শিল্পের ৬০ শতাংশ উৎপাদন হয়। এখানে যারা কাজ করেন তাদের ৮০ শতাংশ শ্রমিক ঠিকাদার নিযুক্ত— সংখ্যাটা প্রায় ১০ লাখ হবে। এদের দিনে ৮-১৬ ঘন্টা কাজ করতে হয়। ঠিকা শ্রমিক এবং শিক্ষানবিশ শ্রমিক— এঁরাই গোটা উৎপাদনী ব্যবস্থার গরিষ্ঠ অংশ, স্থায়ী শ্রমিক সামান্যই। মারুতি-সুজুকির মানেসরের কারখানার শ্রমিক চিত্রটির অবস্থাটা দেখলেই বোঝা যাবে। যেমন মোট শ্রমিকের মধ্যে ৯৭০ জন স্থায়ী শ্রমিক, ৪০০-৫০০ জন ট্রেনি, ১১০০ জন ঠিকাশ্রমিক, এছাড়া ২০০-৩০০ জন অ্যাপ্রেন্টিস। এই ছবি ভারতের প্রায় সব গাড়ি ও যন্ত্রাংশ কারখানায়।

ঠিকা শ্রমিক ও কম মজুরি

ফ্যাক্টরি সেক্টরে প্রকৃত মজুরি ২০০০-০১ সালে ছিল গড়ে ৪৫,৫০০ টাকা। যা কমে ২০০৯-১০ সালে হয়েছে ৪৪,৫০০ টাকা। এরই ফলশ্রুতিতে সারা দেশে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে। এটাকে 'হিংসা' বলে দায় এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র

ফ্যাক্টরি সেক্টরে প্রকৃত মজুরি কমেছে তাই নয়, গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার কমেছে, স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ কমেছে। দেশে ১০০টি সংস্থায় সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যাচ্ছে: সিমেন্ট, লোহা, স্টিল এবং কটনে ১৯৯৭-৯৮ এর তুলনায় ২০০৩-০৪ ঠিকা শ্রমিক বেড়েছে। বিশেষ করে নির্দিষ্ট শিল্প ধরে এই সমীক্ষা দেখিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে চটশিল্পে এবং গুজরাটে বস্ত্র শিল্পে মোট শ্রমিকদের মধ্যে ৭০-৭৫% ঠিকা-শ্রমিক।

২০০৪-০৬ সংগঠিত শিল্পে ঠিকা শ্রমিক (শতাংশ)

অন্ধ্রপ্রদেশ	৫৫.২৩
হরিয়ানা	৪৪.১২
গুজরাট	৩৪.২৮
রাজস্থান	৩৩.৫১
উত্তরপ্রদেশ	৩১.৪৮
মহারাষ্ট্র	৩১.২৭

শিল্প ধরে ঠিকা শ্রমিকের হিসাব করলে দেখা যায়: সবচেয়ে বেশি ঠিকা শ্রমিক তামাকজাত শিল্পে (৬৬.১৯%), নন-মেটালিক মিনারেল (৪৮.৯৯%), পেট্রোলিয়াম শিল্পে (৪৩.১৬%), বেসিক মেটালস (৩৪.০৩%), রিসাইক্লিং (৩৬.৮০%), ফেব্রিকেটেড মেটালস (৩৯.২৮%)। লক্ষণীয় হলো, প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পগুলিতে ঠিকা শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি।

সরকার ও তার সমর্থকরা শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিকদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভে হিংসার প্রকাশ দেখতে পান, অথচ এটা দেখতে পান না। একাধিক কমিশন বহুবার মতামত দিয়েছে, সুপারিশ করেছে ঠিকা শ্রমিক ব্যবস্থা বিলোপের। কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, কোর্টের রক্ষাকবচ নিয়ে বহাল রয়েছে এই বৈষম্য।

এবার আমরা ঠিকা শ্রমিক বিলোপের জন্য সুপারিশগুলির একটি খতিয়ান নিই:

- ১৯৩১ রয়েল কমিশন অন লেবার (হুইটলি কমিশন) সুপারিশ করে ঠিকা শ্রমিক বিলোপের;
- ১৯৩৭ বোম্বে টেক্সটাইল লেবার ইনকোয়ারি কমিটি বদলি শ্রমিক তুলে দেওয়ার কথা বলেছে;
- বিহার লেবার এনকোয়ারি কমিটি কনট্রাক্ট লেবার বিলোপের সিদ্ধান্ত জানায়;
- বিচারপতি গজেন্দ্র গাডকরের নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল কমিশন অন লেবার ১৯৬৯ সালে কনট্রাক্ট লেবার সিস্টেম বিলোপ করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন; ইত্যাদি।

গুরগাঁও ইত্যাদির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট একটি নোট দিয়েছে ঠিকা শ্রম নিয়ে, যেখানে বলা হয়েছে নিয়মিত শ্রমিকদের সাথে ঠিকাশ্রমিকদের বেতনের ফারাক বিস্তর। বেতন বৈষম্য ছাড়াও তাদের কাজের কোনো সময়সীমা না থাকা ইত্যাদি কারণে দেশে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে ঠিকা শ্রম আইনে। আসলে হঠাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের বোধোদয় থেকে মন্ত্রীসভা স্তরে এইসব আলোচনা হচ্ছে না। এইসব আলোচনার উৎপত্তির উৎসে রয়েছে সারা দেশে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ। বিষয়টা নৈরাজ্য/হিংসাত্মক/বিরোধীদের চক্রান্ত বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি সহ রাজ্যস্তরে একাধিক শ্রমিক মোর্চা একজোট হয়েছে। গত বছরে ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশজোড়া ধর্মঘট অনেকাংশে সফল হয়েছে, আগামী ২১/২২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে আবার ধর্মঘট ডেকেছে সম্মিলিত শ্রমিক সংগঠনগুলি। এই সব শ্রমিক সংগঠনের অধিকাংশই রাজনৈতিকভাবে পরস্পরবিরোধী হলেও এক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থে কতকগুলি দাবিতে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জোট বেঁধেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, বেশ কয়েকটি ডান/বাম ট্রেড ইউনিয়ন রাজ্যে বা কেন্দ্রে নানান সময় ক্ষমতায় থেকেছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, এঁদের ভূমিকা সবসময় শ্রমিকস্বার্থের অনুকূলে ছিল না। এসব ন্যায্য বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আজকের শ্রমিকদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে জোটবদ্ধ হওয়া ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো রাস্তাও খোলা নেই।

২০১১ সালের হিসাবে দেশে ৪১ কোটির মত শ্রমিকের মধ্যে ফ্যাক্টরি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক সাড়ে ৪ কোটির মতো, যার মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ শ্রমিক ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। এক্ষেত্রে একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। দেশজোড়া ব্যবসা রয়েছে এমন প্রায় ১০০টি নামী সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমসম্পর্ক নিয়ে সমীক্ষা চালায় ইন্ডিয়ান স্টাফিং ফেডারেশন (আইএসএফ)। তাতে দেখা যায়, এইসব সংস্থায় যারা কাজ করেন তাদের প্রায় ৫০ শতাংশ ঠিকা শ্রমিক। এই ধরনের ৩৪ শতাংশ সংস্থায় গড়ে ৫০০০-১০০০০ টাকা মাসিক বেতন পায়, ১৫ শতাংশ ১০০০০-১৫০০০ টাকা বেতন পান। দেখা গেছে, একজন ঠিকা শ্রমিক স্থায়ী শ্রমিকের চেয়ে মাসে অন্ততপক্ষে ১৫০০ টাকা কম পান। এসব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কিনা জানা নেই, কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যকে জানিয়েছে, দিনে ১১৫ টাকার কম ন্যূনতম মজুরি (দৈনিক) যেন নির্ধারণ না করা হয়। আর কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ দাবিগুলির অন্যতম হলো: সারা দেশে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি মাসিক ১০ হাজার টাকা অর্থাৎ দিনে ৩৩৩ টাকা করতে হবে।

শোভন কাজ

অমর্ত্য সেন ও স্টিগলিজ-এর মত খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদরা বিশ্বায়ন ও তার প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনায় খুবই গুরুত্ব দিয়ে শ্রম সম্পর্কের এই বিষয়টি নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন— 'শোভন কাজ' (Decent Work) কী বা কাকে বলা হবে।

আইএলও-র এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় 'শোভন কাজ' বলতে বোঝায়, যে কোনো নারী বা পুরুষ শ্রমিক যে কাজে যুক্ত থাকবে তাতে স্বাধীনতা থাকবে, বৈষম্য থাকবে না, সামাজিক নিরাপত্তা থাকবে, মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন কাজ হবে। বেতনভুক কর্মসংস্থান, স্বনিযুক্তি, গৃহশ্রম ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এর স্বপক্ষে আইএলও আরও স্পষ্টভাবে যে নীতিসমূহ ঘোষণা করেছে সেখানে বলা হয়েছে: লেবার স্ট্যান্ডার্ড ও শ্রমিক/কর্মচারীর সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা, যৌথ দরকষাকষি থাকবে, কোনোরকম বৈষম্য থাকবে না, শিশু শ্রম থাকবে না।

সম্মানীয় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা ও আইএলও যাই বলুন, সারা বিশ্বেই শ্রম সম্পর্কে এসব নীতি নিয়ম মানা হচ্ছে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক শাসনব্যবস্থা ও অনুমোদিত সমাজ এই তত্ত্ব মানে না। তাদের বক্তব্য হলো: "কাজ না থাকার চেয়ে খারাপ কাজ, খারাপ বেতন ভাল (Bad jobs at bad wages are better then no jobs). অর্থাৎ কাজকে কাজ হিসাবে দেখা হোক, তার আবার ভাল-মন্দ/শোভন-অশোভন (decent-indecent) কী? ১৯৯৯-২০০৪ সালে দেশে ৬ কোটি নতুন কাজ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৮৫ লাখ সংগঠিত ক্ষেত্রে, বাকি পুরোটাই অসংগঠিত/অসুরক্ষিত (informal/unorganised sector)।

আইএলও ২০০৪ এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, ২১ শতকে বিশ্বে উৎপাদন সম্পর্কিত সংগঠনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বের ৬৫ হাজার বহুজাতিক সংস্থা তাদের নিয়ন্ত্রিত আরও ৮ লাখ ৫০ হাজার মুখ্য সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বের/উৎপাদনী ব্যবস্থাটিকে চালাচ্ছে। এসব সংস্থা তাদের চাহিদামতো দ্রুত উৎপাদন করিয়ে নিতে একধরনের শ্রমব্যবস্থা চালু করেছে যার ফলে শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে না, কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা মানা হচ্ছে না, শিল্প দুর্ঘটনার শিকার হয়ে শ্রমিকের পেশাগত অসুস্থতা বাড়ছে, নারী ও পুরুষ শ্রমিক আলাদা আলাদাভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, সামাজিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

পেছন দিকে এগিয়ে যান

১৮৮৪ সালে এন এম লোখান্ডে-এর নেতৃত্বে মিল হ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন বোম্বাই শ্রমিকদের সভায় ৫৫০০ জন শ্রমিকের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি পেশ করে। সেদিনের দাবিগুলি আজও দেশের ৯০ শতাংশ অসংগঠিত শ্রমিকের দাবি। আসুন, একবার দেখে নিই সেদিনের সেই দাবিগুলি:

(ক) রবিবার প্রতিটি শ্রমিককে পুরো ছুটি দেওয়া;

(খ) প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আধঘন্টা বিশ্রাম;

(গ) কারখানার কাজ সকালে শুরু করে সূর্যাস্তের মধ্যে বন্ধ করা;

(ঘ) চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আগের মাসের বেতন দেওয়া;

(ঙ) কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও শ্রমিক আহত বা অক্ষম হয়ে পড়লে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পুরো বেতন দেওয়া;

(চ) কোনও শ্রমিক পঙ্গু হয়ে গেলে তার পরবর্তী জীবনধারণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া;

এর ১২৮ বছর পরে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, পালাবদল, সরকার পরিবর্তন এসব সত্ত্বেও কি মনে হচ্ছে কোনও কিছু পাল্টেছে?

১৮৮১ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত কারখানায় কাজের সময় ছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। এই সময়ে গরমের দিনে একজন শ্রমিককে প্রায় ১৫ ঘন্টা কাজ করতে হোত।

১৮৯১ সালে ফ্যাক্টরি আইন সংশোধন হলো। এরপরে বৈদ্যুতিক আলো আসার পর কারখানায় কাজের ঘন্টা রাত ৮-৯টা পর্যন্ত হয়ে গেল।

পরাধীন দেশে শ্রমিকের সমানাধিকারের কথা যখন বলা হয়েছে তখন তার ন্যায্যতা নিয়ে সমাজ প্রশ্ন তোলেনি। আজকের সমাজ শ্রমিকের দাবির ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এটা দেখার বিষয়— এলিটবর্গ যারা ক্ষমতার কেন্দ্রে আছে, যারা চিন্তায় মননে এগিয়ে, তারাও শ্রমিকের অধিকার নিয়ে যুক্তিতর্ক শানাচ্ছে।

সরকার প্রচুর আইন করেছেন শ্রমিকের স্বার্থে। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেশ কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু হয়েছে। এটা বিশ্বায়ন পরবর্তী একটা ধারা। শ্রমিকদের যেসব ন্যায্য আইনি অধিকার ও আইনি সুরক্ষা ছিল রাষ্ট্র পরিচালকরা ক্রমশই সেসব সংকুচিত করে অথবা শিকেয় তুলে দিয়ে সামনে আনছে প্রকল্প, প্রজেক্ট, স্কিম ইত্যাদি। এর মাধ্যমে একটি ব্যবস্থার জন্ম হচ্ছে এবং সামাজিক অনুমোদনও কম-বেশি পাচ্ছে যেখানে দাতা-গ্রহীতার অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সারা ভারতে আইনি রক্ষাকবচ আছে গোটা শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে মাত্র ২ কোটির। তারাই শ্রমিকদের সংগঠিত অংশ। আর আছে আরও ৩ কোটি কর্মজীবী যারা সরকারিভাবে আইনি সুরক্ষা পায়, বাকি ৪০ কোটির কোনোরকম আইনি সুরক্ষা নেই। যদিও একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে স্বীকৃত আইনি অধিকারের বাইরে আর কোনো অধিকার থাকবে না। এর বাইরেও ন্যায্যতা, সমতা, নৈতিকতার অধিকার থেকে যায়, যার দাবিও অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর আছে। বিশ্বায়নের নীতির ফলে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদের কর্মসংকোচন ঘটেছে, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে, নিজেদের দেশের সরকারের অমানবিক নীতির ফলে একটা তারা একটা দুঃসহ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে, তারা আসলে একটা কাঠামোগত হিংসা (structural violence)-র শিকার। এটা

রাষ্ট্রীয় হিংসা, পুলিশ গুলি চালালে বা লাঠির বাড়ি মারলে সেই হিংসাটা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই যে মানুষগুলিকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এও কম বড়ো অপরাধ নয়। মজুর তার মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, দরকষাকষি করতে পারবে না, ফুটপাতের ধারে থাকবে, রেললাইনের ধারে থাকবে। পুঁজির হাতের পুতুল করে, শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এই শ্রমজীবী মানুষদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

প্রশ্ন হলো, মজুরি দাসত্বের অবস্থা থেকে আমরা কতটা এগোতে করতে পেরেছি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দাসত্ব শব্দটা নিয়ে হয়ত আপত্তি উঠবে। বাজার অর্থনীতির দাবি, সব খোলা বাজারে ছেড়ে দাও। কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, বাজারের হাতে থাকবে সবকিছুই। বাজার ঠিক করবে কী দাম হবে, কী উৎপাদন হবে, কে কিনবে, কীভাবে কিনবে। এইসব, গুণমান, চাহিদা, জোগান, সবই নিয়ন্ত্রণ করার কথা বাজারের। এদিক থেকে দেখলে শ্রমকেও খোলা বাজারে ছাড়ার কথা, কিন্তু একমাত্র শ্রমকেই একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হচ্ছে।

সরকারি ঘোষণা মতো শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি যাতে মালিক দেয় সেইটা দেখা সরকারের কাজ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা একটা প্রতিশ্রুতি, আইনেও তা স্বীকৃত। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সরকার এটা করছে না, শ্রমের সরকার-নির্ধারিত মূল্য পুঁজি, শিল্প, নিয়োগকর্তা কেউই দিচ্ছে না, এমনকি সরকারও না। শ্রমিক সমস্যায় সবসময় বলা হয় একটা সংকটের কথা, আর এই সংকটের কথা বলে শ্রমিককে স্বল্প মজুরিতে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। শ্রমিকের জন্য এই ব্যবস্থায় সবসময় একটি নিরাপত্তাহীনতার খাঁড়া ঝোলানো আছে। রাষ্ট্র, সমাজ সর্বত্রই এমনকি রাজনৈতিক অবস্থানকে পুঁজি এই বিশ্বাস করিয়ে দিতে পেরেছে যে শ্রমিককে নিরাপত্তা/সুরক্ষা দিলে কাজ পাওয়া যাবে না। একটা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা শ্রমিকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যা তাকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিচ্ছে, তুমি যাই কর না কেন তার বদলে তুমি যা পাচ্ছ সেটাই ন্যায্য। এই 'ন্যায্যতা'কে মান্যতা দেওয়া চেষ্টা হচ্ছে সব স্তরে।

তথ্য সহযোগিতায়

1) Growth, Employment and Labour Market
2) The Roaring Nineties : Joseph Stiglitz
3) Social Justice and Labour Jurisprudence
4) Amartya Sen and Jean Dreze Omnibus
5) দুর্বার ভাবনা, জানুয়ারি ২০১২, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ
6) ILO Report
7) Aspect, RUPE
8) Contract Labour in India

আক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন

শ্যামল দাস

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে শহিদ হওয়া মানব সভ্যতার ইতিহাসে বা আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে নতুন নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের শুরুতে সংখ্যাগুরুর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই গড়ে তুলতে, বা অর্জিত, সংবিধান স্বীকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লড়াই-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বা নিছক অংশগ্রহণকারী হিসাবে মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে।

শঙ্কর গুহ নিয়োগী এবং ড: দত্ত সামন্ত এরকমই দুটি চরিত্র। দুজনেই ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের, শ্রমিকদের আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অক্লান্ত সেনানী। ১৯৯১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভিলাইয়ে ঘুমের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান শঙ্কর গুহ নিয়োগী। তাঁকে হত্যা করে ভিলাই অঞ্চলের শিল্পমালিকদের নিযুক্ত 'সুপারি কিলার'রা। আর ১৯৭৯-এর ১৬ জানুয়ারি নিজের বাড়ির সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান আশির দশকে গড়ে ওঠা মুম্বাই সুতাকল শ্রমিকদের আন্দোলনের অন্যতম নেতা ড. দত্ত সামন্ত। এক্ষেত্রেও পরে দেখা যায় 'সুপারি কিলার'রা জড়িত। যদিও জানা যায়নি কে নিযুক্ত করেছিলো সুপারি কিলারদের। মালিকরা নয়ত? ১৯৭৫ সালে তিনি কংগ্রেস দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি-র সাথে যুক্ত থাকলেও জঙ্গি শ্রমিক নেতা হিসাবে জরুরি অবস্থার সময় কারারুদ্ধ হন।

এসবই গত শতাব্দীর ঘটনা। দল্লী-রাজহরার খনি শ্রমিকদের সংগ্রাম বা মুম্বাই সুতাকল-কাপড়কল শ্রমিকদের সংগ্রাম আজ ইতিহাস। ১৯৯০-এর দশকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে চালু হওয়া বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া মালিক-শ্রমিক সম্পর্ককে আরো জটিল করেছে। মুম্বাই-এর সুতাকল গুলি উঠে গিয়ে পরিণত হয়েছে রিয়েল এস্টেটে। যদিও বর্তমান আলোচনার বিষয় ভিন্ন, প্রাসঙ্গিক হবে বলে গত শতাব্দীর দুজন শ্রমিক নেতার প্রসঙ্গ এখানে আনা হয়েছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে আসে পরিকাঠামো-গত সংস্কার যার মোদ্দা কথা হচ্ছে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব থেকে ক্রমে অব্যাহতি দেওয়া। সমগ্র জনগণকে খাদ্য-দ্রব্য বণ্টনের জন্য সে সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় গোড়া থেকেই। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলোর একই অবস্থা। রাষ্ট্র কিছু কিছু ঘোষণা করেই বা নির্দেশনামা জারি করেই খালাস। সর্বজনীন শিক্ষার বিশেষত গ্রাম-শহরের গরীব মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার কোন দায় তার নেই। দায় নেই নাগরিক স্বাস্থ্যের।

তা হলে রাষ্ট্র করবেটা কি? কেন, তার সম্পদ নিলাম ডেকে বিক্রি করবে। জমি বেচবে, খনিজ সম্পদ বেচবে, জঙ্গল বেচবে, নদী বেচবে, সমুদ্র উপকূল বেচবে। কিন্তু, যে সমস্ত অঞ্চল রাষ্ট্র (সে কেন্দ্রই হোক বা রাজ্যই হোক) বিক্রি করবে যেখানে কিছু মানুষ বাস করতে পারে। কিছু মানুষের জীবন সেই সব অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল হতে পারে। যে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অর্থাৎ কারখানা বিক্রি হবে সেখানে কিছু শ্রমিক চাকরি করতে পারেন। তাঁদের কী হবে?

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যত এগিয়েছে ততই এসব বেড়েছে অত্যন্ত দ্রুততায়। যদিও এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার। মাঝে ছয় বছরের জন্য ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। যদিও মূলগত বিচারে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে, তার প্রয়োগ নিয়ে, জাতীয় স্তরের প্রধান দুটি দল কংগ্রেস ও বিজেপি এবং রাজ্য স্তরের বা আঞ্চলিক স্তরের দলগুলির মধ্যে মূলগত কোন ফারাক নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে কৌশল হিসাবে তারা কখনও কখনও বিশ্বায়নের প্রয়োগকে তূলনামূলক কম দ্রুততায় বা কমমাত্রায় লাগু করতে চায় বা করে চলেছে।

রাষ্ট্রের সব আলোকপ্রাপ্ত মানুষ, ছাত্র-যুবসমাজের একটি অংশ, শ্রমজীবী মানুষ বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী নাগরিক সমাজ— এসব বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন নি। তাঁরা কলম ধরেছেন, রাস্তায় নেমেছেন, গণতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন মেনে আন্দোলন-প্রচারসভা-জমায়েত-সেমিনার করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের যে সব ধারায় নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য লিখিত আছে, সেসব নিয়ে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সামনে আবেদন রেখেছেন। সংবিধানের নির্দেশিকা যাতে লাগু হয়, রাষ্ট্র যাতে নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে— এসব বিষয়ে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নির্দেশিকা পাঠিয়েছে রাষ্ট্রকে।

না। এসব সত্ত্বেও রাষ্ট্র বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে পিছু হঠেনি। অন্যদিকে রাষ্ট্র লাগু করেছে তথ্য জানার অধিকার আইন-২০০৫, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি আইন, জঙ্গলের অধিকার আইন, শিক্ষার অধিকার আইন প্রভৃতি। হয়ত আগামি বাজেট (২০১৩) অধিবেশনেই আসবে খাদ্য নিরাপত্তা আইন।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈপরীত্যের নিদর্শন এই আইনগুলি। একদিকে উপরিলিখিত আইনগুলি ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রসারিত করেছে আর অন্যদিকে ১৯৯০ থেকে শুরু হওয়া বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শ্রমজীবী গরীব-গুর্বো মানুষকে প্রান্তিকতম জীবনযাপনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেমন ধরা যাক সম্প্রতি শেষ হওয়া কংগ্রেস দলের জয়পুরে অনুষ্ঠিত

'চিন্তন শিবিরে' কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ঘোষণা করেছেন তাঁরা 'ক্যাশ ট্রান্সফার' প্রকল্প চালু করবেন। অর্থাৎ গরিব মানুষ ভর্তুকিতে খাদ্য দ্রব্য বা পরিষেবা পাবেন না। তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকির টাকা জমা করা হবে। গরিব মানুষ বাজার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য-দ্রব্য বা স্বাস্থ্য পরিষেবা কিনবেন। আর ভর্তুকির টাকা তাঁর ব্যাঙ্ক খাতায় সরাসরি জমা করা হবে। অথচ দেশে ৪০ শতাংশ মানুষের ব্যাঙ্কের খাতা নেই। আর এই ৪০ শতাংশ মানুষই যে চরমতম দারিদ্র্যের শিকার সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক, ভারতীয় গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তরে প্রসারিত করার যত চেষ্টাই হোক না কেন, অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। সাধারণ মানুষের প্রায় প্রতিটি আন্দোলনে নামছে আক্রমণ। প্রথমে আমরা মূলত সেই আক্রমণের একটি অংশ— তথ্য জানার অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের হত্যা— সম্পর্কিত কিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করব। শুধুমাত্র ২০১০ সালেই খুন হয়েছেন ১০ জন আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট। নীচে তার তালিকা দেওয়া হল।

এ ছাড়া আরও আরটিআই অ্যাক্টিভিস্টকে হত্যা করা হয়েছে। কারণ তাঁরা আরটিআই আইনের মাধ্যমে সরকারি দপ্তরের কাছে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। তাঁদের জানতে চাওয়া তথ্য সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত করেছিলো। মধ্যপ্রদেশের শীলা মাসুদ এদের মধ্যে অন্যতম। এই বছরের জানুয়ারি মাসে কর্ণাটকে হত্যা করা হয়েছে দু'জন আরটিআই অ্যাক্টিভিস্টকে। কারণ তাঁরা যে বেআইনি নির্মাণ সম্পর্কে আরটিআই আইনের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন। আবার ঝাড়খন্ডে হত্যা করা হয়েছে তিনজন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার আইন (NREGA) অ্যাক্টিভিস্টকে। তাঁরা হলেন নিয়ামত আনসারি, ললিত মেহতা ও বিকাশ যাদব।

উপরের ঘটনাগুলি আমরা জানতে পেরেছি প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার কারণে। এরকম ভাবার সঙ্গত কারণ আছে যে অনেক ঘটনাই হয়ত প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই আইনগুলি দ্বারা নির্ধারিত অধিকার খর্ব করা হয় আরও সুচতুর ভাবে। যেমন অনতি-অতীতে আমাদের রাজ্যে গ্রামের মানুষকে NREGA-র কাজ পেতে হ'লে শাসক দলের তাঁবেদারি করা আবশ্যিক ছিল। শাসক দলের আঞ্চলিক দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের জো-হুজুর না হ'লে বিপিএল তালিকাভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও NREGA-র কাজ পাওয়া যেত না। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা পাল্টালেও নিয়মের, বা বলা

ক্রমিক সংখ্যা	*নাম*	*রাজ্য/জেলা*	*কীভাবে হত্যা করা হয়*	*কেন হত্যা করা হয়*	*তারিখ*
১)	অমিত জেঠওয়া	গুজরাত	গুলিতে হত্যা	নির সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বেআইনি খাদান এর ব্যাপারে আরটিআই আবেদন	২০.০৭.১০
২)	দত্তাত্রেয় পাটিল (কৃষক)	কোলাপুর/মহারাষ্ট্র	পিটিয়ে, ছুরি চালিয়ে হত্যা	আরটি আই আবেদন করেছিলেন কোলাপুর মিউনিসিপালিটির কাউন্সিলারকেনা বেচার ব্যাপারে	৩১.০৫.১০
৩)	ভিট্টল গীতে	বিদ/মহারাষ্ট্র	হত্যা	নিজের গ্রামে স্কুলের বেনিয়ম ফাঁস করেন	২১.০৪.১০
৪)	অরুন সাওয়ান্ত	বদলাপুর/মহারাষ্ট্র	গুলিতে হত্যা	আর টি আই অ্যাক্টিভিস্ট	২৬.০২.১০
৫)	সতীশ শেঠি	পুণে/মহারাষ্ট্র	আক্রান্ত হন	মুম্বাই-পুণে সড়ক নির্মানে দুর্নীতি ফাঁস	১৩.০১.১০
৬)	ভিশরাম লক্ষণ গেড়িয়া	আমেদাবাদ	গুলিতে হত্যা	বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যাপারে তথ্য জানতে চান	১১.০২.১০
৭)	শশীধর মিশ্র (ফুটপাথ হকার)	বেগুসরাই/ গিবহার	গুলিতে হত্যা	১০০০ এর বেশি আরটিআই আবেদন করেন হত্যার আগে	১৪.০২.১০
৮)	রামদাস সাভে গাওকর	নামদেদ/মহারাষ্ট্র	পাথর ছুঁড়ে হত্যা	বালি মাফিয়াদের ব্যাপারে তথ্য জানতে চান	আগস্ট ২০১০
৯)	গোলা বঙ্গ রাও	কৃষ্ণা জেলা	হত্যা করা হয়	গ্রামে নর্দমা তৈরির ব্যাপারে তথ্য জানতে চান	১১.০২.১০
১০)	ইরফান ইউসুফ কাজি	জয়িতাপুর মহারাষ্ট্র	পুলিশ জীপের ধাক্কায় মারা যান	জয়িতাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তথ্য জানতে চান	১৮.১২.১০

ভালো বে-নিয়মের, কোন হেরফের হয়েছে এমন দাবি করা যাবে না। ২০০৫-০৬ সাল জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠা রেশন আন্দোলন, অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনার চালের জন্য আন্দোলন ছিল এ ধরনের সুচতুর প্রয়োগের বিরুদ্ধে। বিপিএল তালিকাভুক্ত ভর্তুকি প্রাপ্ত খাদ্য-দ্রব্য পাওয়ার জন্য নির্ধারিত কার্ড রেখে দিত রেশন ডিলাররা। আর ভর্তুকিপ্রাপ্ত সমস্ত খাদ্য বা তার একটা অংশ বেচে দিত খোলা বাজারে। আর আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতারা বা তাদের কার্টেল সামলাতো গণবিক্ষোভকে, মদত করত রেশন ডিলারকে।

একদিকে, আদিবাসী মূলবাসীদের জন্য চালু হয়েছে ফরেস্ট রাইটস্ আইন, বনাধিকার আইন। নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই আইন চালু হয়েছে জঙ্গলের ওপর, তাঁরা যেখানে বাস করেন সেই জল-জমি-জঙ্গলের ওপর আদিবাসী-মূলবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। আর অন্যদিকে অ্যালুমিনিয়াম আকর বক্সাইট উত্তোলনের জন্য বেচে দেওয়ার জন্য চুক্তি হয়েছে স্টারলাইট শিল্পগোষ্ঠীর সাথে। যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী পূর্বঘাটের নিয়ামগিরি পাহাড়ে বাস করেন তাঁদের জীবন সম্পূর্ণ ভাবে নির্ধারিত নিয়ামগিরি পাহাড় আর তার দরাজ প্রকৃতির উপর। পানের জল আসে নিয়ামগিরি পাহাড়ের জলাশয় আর ঝরনা থেকে। কিন্তু ডোঙ্গরিয়া কোন্দ আদিবাসীদের যে কোন মুহূর্তে নিয়ামগিরি পাহাড় থেকে উৎখাত হতে হবে স্টারলাইট ও কেন্দ্র/রাজ্য সরকারের চুক্তির কারণে। আসলে অধিকারও দেওয়া হলো আবার তাদের উৎখাতও করা হবে। ভর্তুকির টাকা নিয়ে কৌম জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলো কী করবেন তার উত্তর মিলবে না! কুদানকুলামে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হবে। হতেই হবে। ফুকুশিমার অনতি-অতীতের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও। যে সুনামির আঘাতে ফুকুশিমার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিপর্যয় নেমেছিল, সেই সুনামিতে প্লাবিত হয়েছিল তামিলনাড়ুর উপকূলও। কুদানকুলাম জায়গাটিও সমুদ্র তীরবর্তী। চার-পাঁচ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার উৎখাত হলেও কুদানকুলামেই পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র চাই। কারণ পশ্চিম ইউরোপের নাগরিক সমাজ পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র গুটিয়ে ফেলার পক্ষে। সেখানকার সরকারও গণ-চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করবে না। চালু কেন্দ্রগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হবে ২০২০ সালের মধ্যে। সুতরাং পরমাণু বিদ্যুতের প্রযুক্তির বড় ক্রেতা ভারতবর্ষ। অতএব নাগরিকের জীবন-জীবিকা রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব আপাতত চুলোয় যাক্। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুদানকুলামের মানুষের আন্দোলনের উপর কীরকম রাষ্ট্রীয় আঘাত হানা হয়েছে তা নিয়ে আমরা অনীক-এর পাতায় বারবার আলোচনা করেছি।

ন্যূনতম মজুরি আইন চালু আছে। আবার শহরে একরকম, গ্রামে একরকম। দিল্লী রোড দুর্গাপুর রোড বরাবর গড়ে ওঠা কারখানাগুলিতে হাতে গোনা উদ্যোগে ন্যূনতম মজুরি আইন চালু আছে। অধিকাংশ কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কোন পরিচয়পত্রই নেই। সম্প্রতি দিল্লী রোডে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় পরিচয়পত্র দেবার দাবি জানিয়েছে শ্রমিকেরা। কারণ, পরিচয়পত্র না থাকার অর্থ কারখানার মধ্যে কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকটির মৃত্যু হ'লে তাকে অনধিকার প্রবেশকারী বা চোর বলে চালানো যাবে। বাস্তবে এ ধরনের ঘটনার নজির আছে অনেক। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের পর এই হচ্ছে শ্রমিক অধিকারের নমুনা। প্রভিডেন্ড ফান্ড-ইএসআই তো অনেক দূরের ব্যাপার। আর শ্রমিকদের আইনি অধিকারগুলিকে আইনসঙ্গতভাবে উপায়ে ভঙ্গ করার জন্য লাগু হয়েছে *সেজ* আইন। যার মূল উদ্দেশ্য ১৯৪৭ পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে লাগু হওয়া সংবিধান-স্বীকৃত অধিকারগুলির লঙ্ঘন বা সীমাবদ্ধকরণ। সুতরাং শ্রমিক-আন্দোলনের (সংগঠিত ক্ষেত্র সহ) অ্যাজেন্ডায় আজ যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, পরিচয়পত্র দেবার দাবি, প্রভিডেন্ড ফান্ড-ইএসআই চালু করার দাবি বা শিল্পভিত্তিক মজুরির পরিবর্তে ন্যূনতম মজুরির দাবি। অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষ কার্যত তাঁদের আইনি অধিকারের প্রশ্নে সামনে না এগিয়ে পিছিয়ে গেছেন।

একদিকে আরটিআই আইনের মাধ্যমে গত কয়েকবছরে একের পর এক কেন্দ্রীয় সরকার বা অনেক রাজ্য সরকারের বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি ফাঁস হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার অন্যদিকে তৃণমূল স্তরে যে সমস্ত ব্যক্তি আরটিআই আইনকে আইনি লড়াইয়ের হাতিয়ার করেছেন তাঁদেরকে জীবন দিয়ে সেই লড়াইয়ের মূল্য চোকাতে হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাকে, সেই ব্যবস্থার যাঁরা রূপকার, অর্থাৎ সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন স্তরের আমলাতন্ত্রকে, দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই আইন অন্যতম হাতিয়ার। সদ্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি প্রতিভা পাতিল তাঁর ৫ বছরের মেয়াদকালে বিদেশ ভ্রমণে যে দেশের প্রায় ২০০ কোটি টাকা খরচ করেছেন তা জানা গেছে আরটিআই আইনের মাধ্যমেই। সম্প্রতি বিপদে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক পান্ডা আরটিআই আইনের পরিসরকে ছোট করার কথা ভাবছেন।

NREGA-র মাধ্যমে রাষ্ট্র বিপিএল তালিকাভুক্ত নাগরিকদের বছরে ১০০ দিন কাজ পাবার অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। এই অধিকার কেন পুরোপুরি লাগু হবে না, কেনই বা রাষ্ট্রের কাছে কমপক্ষে ২০০ দিন কাজ পাবার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে না— এই দাবি কে তুলবে?

আইনি বামপন্থীরা এ সমস্ত বিষয়ে খুব বেশি এগোবেন না। অন্তত গত ৩৪ বছরের পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। মূলধারার বামপন্থীদের বাদ দিলে মাওবাদী সহ (অবশ্য তারা যদি গণআন্দোলন গড়ার ব্যাপারে সিরিয়াস হন)

এর পর ৩৮ পৃষ্ঠায়

আক্রান্ত গ্রামবাসী

শুভ্রকেতন বসু

উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বই মানব ইতিহাসের অন্যতম চালিকা শক্তি। এই তত্ত্বায়নের ওপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছে ও তার ফলে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব কীভাবে বদলে গেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমেই স্বীকার করে ভালো যে এখানে উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের বিষয়টিকে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। তুলনায় উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব যে মহান কৃষক সংগ্রামগুলির জন্ম দিয়েছে, বা কৃষি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে ছোট বড় সংঘর্ষগুলি ঘটে চলেছে তার সম্পর্কে আলোচনা কম। তাই লেখাটি অসম্পূর্ণ। তবে ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন চমকপ্রদ। এই বিষয়টি বিশদে আলোচনা হলে, কৃষিতে শ্রেণী সংগ্রামের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারব।

শিল্পায়নের ফলে বড় বড় শহরে জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবন ঘটলে ও তার সঙ্গে কৃষিজ পণ্যের পণ্যায়ন ঘটলে তা উৎপাদন স্থল থেকে দূরে চলে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়। শহরে জনঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে বেশি বেশি কৃষিজ পণ্য শহরে আসে ও সেখানেই ব্যবহৃত হয়। এই কৃষিজ পণ্যের মধ্যে খাদ্য বা শিল্পের কাঁচামাল, দুই-ই থাকে। যে কোনো উদ্ভিদ কম করে ১৫ রকমের মৌলিক পদার্থ জমি থেকে শোষণ করে এবং সেগুলিকে দেহকোষে আবদ্ধ রাখে। তাই কৃষির পণ্য যখন উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী স্থানে আসে তখন তার মধ্যে এই মৌলগুলি থাকে এবং কোনো প্রাকৃতিক উপায়ে সেগুলি আর উৎপাদন ক্ষেত্রে ফিরে যেতে পারে না। এই ভাবে কৃষি বাস্তুতন্ত্র ও কৃষির ফসলের ভোক্তাদের মধ্যে এক বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়। মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি বিপাকীয় ফাটল (metabolic rift)।

যে কোনো নগরায়ন বা শিল্পায়নই এক বিপাকীয় বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। কৃষিজ পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র থেকে দূরে রপ্তানি হলে কৃষি বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়ে না। বহু প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষি জমির ক্ষয় পূরণ হতে থাকে। যেমন, বাতাসের নাইট্রোজেন বহু প্রাকৃতিক ও জৈবিক উপায়ে জমিতে আসে। বন্যার জল জমিতে যে পলি সিঞ্চন করে তার মাধ্যমেও অনেক মৌলিক পদার্থ জমিতে ফিরে আসে। উদ্ভিদের মনুষ্যভোগ্য অংশের তুলনায় অন্যান্য অংশের ভর বেশি হয়। কৃষিজ পণ্যের মাধ্যমে উদ্ভিদের সামান্য অংশই রপ্তানি হয়। যেমন দেশীয় ধানে দানা ও খড়ের অনুপাত ১:৩ বা ১:৪। এই ধরনের ধানের সবটাই যদি রপ্তানি হয়ে যায় তাহলেও উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত মৌলিক পদার্থের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রপ্তানি হবে। অন্যদিকে তথাকথিত উচ্চ ফলনশীল জাতগুলিতে দানা ও খড়ের অনুপাত ১:১। তাই এক্ষেত্রে দানা সবটা রপ্তানি হয়ে গেলে উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত মৌলিক পদার্থের অর্ধেকই চলে যাবে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে দূরে। উদ্ভিদের যে অংশ মানুষ সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না সেগুলি পশুখাদ্য হিসেবে, জ্বালানি হিসেবে বা সরাসরি সার তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশুর মল জ্বালানির ছাই সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এই ভাবে মাটি থেকে শোষিত মৌলিক পদার্থগুলি আবার মাটিতেই ফিরে আসে। এই ভাবে কোনো কৃষি বাস্তুতন্ত্র থেকে যে হারে মৌলিক পদার্থ নিষ্কাশন হয় তা যদি প্রাকৃতিক বা জৈবিক উপায়ে ক্ষয় পূরণের হারের থেকে কম হয় তাহলে জমির উর্বরতা শক্তি অটুট থাকবে। কোনো রাসায়নিক সার প্রয়োগ ছাড়াই তা যথেষ্ট ফলন (তথাকথিত উচ্চফলনশীল ফসলের সমান বা বেশি) দেবে। এই রকম পরিস্থিতিতে জমিই হবে কৃষি উৎপাদনের প্রধান ও অনন্য উপকরণ। কৃষিক্ষেত্রে বিবাদমান শ্রেণীগুলির প্রধান লক্ষ্যই হবে জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। প্রাক সবুজ বিপ্লব যুগের সমস্ত কৃষক আন্দোলনে জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল প্রধান দাবি।

রাসায়নিক সার আসার আগে গোবর সারই ছিল প্রধান সার। গরু পোষা ছিল বাধ্যতামূলক। দুধের জন্য, হাল চালানোর জন্য, পরিবহনের জন্যও গরু ব্যবহার করা হতো। বড় বড় জোতের মালিকরাই গরুর মালিক হতো। এই গরু দেখাশোনা করার জন্য প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্রমের প্রয়োজন ছিল। ফসল প্রক্রিয়াকরণের প্রত্যেকটি ধাপে মানুষ বা পশুর পেশি শক্তিই ছিল শক্তির একমাত্র উৎস। উৎপাদিকা শক্তির এই স্তরে জমি মালিকের কাছে বাঁধা মজুর ছিল অপরিহার্য। জোতদার জমিদার বা ধনী চাষির বাড়িতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন কাজের জন্য মজুরের প্রয়োজন হতো। চাষের সময় লাঙল করে ধান রোয়া, আগাছা নিড়ানো, ফসল বাঁধা ও খামারজাত করা— এ সব কাজ তো ছিলই, তাছাড়াও সারা বছর ধরেই গরুর দেখাশোনা করা, খড় কাটা, ধান সেদ্ধ ও শুকানো, ঢেঁকিতে ধান ভাঙানো এসব কাজ লেগেই থাকত। অদ্বৈত মল্লবর্মনের অসামান্য উপন্যাস *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ একজন বাঁধা মজুরের সারা দিনের কাজের জীবন্ত বর্ণনা দেওয়া আছে। জমির মালিকেরা তাই বাঁধা মজুর চাইত। অর্থনীতি বহির্ভূত বলপ্রয়োগ করে মজুরকে বেঁধে রাখা

ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। ছলে বলে কৌশলে ছোট চাষির জমি গ্রাস করে ক্রমাগত নিজের জমির পরিমাণ বাড়ানো ছিল গ্রামীণ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর এক সাধারণ প্রবণতা। সুদ ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য ছিল গরিব চাষির জমির শেষ ফালিটুকুও দখল করা।

অন্যদিকে উৎপাদিকা শক্তির এই অবস্থায় এমন কৃষক পরিবারের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল যারা কেবল নিজের পারিবারিক শ্রমে ৫ একর জমি চাষ করতে পারত। এই পরিবারগুলিকে মজুর নিয়োগ করতে হতো না এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অপরের জমিতে যেতেও হত না। কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন হাল-বলদ, কাস্তে, ঢেঁকি, বীজ, কৃষি-সংক্রান্ত জ্ঞান এবং জমি— সবই ছিল এই পরিবারগুলির হাতে। এই চাষিরা উৎকৃষ্ট জৈব সার ফলাতে জানত, জৈব কীটনাশকের ব্যবহার জানত, নিজের চাষের বীজ নিজেই উৎপাদন করত। এদের চাষে পুঁজির ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর। প্রাক সবুজ বিপ্লব যুগে যে অজস্র দেশীয় ধানের ভ্যারাইটি পাওয়া যেত তাদের ফুল ফোটা এবং ফসল পাকার সময় ছিল বিভিন্ন। তাই একটি পরিবার যদি ৫ একর জমিও চাষ করতো তাহলেও সমস্ত জমির ফসল একসঙ্গে রোয়া বা কাটার চাপ থাকত না। অল্প অল্প করে তিন-চার দিন সময়ের ব্যবধানে এক এক জাতের ধান রোয়া বা কাটা যেত। সঠিক জাত নির্বাচন করে ৫ একর জমিতে ১৫ রকমের ধান চাষ করলে ধানগুলি আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ থেকে মাঘের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন সময় পাকবে। ফলে অল্প সংখ্যক মজুরই পর্যায়ক্রমে ধানগুলিকে কেটে খামারজাত করতে পারবে। এর জন্য কখনোই একসঙ্গে অনেক মজুরের প্রয়োজন হত না। একটি কৃষক পরিবার বাইরে থেকে মজুর নিয়োগ ছাড়াই নিজের পরিবারের শ্রমে সমস্ত কাজটা করতে পারত। এই অবস্থায় একজন ক্ষুদ্র প্রান্তিক বা ভূমিহীন চাষির স্বপ্ন ছিল একখণ্ড জমির মালিক হবার যাতে সে স্বাধীন ভাবে সসম্মানে বাঁচতে পারে। একখণ্ড জমির মালিক হবার ফলে সে তার সমস্ত শ্রম ও মেধা ব্যবহার করত উৎপাদন বাড়াতে, তাতে তার পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য আসত, সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়ত। উৎপাদিকা শক্তির ঐ অবস্থায় মেহনতি কৃষকের স্বপ্ন পূরণের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল বৃহৎ জোত। তাই জমি দখল ও পুনর্বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কৃষক আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। চাষি তার লাল সেলাম দিয়েছিল লাল নিশানকে।

সবুজ বিপ্লবের ফলে পরিস্থিতি বদলালো। সবুজ বিপ্লবে এমন ধান গমের চাষ শুরু হলো যাদের চাষে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক অপরিহার্য। এর ফলে কৃষি বাস্তুতন্ত্রের অনেক উপকারী অণুজীব মারা পড়তে লাগলো, কৃষি জমির খাদ্যখাদক শৃঙ্খল ভেঙে পড়ল। জমির বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, যারা বায়ুর নাইট্রোজেন জমিতে নিয়ে আসে, অবলুপ্ত হতে থাকল। পোকার প্রাকৃতিক খাদক ব্যাঙ গিরগিটি প্যাঁচা ইত্যাদি পোকামারা বিষের প্রভাবে মারা পড়তে থাকল। ফলে পোকার উপদ্রব পাল্লা দিয়ে বেড়ে চললো। সবুজ বিপ্লবের ধান গমে দানা ও খড়ের অনুপাত ১:১, ফলে দানা রপ্তানির মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহে আবদ্ধ মৌলের অর্ধেকটাই কৃষি ক্ষেত্র থেকে দূরে চলে যায়। সবুজ বিপ্লবের ধান গম চাষে জলের যোগান সুনিশ্চিত করতে বড় বড় নদী বাঁধ দেওয়া হয়। অথবা মাটির তলা থেকে জল তোলা হয়। এর ফলে জমিতে জল আসে ঠিকই কিন্তু বন্যার জলে যে প্রচুর পুষ্টি পদার্থ থাকত তার থেকে জমি বঞ্চিত হতে থাকে। প্রসঙ্গত বলা ভালো যে বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের আগের যুগে বন্যার এই ভয়াবহ চেহারা প্রায় ছিল না। সেই সময় বন্যায় বিস্তীর্ণ কৃষি জমি দেড় দু ফুট জলের তলায় চলে যেত এবং দিন দুয়েকের মধ্যে জল নেমে যেত। এই বন্যায় মানুষের যতটুকু অসুবিধা হতো বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার অনেক সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব ছিল। যাই হোক, সবুজ বিপ্লবের ফলে জমি থেকে যে পরিমাণ পুষ্টি পদার্থ অপসারিত হতে থাকল তার হার প্রাকৃতিক পুষ্টি পদার্থের ক্ষয়পূরণের চেয়ে বেশি, ফলে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন বাড়তে থাকল। সবুজ বিপ্লবের পর থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার অল্প অল্প করে বাড়তে বাড়তে আজ বেশ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পৌঁছেছে। দেশের অধিকাংশ জমিই আজ ট্রাক্টরে চাষ হচ্ছে। অন্যদিকে প্রাণীসম্পদ দপ্তর থেকে ক্রমাগত বিদেশি ষাঁড়ের শুক্রাণুর সাহায্যে দেশি গরুর গর্ভ সঞ্চার করার ফলে যে ষাঁড় জন্মাচ্ছে তার ভারতীয় খর গ্রীষ্মে লাঙল টানার ক্ষমতা নেই। গরিব প্রান্তিক চাষি চাইলেও লাঙল টানার উপযোগী বলদ পাচ্ছে না। ফলে গ্রামে গরুর সংখ্যা কমছে। এর ফলে গোবর সার দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে। কৃষিতে কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ার ফলে চাষে পুঁজির ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে।

উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে জমির যে একচ্ছত্র ভূমিকা ছিল তার ক্ষয় হচ্ছে। সবুজ বিপ্লবের পরে একটি দুটি ধান ও গমের ভ্যারাইটির চাষ দেশ জুড়ে শুরু হয়। একই ভ্যারাইটির চাষ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হলে সমস্ত ধান একবারে রোয়া ও কাটার প্রয়োজন পড়ে। বোরো চাষের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্যি। বোরো ধান কাটার সময় বর্ষার আশঙ্কা থাকে, ফলে সমস্ত ধান তাড়াতাড়ি একবারে কাটার দরকার পড়ে। এর ফলে চাষের এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে জমিতে প্রচুর মজুর নিয়োগ করার দরকার পড়ে। গ্রামের ধনিক শ্রেণী এখন ট্রাক্টরের সাহায্যেই চাষ করে, বাজার থেকে কিনে সার ব্যবহার করে, মেশিনের সাহায্যে ধান ঝাড়ে ও রাইস মিলে ধান বিক্রি করে দেয়। তাই ফসল কাটা, ঝাড়া, সেদ্ধ, শুকনো করা বা ঢেঁকিতে ধান ভানা, গরুর দেখাশোনা করা ইত্যাদির জন্য সারা বছর ধরে মজুরের দরকার পড়ে না। বরং চাষের কতকগুলি বিশেষ সময়ে প্রচুর মজুর লাগে। তখন বাইরে থেকে মজুর আমদানি করতে হয়। উৎপাদিকা শক্তির এই অবস্থার ফলে মজুরের শ্রম অবাধ হয়ে উঠলে গ্রামীণ ধনী চাষিদের অসুবিধা হয় না। মজুরের শ্রমশক্তি বিক্রির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ধনী চাষিরা সাহায্য করছে

এমনও হয়েছে। বর্ধমানে ধান কাটার মরশুমে পুরুলিয়া থেকে মজুররা আসে। পুরুলিয়ার ধনিক শ্রেণীর একাংশ এই বহির্গমন আটকাতে গেলে বর্ধমানের ধনিক শ্রেণীর সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে এবং বিষয়টিতে উভয় জেলা প্রশাসন হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। পুরুলিয়া থেকে আগত মজুর মজুরির টাকা জমিয়ে নিজের বন্ধকি জমি ছাড়িয়ে নিয়েছে এমন ঘটনাও নথিবদ্ধ আছে।

উৎপাদিকা শক্তির এই অবস্থায় ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষিরও চাষের জন্য নগদ অর্থের দরকার পড়ে। অল্প জমিতেও একসাথে সব ফসল কাটার দরকার থাকলে শুধু পারিবারিক শ্রমে তা করা যায় না, বাইরে থেকে মজুর লাগাতে হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এই নগদ অর্থ যোগাড় করার জন্য চাষের মরশুম বাদে অন্য মরশুমে নানান পেশায় যুক্ত থাকে। কখনও শহরে বহুতল বাড়ি ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণে অংশ নেয়। অনেক সময় কাজ পাওয়া যায় না অথবা কাজ থেকে এত সামান্য আয় হয় যে তাকে ছদ্ম বেকারি বলা যায়। নগদ অর্থ যোগাড় করতে না পারলে কৃষি উপকরণ ধারে কিনতে হয় এবং ফসল ওঠার পর সেই ধার শোধ হয়। এটা কৃষি পণ্যের অবাধ বাজার তৈরির ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায়। ক্ষুদ্র চাষি যারা ধারে উপকরণ কেনে তারা বাজারের থেকে বেশি দামে কেনে এবং ফসল বেচার সময় বাজারের থেকে কম দাম পায়। যেহেতু ফসল ভালো না হলে এঁদের অস্তিত্বের সংকট তাই ধার করেও তারা প্রচুর কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে।

বর্তমানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা একটা বড় সমস্যা। কৃষি বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হওয়ায় প্রায়শই রোগ পোকার আক্রমণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভর্তুকির অভাব, কৃষি উপকরণের ঊর্ধ্বমুখী দাম, কৃষিপণ্যের দামের অনিশ্চয়তা প্রায়শই চাষির লোকসানের কারণ হয়। বড় চাষিরাও তাই কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগে বিশেষ আগ্রহী নয়। ভারতে বড় জোতের পরিমাণ কমছে। বড় জোত ভাঙছে। গ্রামীণ ধনিক শ্রেণী কৃষি থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্যের ব্যবসায়, কৃষি উপকরণের ব্যবসায়, বা কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে। এতে লাভ অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত। ফসলের ক্ষতি হলেও সার বা কীটনাশক বিক্রি কখনও কমে না। সবুজ বিপ্লবের সময় রাসায়নিক সার, বিষ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি অনেক মুনাফা করেছে।

ভূমি সংস্কারের দাবি কৃষকদের কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সংগঠিত করেছিল। শহুরে সর্বহারা শ্রেণীর সাথে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সবুজ বিপ্লব এই উত্তাল কৃষক আন্দোলন ঠেকাতে অনেকটাই সফল হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রকে রক্ষা করা যে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিপজ্জনক এই সত্য সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিকদের উপলব্ধিতে এসেছিল। ল্যাডজিনস্কি উপর থেকে ভূমিসংস্কার করার পক্ষে বহু কথা বলেছিলেন। সেইমতো ভারতে কিছু আইন সংশোধনও হয়েছিল। খণ্ডিত খর্বিত ভূমিসংস্কার ও সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি এই দুইয়ে মিলে উত্তাল কৃষক আন্দোলনের ঝাঁঝ অনেকটাই কমাতে সক্ষম হয়েছিল।

সবুজ বিপ্লব বিশ্ব পুঁজিবাদের কাছে এই ধারণা হাজির করলো যে কৃষিও পুঁজি বিনিয়োগের ভালো ক্ষেত্র হতে পারে। জমির উর্বরতা ইতিমধ্যেই রাসায়নিক সারের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। জমির যেসব উপকারী ক্ষুদ্র অণুজীব, ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের দাপটে অবলুপ্ত হতে বসেছে তাদের ওপর পেটেন্ট নেবার চেষ্টা চলছে যাতে সেগুলি আবার চাষিদের বিক্রি করা যায়। এমনকি কারখানায় খাদ্য উৎপাদনের প্রযুক্তিও পুঁজিবাদের করায়ত্ত, সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন কারখানায় উৎপাদিত সব্জির সাথে চাষিকে 'অবাধ' প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।

কৃষি যন্ত্রপাতিও মূলত পুঁজিবাদের দখলে। কৃষির অন্যতম প্রধান উৎপাদন উপকরণ হলো বীজ। ধান ও গমের ক্ষেত্রে এই বীজ নামক উপকরণটি ইতিমধ্যেই চাষির হাত থেকে প্রায় বেরিয়ে গেছে। অন্যান্য ফল ও সব্জির ক্ষেত্রেও এই উপকরণটি চাষির হাত থেকে কাড়বার বিশেষ দরকার। কিন্তু ভারতের মতো দেশ যেখানে নানান ধরনের উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া যায় সেখানে চাইলেও এই কাজ করা কঠিন। তাই নানান রকম আইন করে এই অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে। সাম্প্রতিক যে বীজ বিলগুলি প্রস্তাবিত হচ্ছে তাতে নথিভুক্ত না করে কোনো চাষি বীজ রাখতে পারবে না। আবার নথিভুক্ত করার পদ্ধতি এত জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ যে সাধারণ চাষির পক্ষে তার সুযোগ নেওয়া দুষ্কর। অন্যদিকে এই আইনে কোনো বিশেষ জাত নথিভুক্ত করতে হলে তার উৎস বলার দরকার পড়ে না। ফলে পয়সার জোরে কোনো কোম্পানি কোনো উৎকৃষ্ট দেশীয় বীজের ওপর পেটেন্ট নিয়ে নিতে পারবে।

জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন ফসল বানানো হচ্ছে যেগুলির চাষ শুরু হলে বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয় এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারে যে চাষি প্রতি বছর সেই বীজ কিনে চাষ করতে বাধ্য থাকবে। না হলে জমিতে অন্য কিছু চাষ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এইভাবে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমি, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যাবতীয় উৎপাদনের উপকরণের ওপর বহুজাতিক পুঁজির আধিপত্য কায়েম হচ্ছে।

বহুজাতিক পুঁজির দাপটে আমাদের কৃষি বাস্তুতন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কৃষিপণ্যের বাজারে তাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য কায়েম হতে পারে। অথবা, গ্রামীণ শ্রমজীবী শ্রেণী সংগঠিত হয়ে সমস্ত কৃষি উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা কায়েম করে এই অবক্ষয়ের অবসান ঘটাতে পারে। এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে কোন্‌টা হবে তা নির্ভর করছে দেশ জুড়ে শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ ও শ্রেণী সচেতন শক্তির পরিবেশ সচেতনতার উপর।

আক্রান্ত কৃষক

প্রণব দে

আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।... এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?... দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ— দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রর বঙ্গদর্শনের পর শতবর্ষেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নগুলো, এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমান সচল। উন্নয়নের 'ছড়াছড়ি', কিন্তু উপকৃত তো মুষ্টিমেয় কয়জন। দেশের কৃষিজীবী সহ বৃহদাংশ মানুষ শুধু উপেক্ষিত নয়, ক্ষতিগ্রস্থ। উন্নয়নের স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত হলেও ধাক্কাটা সইতে হয়।

এই নগরায়নের যুগেও ৭০ শতাংশের বেশি ভারতীয় গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং কর্মরত গ্রামীণ ব্যক্তির প্রায় ৬৭.৬ শতাংশের কর্মসংস্থান কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কৃষিই হলো দেশের সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থান কেন্দ্র। কিন্তু এই কর্মসংস্থানের জন্য সরকারকে কোন দায় নিতে হয়না। দায় বা ঝক্কি, সবটাই কৃষকের। তবে কৃষক তো আর সমসত্ত্ব কোন গোষ্ঠী নয়। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, বৃহৎ ইত্যাদি নানা বর্গে কৃষক সমাজ বিভক্ত হলেও, কৃষক বলতে আমাদের দৃষ্টি সাধারণত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দিকেই ঘুরে যায়। কারণ ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে বরাবরই ক্ষুদ্রের প্রাধান্য। বিগত চার দশকে প্রান্তিক জোতের সংখ্যা ২.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জোতের আয়তনও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়েছে। ২০১০-১১ সালের কৃষি সেন্সাসের তথ্যানুযায়ী ভারতবর্ষে ১৩.৭৮ কোটি কৃষিজোতের মধ্যে ৯.২৪ কোটি প্রান্তিক জোত (১ হেক্টর বা ২.৫ একর ও তার কম) এবং ২.৪৭ কোটি ক্ষুদ্র জোত (১ থেকে ২ হেক্টর)। ৬৭.০৪ শতাংশ প্রান্তিক কৃষকের দখলে আছে মোট কর্ষিত জোতের ২২.২৪ শতাংশ জমি আর ১৭.৯৩ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষকের দখলে আছে ২২.০৭ শতাংশ জমি। উপরের দিকে ১০.০৫ শতাংশ নিম্নমধ্য কৃষকের (২-৪ হেক্টর) দখলে আছে মোট কর্ষিত জোতের ২৩.৫৯ শতাংশ জমি, ৪.২৫ শতাংশ মধ্য কৃষকের (৪-১০ হেক্টর) দখলে আছে ২১.১৮ শতাংশ এবং বৃহৎ ০.৭৩ অংশের হাতে ১০.৯২ শতাংশ কর্ষিত জোত। মোটের উপর ৮৫ শতাংশ কৃষকের হাতে আছে মাত্র ৪৪ শতাংশ জমি এবং ১৫ শতাংশ ভোগ দখল করে ৫৬ শতাংশ কৃষিজমি। কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন এবং ক্ষুদ্র কৃষককে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর ভারতে ভূমি সংস্কার নিয়ে অনেক বাগাড়ম্বর শোনা গেলেও, আদতে ভূমি সংস্কারকে এক কানাগলির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতে ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গে পি সি জোশী মন্তব্য করেছিলেন, 'ভূমি সংস্কারের আদর্শ সমগ্র কৃষক শ্রেণীর স্বার্থে হলেও, তা গ্রামের গরিবদের বদলে ধনী কৃষকের স্বার্থেই কাজ করেছে।' ফলত ভারতের বৃহত্তম উৎপাদক গোষ্ঠীর অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র উৎপাদক গোষ্ঠীর শ্রমের উপর নির্ভর করেই ভারতবর্ষ বেঁচে আছে। খাদ্যশস্য আমদানিকারক দেশ থেকে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। অবশ্য ফলন বাড়লেও দেশের মানুষ যে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য পাবে, এমন নিশ্চয়তা ভারতের শাসক গোষ্ঠী কখনও দেননি। ১৯৫০ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন, জনসংখ্যা এবং মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্তির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫ কোটি টন, ৩৬ কোটি ও ১৪৪ কেজি। ২০১১ সালে হিসাবগুলি হলো যথাক্রমে ২৫ কোটি টন, ১২১ কোটি এবং ১৫৯.৫ কেজি। খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে ৫ গুণ (৪০০ শতাংশ), জনসংখ্যা বেড়েছে ৩.৪ গুণ (২৩৬ শতাংশ)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় কম হলেও দেশের মানুষের প্রাপ্তিযোগ বেড়েছে মাত্র ১.১১ গুণ বা ১০.৭৬ শতাংশ।[২] একটা দেশকে স্বাধীনতার ৬৪ বছর বাদে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইন করতে হচ্ছে। এটা ভাবলে ভারতবাসী হিসাবে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। কেম্ব্রিজ- হাভার্ডের পণ্ডিতেরা যে কীভাবে এই লজ্জা লুকিয়ে উন্নয়নের বার্তা দেন, তা দেশবাসীর কাছে সত্যই বিস্ময়ের।

জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে, বিশ্বের ধনী দেশগুলি সর্বাধিক খাদ্য অপচয় করে। ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বছরে মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২৮০-৩০০ কেজি।[৩] ভোক্তারাই এই অপচয়ের জন্য দায়ী। আমাদের

দেশে সাধারণ মানুষের যা খাদ্য জোটে, তার দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য বিত্তবানরা স্রেফ ডাস্টবিনে ফেলে। গরিব তথা উন্নতিশীল দেশেও খাদ্যশস্যের অপচয় হয়। তবে সেটা ভোক্তার দোষে নয় এবং পরিমাণেও অনেক কম। ফসল মজুত ও পরিবহনের অব্যবস্থার কারণেই কাটা ফসল বিনষ্ট হয় বেশি। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে পরিকাঠামোর অভাবে খাদ্যশস্য নষ্ট হয় বছরে মাথাপিছু প্রায় ১২০ কেজি। মজুতের অভাবে ভারতে নষ্ট ফসলের মূল্য বাৎসরিক ৬০ হাজার কোটি টাকা। উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বাজার দামের থেকে সস্তা দরে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়।[৪] তবু দেশের মানুষের খাদ্য জোটেনা। দেশের মানুষকে সস্তায় খাদ্যশস্য দিলে বোধ হয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার পর্যবেক্ষণে ভারতের ৮.৯৩ কোটি কৃষক পরিবারের মধ্যে ৪.৩৪ কোটি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক পরিবার ঋণগ্রস্থ। প্রান্তিক কৃষকদের ৬৬ শতাংশ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বেঁচে আছে। সাধারণভাবে মোট ঋণের ৩৬ শতাংশ সরবরাহ করেছে ব্যাঙ্কগুলি এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম উত্তমর্ণ সুদের কারবারি মহাজনেরা। মহাজনী ঋণের পরিমাণ ২৬ শতাংশ। এটা মোটা দাগের হিসেব। প্রকৃত চিত্রটা হলো ব্যাঙ্ক- সমবায়ের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে পৌঁছয় না। মহাজন ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। অপরদিকে যত বড় জোতদার, ব্যাঙ্ক-সমবায় তত বেশি উদার। প্রায় ভূমিহীন পর্যায়ের ঋণগ্রস্থ কৃষকদের ৫১ শতাংশ মহাজনদের উপর নির্ভরশীল। মাত্র ২০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুয়োগ পেয়েছে। প্রান্তিকতার উচ্চসীমায় যাদের অবস্থান, তাদেরও এক-তৃতীয়াংশ ঋণের জন্য মহাজনদের মুখাপেক্ষী। কিন্তু বৃহৎ জোতের মলিকদের ৬০ শতাংশের বেশি ব্যাঙ্ক-সমবায় ঋণের অংশীদার। নিচের সারণী থেকে চিত্রটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

অভাবের তাড়নায় কৃষক আত্মহত্যার খবর এখন আমাদের কাছে জলভাত। সরকারি তথ্যানুযায়ী অর্থাৎ পুলিশ রিপোর্ট সূত্রে এই শতাব্দীর গোড়া অর্থাৎ ২০০০ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত ২.৩৪ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে।[৫] সারা দেশে কৃষক আত্মহত্যার যত খবর পরিবেশিত হয়েছে, প্রায় সবকয়টির সঙ্গে দেনা পরিশোধের অক্ষমতার প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। সরকার ছাড়া কেউই অস্বীকার করতে পারছে না যে চাষের খরচ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের দেনার পরিমাণ বেড়েছে। উৎপন্ন ফসলের যথাযথ দাম না পেলে অথবা কোন কারণে ফলন ক্ষতিগ্রস্থ হলে, সরকারি সহায়তার অভাবে, কৃষক ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে পড়ছে। অধিকাংশ কৃষক, বিশেষত ক্ষুদ্র কৃষক, মহাজনের কবলগ্রস্থ হওয়ায়, সরকারের ঋণ মকুব প্রকল্পের (২০০৮ সালে যেমন ঘোষণা করা হয়েছিল) সুযোগ লাভে বঞ্চিত। একপ্রকার অসহায় অবস্থা কৃষককে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে।

বাজার অর্থনীতির যুগে কৃষির ধরণটাই পাল্টে গেছে। কৃষকের হাতে আর কৃষির স্বাধীনতা থাকছে না। বাজার অর্থনীতির যুগে কৃষির উৎপাদন উপকরণ— সার, সেচ, বীজ ইত্যাদির দামই শুধু অনিয়ন্ত্রিত গতিতে বাড়ছে তা নয়, ফসল বা বীজের নিয়ন্ত্রণও চলে গেছে কর্পোরেট সংস্থার হাতে। কৃষক ধান চাষ করবে না কি বিটি তুলো চাষ করবে, এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আর কৃষকের হতে থাকছে না। বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির প্রভাবে সরকার যে কৃষি-নীতি গ্রহণ করেছে (২০০০), তাতে কৃষি ক্ষুদ্র কৃষকের নাগালের বাইরে চলে গেছে। যে দেশীয় প্রযুক্তি কৃষকের আয়ত্তের মধ্যে ছিল, তা উপেক্ষিত। বরণ করা হয়েছে কর্পোরেট সংস্থা নির্দেশিত জিন প্রযুক্তি। এমনকি দেশীয় গবাদি পশুও বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। সেখানেও জিন নিয়ন্ত্রিত পশুর আমদানি হচ্ছে। এই সব প্রযুক্তি হয়তো মুষ্টিমেয় কিছু ধনী কৃষকের বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, কিন্তু গরিষ্ঠাংশ কৃষিজীবীর ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। সার ইত্যাদিতে ভর্তুকি যেটুকু দেওয়া হচ্ছে, তার সুযোগও নিচ্ছে মূলত ব্যবসায়ী, ধনী কৃষক। মূল উৎপাদক গোষ্ঠী ক্ষুদ্র কৃষক এই

জোতের আয়তন	ঋণের উৎস (শতকরা)				
	সরকার	সমবায়	ব্যাঙ্ক	পেশাদার মহাজন/ব্যবসায়ী	অন্যান্য
০.০১ হেক্টরের কম	১.৯	৫.৩	১৫.৪	৫১.৩	২৬.১
০.০১- ০.৪০ হেঃ	৪.০	১৪.৫	২৪.৮	৩৬.৭	২০.০
০.৪০-১ হেঃ	৩.৮	১৭.০	৩২.০	৩৫.৪	১২.৮
১-২ হেঃ	১.৭	২০.৫	৩৫.৪	৩০.১	১২.২
২-৪ হেঃ	১.৫	২২.৬	৪১.০	২৮.১	৬.৯
৪-১০ হেঃ	১.৩	২৩.০	৪৪.৫	২২.৮	৮.৩
১০ হেক্টরের বেশি	১.৭	২৩.২	৪২.৭	২৭.৮	৪.৬

সূত্র Indebtedness of Farmer Households- NSS 59th Round- Report No. 498- Jan-Dec 2003

সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আইআইএম, আমেদাবাদের গবেষণা পত্রে (২০০৯) বিবৃত হয়েছে, ১৯৮১-৮২ থেকে ২০০০-০১ সাল পর্যন্ত সারের ভর্তুকিতে কৃষকের অংশ ছিল গড়ে দুই-তৃতীয়াংশ এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করেছে সার কারখানা মালিকরা।[৬]

সরকারি ভূমি সংস্কার নীতিতে সমবায় গঠনের কর্মসূচি উল্লেখিত থাকলেও, কার্যত সরকার কৃষি-সমবায় গঠনে কৃষককে নিরুৎসাহ করেছে। এখন নয়া-উদারনৈতিক কৃষিনীতিতে 'চুক্তি চাষে' উৎসাহ দেওয়া শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত কৃষিজমি যাতে কর্পোরেট সংস্থাগুলি লিজ নিতে পারে, তার জন্য রাজ্যগুলি আইন সংশোধন করতে শুরু করেছে। কৃষক শুধু উৎপাদনের অধিকারী। বাঁধা দামে সে চুক্তি-মালিককে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য। বাজারে দাম বৃদ্ধি হলেও, বাড়তি দাম কৃষক পাবেনা।

নয়া-উদারনীতিক অর্থনীতিতে সরকারি অধিক্ষেত্রগুলিকে, বেসরকারি হস্তে সমর্পণের জন্য যেমন পরিকল্পিত ভাবে লোকসানি সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে, তেমনই কৃষিতেও কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশের রাস্তা পরিষ্কার করতে এবং কৃষিজমিকে কর্পোরেট পুঁজির খাদ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে সাধারণ কৃষক কৃষি ছাড়তে অথবা বৃহৎ পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' গঠনের জন্য দেবেন্দর শর্মার হিসাবে, ১.১৪ লক্ষ কৃষক পরিবার এবং ৮২ হাজার কৃষিশ্রমিক পরিবার, অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবার উচ্ছেদ হবে। 'সেজ' কম করেও ১০ লক্ষ মানুষের জীবিকা বিপন্ন করবে।[৭]

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে ভট্টা-পারসোল পর্যন্ত সর্বত্র জবরদস্তি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রায় বিদ্রোহের আকার নিয়েছে। এই বিক্ষোভের মুখে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জমি অধিগ্রহণের শতাব্দী প্রাচীন আইন পাল্টাবার চেষ্টা করছে ঠিকই, তবে সেটা কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থে। সরকারের একমাত্র লক্ষ্য, যেন তেন প্রকারেণ বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে নিখরচায় জমির যোগান দেওয়া। তার জন্য নিছক মুনাফা অর্জনকারী বেসরকারি প্রকল্পগুলিকেও 'জনস্বার্থ' আখ্যা দিতে সরকারের বাধছে না। স্বাধীনতার পর বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ৬ কোটি মানুষ অধিগ্রহণের ফলে উচ্ছেদ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত কমিটির (২০০৮) হিসাবমতো দু'দশকে ১০ লক্ষ একর জমি খনন এবং অন্যান্য শিল্পের কারণে কৃষি-চরিত্র হারিয়েছে।[৮] অর্থাৎ, কয়েক লক্ষ কৃষিজীবী জীবিকাচ্যুত হয়েছে।

কৃষির এই দুর্দিনেও ৬০ শতাংশ কৃষি পরিবার কৃষি ছাড়তে নারাজ। ২৬ শতাংশ জানিয়েছেন, লাভের মুখ দেখছেন না বলেই, তাঁদের জীবিকা হিসাবে কৃষি না-পসন্দ।[৯] কৃষিকে লাভজনক জীবিকায় পরিণত করার প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সেটা যাতে ভুলে না যান, তার জন্য বঙ্কিমবাবুর সেই সাবধান বাণী মনে করিয়ে দিচ্ছি, 'সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?'

তথ্যসূত্র

১। বঙ্গদেশের কৃষক-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২। indiastat.com ও যোজনা পর্যদ
৩। UNEP, 2012. Avoiding Future Famines: Strengthening the Ecological Foundation of Food Security through Sustainable Food Systems.
৪। Tehelka Magazine, Vol 7, Issue 31, Dated August 07, 2010
৫। National Crime Records Bureau
৬। Fertilizer Subsidy in India: Who are the Beneficiaries?-IIM, Ahmedabad
৭। The New Maharajas of India-Devinder Sharma and Bhaskar Goswami
৮। Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms, 2008
৯। Situation Assessment Survey of Farmers-NSSO-59th Round, January–December 2003

আক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষ

৩২ পৃষ্ঠার পর

অন্য যে বামপন্থীরা জনগণের মধ্যে কাজ করেন, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে গণ-আন্দোলন প্রসারের মাধ্যমে 'স্বরূপ উন্মোচনের' কথা বলেন তাঁরা কি গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে কোন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি নিতে পারেন না, এ বিষয়গুলিকে সামনে রেখে? যদি তাঁরা এ কাজ করতে ব্যর্থ হন তবে এই স্পেস নেবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের অর্থে পুষ্ট একধরনের এনজিও—এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। পুঁজিবাদীরা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিলো চক্রবৎ ঘুরে চলা সংকট মোকাবিলার জন্য। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই প্রক্রিয়ায় আবার নতুন ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জারিত হয়ে শ্রমজীবী মানুষ অনেক নতুন ধারার আন্দোলন জন্ম দিয়েছে। কোথাও তার প্রকাশ আরব বসন্তের মাধ্যমে আবার কোথাও তার প্রকাশ ওয়াল স্ট্রীট দখল করার আওয়াজে। আমাদের দেশেও কখনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে, আবার কখনও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, বা কুদানকুলাম, পস্কোবিরোধী আন্দোলনে। সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলনও বোধহয় তার অংশ। আশা রাখব সংসদীয় ধারার বাইরের বামপন্থীরা তাঁদের আশু অ্যাজেন্ডাকে আরও প্রসারিত ও সময়োপযোগী করবেন এবং এ আন্দোলনগুলিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

আক্রান্ত আদিবাসী-মূলবাসী

বিশ্বজিৎ রায়

উপমহাদেশের ইতিহাস সাক্ষী, আদিবাসীরাই সর্বাধিক শোষিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠীসমূহ। স্বাধীনতার পর তাঁদের বঞ্চনা আর অবহেলার বারোমাস্যা বিশেষ বদলায়নি। কিন্তু তথাকথিত উদার অর্থনীতির যুগে তাঁদের জল-জঙ্গল-জমিন তথা জীবন-জীবিকার উপর নগ্নতর আক্রমণ নজিরবিহীন। এই আক্রমণের হোতা এদেশের নব্য উদারবাদী সরকার এবং দেশি-বিদেশি কর্পোরেট লুঠেরাদের যুগলবন্দি।

নেহরু-ইন্দিরা জমানায় সরকারি উন্নয়নের রথের চাকায় পিষে গেছে এদেশের মূলবাসী-আদিবাসীদের হাজারো গাঁ-বসত, উৎখাত হয়েছেন তাঁরা বাঁধ, সড়ক বিদ্যুৎকেন্দ্র-কারখানা নির্মাণের প্রয়োজনে। ছিন্নমূল, অভিবাসী শ্রমিকদের অযুত-বাহিনীতে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছেন ভারতের অন্ত্যেবাসী ভূমিপুত্র-কন্যার দল। সে ছিল দেশগঠন-জাতিনির্মাণের কল্পকাহিনীর যুগ। বৃহত্তর জনস্বার্থে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-স্বার্থ বিসর্জন এবং উন্নত শিল্প ও নগর সভ্যতার আলোয় আলোকিত হওয়ার মন্ত্র জপে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নী হিংসার প্রতি চোখ বুজে থাকার কাল। বিনিময়ে জনকল্যাণী, দারিদ্র্য-সহনী নানা সরকারি প্রকল্পের কামধেনুর দুধের তলানি বাবুতন্ত্র আর মন্ত্রী-নেতা বাহিনীর হাত গলে চুঁইয়ে পড়ার ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় বদান্যতার বিনিময়ে ম্লান-মূক প্রান্তজনদের ভোট-বাক্সে কৃতজ্ঞতা নিশ্চিত করার নির্বাচনী কূটকৌশল। ইন্দিরাকে দেখা যেত আদিবাসীদের অঞ্চলে, অনুষ্ঠানে। কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কের অঙ্কে আদিবাসীদেরও ধরা হত।

কিন্তু মনমোহন-চিদাম্বরমের জমানায় সেই জনমোহিনী মুখোশটুকুও গায়েব। বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী, অঞ্চল-ধর্ম-ভাষার সংঘাত-ক্ষুব্ধ সমাজে নিরপেক্ষ মধ্যস্থ এবং সমন্বয়কারী রূপে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার ধ্বজাধারীদের দিন শেষ। এখন 'সংস্কার'-এর যুগে সরকার খুল্লম-খুল্লা কর্পোরেট লুণ্ঠনের অংশীদার। প্রধান শিকার আদিবাসীরা। খনিজ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের নামে দেশি-বিদেশি পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্র আদিবাসীদের জল-জমিন-জঙ্গল। ধারাবাহিক লুণ্ঠনের প্রয়োজনে মধ্যভারতের অক্ষরেখা ধরে পূর্ব থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত পাহাড়-জঙ্গলের মূলবাসী-আদিবাসীদের নির্বিচার উচ্ছেদ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কণ্ঠরোধে সরকারি-বেসরকারি হনন-যজ্ঞ চলেছে। পুরোন সরকারি উন্নয়নী হিংসার থেকে এই সময়ের রাষ্ট্র-কর্পোরেট যৌথ আক্রমণের ব্যাপকতা ও বর্বরতা তুলনায় অনেক বেশি। এতটাই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশীদার এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুরক্ত বহু মানুষকেও তা নাড়িয়েছে।

উন্নয়নের স্বরূপ: সুপ্রিম কোর্টের চোখে

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি এবং সুরিন্দর সিংহ নিজ্জরের কথা। দুই বিচারপতির বেঞ্চ ২০১১ সালের জুলাইতে নন্দিনী সুন্দর ও অন্যান্যদের রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে ছত্তিশগড়ে বিজেপি-কংগ্রেস তথা কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ প্রযোজনায় 'সালওয়া জুডুম' হত্যা-অভিযান সম্বন্ধে যে রায় দেন তা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার অন্যতম মাইলস্টোন। রাষ্ট্রীয়-কর্পোরেট লুণ্ঠন-যজ্ঞের নিন্দায় দুই বিচারপতি উনিশ শতকীয় আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের অন্যতম ধ্রুপদী ইতিবৃত্তকার জোসেফ কনরাডের 'হার্ট অব ডার্কনেস' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অন্ধকারের হৃদয় চিরে সেদিনের লুণ্ঠকদের মনোবৃত্তির বিশ্লেষণে থেমে না থেকে তাদের এদিনের উত্তরসূরীদের হিংস্রতা এবং আত্মমুগ্ধতার আয়না হিসেবে তুলে ধরেছেন অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ি, অজয় মেহরা, জর্জ হাইনে, রমেশ কুমার এবং জোসেফ স্টিগলিৎজকে। যোজনা কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টও ঠাঁই পেয়েছে তাঁদের রায়ে।

কনরাডের 'নায়ক' কুর্ট্জ লুণ্ঠনে যোগ দিয়েও জীবনের অন্তে বলে ওঠে— 'দ্য হরর, দ্য হরর!' কিন্তু আজকের কুর্টজবৃন্দ— বেদান্ত-এসার-টাটা গোষ্ঠীর প্রধানরা বা তাঁদের সরকারি মুরুব্বি ও মুখপাত্র মনমোহন-চিদাম্বরমরা তাঁদের কৃতকর্মের বীভৎস পরিণাম সম্পর্কে সামান্য অনুতপ্ত নন। বদলে পাহাড়-জঙ্গল-জমিন উজাড় এবং আদিবাসীদের গ্রাম-বসত নিশ্চিহ্ন করে উন্নয়নের নামে পুঁজির আগ্রাসী দিগ্বিজয়ে অশ্বমেধের ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছেন আজকের আর্যপুত্রেরা। আর্যাবর্তের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণ থেকে পূর্বে আরণ্যকদের ভূমিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে উত্তর-আধুনিক 'কলোনাইজার' বাহিনী। মহাভারতের নানা প্রান্তে তাদের আইনি ও বেআইনি নির্মমতার বর্ণনা মারিয়ো ভার্গাস লোসার 'দ্য ড্রিম অব দ্য কেল্ট' উপন্যাসে বিধৃত কঙ্গো থেকে প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত উনিশ শতকীয় পুঁজির আদিম পুঞ্জীভবনের নির্লজ্জ পর্বটি মনে পড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করার নিবৃত্তিহীন তৃষ্ণা, দুই বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা এবং তদজনিত অমানবিকতাকে স্মরণে রেখে দুই বিচারপতি আজকের ছত্রিশগড়ে সরকারি-কর্পোরেট যৌথ উৎসাদন-হনন অভিযান সম্পর্কে বলেছেন : "... এতসব কিছুর পর আমাদেরও আতঙ্কের সঙ্গে বলতে হবে— 'দ্য হরর, দ্য হরর'।"

তাঁদের আরও মন্তব্য : "সাংবিধানিক দর্শন কোনও

ক্ষমতাধরকেই দেশের নাগরিকদের উপর তো বটেই, অন্য ক্ষেত্রেও বে-লাগাম রাষ্ট্রীয় হিংসা নামিয়ে আনার অধিকার দেয়নি। আইনের বাঁধন এবং প্রতিটি ব্যক্তির সম্ভাভূত মানবীয় মর্যাদাবোধকে ক্ষুণ্ণকারী বল্গাহীন ক্ষমতার আস্ফালন সাংবিধানিক মূল্যবোধ তো বটেই, জাতীয় স্বার্থের পক্ষেও ঘোর হানিকর। বিশেষ করে মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠী-ভ্রাতৃত্ব এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যের এটা পরিপন্থী''। মেহরাকে উদ্ধৃত করে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ মনে করিয়েছেন কীভাবে কর্পোরেট জমি-ক্ষুধার জেরে কৃষক ও আদিবাসীরা জমি ও গাঁ থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন। কীভাবে বে-লাগাম খনিজ উত্তোলন বনবাসী-মূলবাসীদের জমি ও জঙ্গল কেড়ে নিচ্ছে। পরিকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনে চাই আরও ইস্পাত, সিমেন্ট এবং তেল বিদ্যুৎ ও গ্যাস। সুতরাং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অথচ গরিব পূর্ব-ভারতীয় রাজ্যগুলি বহুজাতিক ও দেশি কর্পোরেটদের হাতে জমি-জঙ্গল লুণ্ঠনের অধিকার তুলে দিচ্ছে। খনিজ-সম্পদে গর্ভবতী এই মাটির প্রাচীন সন্তান আদিবাসীরা। অতএব তাঁদের উৎখাত করেই এগোচ্ছে বৃহৎ পুঁজির জয়রথ। ''সমস্যার উৎস নিহিত রাষ্ট্র-অনুসৃত ও অনুমোদিত অনৈতিক (amoral) রাজনৈতিক অর্থনীতিতে (political economy)। তার ফলশ্রুতিতে তা আবশ্যিকভাবে বিপ্লবী রাজনীতির জন্ম দিচ্ছে।... আধুনিক নব্য উদারবাদী অর্থনীতি ও তার মতাদর্শের গর্ভে বল্গাহীন স্বার্থপরতা আর লোভের সংস্কৃতির জন্ম। উত্তরোত্তর বেড়ে চলা ভোগবাদী পণ্যরতির ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সমাজের সবাইকে টেনে তুলবে, এহেন মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি থেকে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভঙ্গুর (unsustainable) পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ছত্রিশগড়ে তা বিশেষভাবে প্রকট।

সুপ্রিম কোর্টের আরও মন্তব্য:

> ....নব্য-উদারবাদী উন্নয়নের প্রবক্তারা তাদের স্বপক্ষে যে যুক্তি সাজান তা ইতিহাসে নতুন নয়। আজ তা আরও লোভী ও পরস্বাপহারী চরিত্র পেয়েছে। ওরা বলেন, দেশ ছেড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত এবং ব্যাপক শোষণ (exploitation) ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তা না হলে দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে না। সমৃদ্ধি অর্জন বিনা দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, ক্ষুধা আর আবর্জনাময় জীবনযাপনের (squalor) মোকাবিলা হবে না। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক সম্পদ-শোষণের ব্যবস্থাটি প্রকৃতি-পরিবেশ এবং বর্তমান সমাজকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, এই বিতর্ক ধামাচাপা দেওয়া হয়। ভারতের নীতিনির্ধারক এবং ভারতের এলিটরা এ প্রশ্নে কোনও বিশ্বাসযোগ্য (credible) উত্তর দেন না। বদলে তাঁরা হৃতসর্বস্ব এবং উচ্ছিন্ন মানুষগুলির মনুষ্যেতর জীবনযাপনের যন্ত্রণার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকেন। আরও ভয়ংকর ব্যাপার হলো, তারা ইতিহাসের এই সাক্ষ্যকে অস্বীকার করেন যে মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের উপর নির্ভরশীল উন্নয়নী নকশা বেশিরভাগ সময়ই রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার পথ সুগম করেছে। এবং সেই পথে অগণ্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিদারুণ দুর্দশা এবং অসহায়তার নরকে নিক্ষেপ করেছে। ...(এহেন) পরমাংসজীবী (predatory) শ্বাপদ-সম পুঁজিবাদকে রাষ্ট্র সমর্থন ও উৎসাহ দিচ্ছে সংবিধানের মূল্যবোধ ও নিয়মনীতির সরাসরি বিপক্ষে গিয়েই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশে এহেন অর্থনীতি খনিজ ও অন্যান্য নিষ্কাশন মূলক শিল্পকে ঘিরেই শেকড় গেঁড়েছে। ভারতের ইতিহাসে এবং সমসাময়িক পর্বেও দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতেই সামাজিক সংঘাতের ঘটনা বারংবার ঘটে। আর উন্নয়নের ধাঁধা এটাই যে, এইসব অঞ্চলগুলিতেই মানব-উন্নয়নের মান সবচেয়ে নিচে। এহেন উন্নয়নী নকশা এবং ফলশ্রুতিগুলি অনিবার্য বলে যেসব যুক্তি সাজানো হয় তা ধোপে টেকে না। ...বেসরকারি কোম্পানিদের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত শোষণের সরকারি নীতিতে এহেন প্রক্রিয়ার লাভ ও খরচের দায়ভার সমানভাবে বাঁটোয়ারার কোনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা নেই। নেই পরিবেশগত ভারসাম্যের (sustainability) রক্ষাকবচ। স্বাভাবিকভাবেই তা রাজধর্মের (fundamentals to governance) মৌলিক নীতিমালাকে ভঙ্গ করছে আর সেটা যখন ব্যাপকভাবে ঘটছে তখন তা আইনের চোখে সমস্ত নাগরিকের সমতা, তাঁদের আইনি সমানাধিকার এবং জীবনের অধিকার— যা কিনা যথাক্রমে সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার প্রতিশ্রুতি এবং ২১ নম্বর ধারায় বিধৃত— এ সবকিছুকেই ভঙ্গ করছে। শুধু তাই নয়, খনিজ শিল্প, যা কিনা কিছু অঞ্চলে 'মাইনিং মাফিয়া' বলে পরিচিতি, তার সঙ্গে সরকারি কিছু প্রতিনিধিদের যোগসাজশ রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তৃত্বের ধারণাকে ছিন্নভিন্ন, অন্তঃসারশূন্য (evisceration) করে ফেলে।...

সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির রায়ের দীর্ঘ উদ্ধৃতির কারণ দুটি। মনমোহন-চিদাম্বরম, টাটা-এসার-বেদান্তদের মুখপত্র কর্পোরেট মিডিয়ার প্রভাবে শহুরে মধ্যবিত্তদের একটি বড় অংশ আজ উন্নয়নী মোহমায়ার আচ্ছন্ন। পুরনো মধ্যবিত্তদের মধ্যে আদিবাসী প্রান্তবাসীদের প্রতি যে রোমান্টিক আকর্ষণ ও সহমর্মিতা ছিল, আজকের ভোগসর্বস্ব স্বার্থপরতার সংস্কৃতিতে তার অনেকটাই উবে গেছে। উন্নয়নের রাজকীয় যজ্ঞে অনিচ্ছাকৃত বলি (colateral damage) হিসেবে আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তজনদের উৎসাদনকে দেখে থাকে নতুন মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশ। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের

এই কঠোর সমালোচনা উন্নয়নের মোড়কে বনবাসী-আদিবাসীদের লুণ্ঠন-উন্মূলন-হত্যার বিভীষিকাকে উন্মোচিত করেছে। এই মর্মস্পর্শী সমালোচনা কোনও মাওবাদী পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত নয়। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী রাজনীতির যেসব প্রবক্তা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্রের কঠোর সমালোচনা করেন, তাকে রাষ্ট্রের দমনমূলক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত বলে মনে করেন, আশা করা যায় তাঁরা রাষ্ট্র-চরিত্র ও তার অঙ্গীভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণের পুরনো সাদা-কালো ছক ভেঙ্গে ভাববেন। ভেবে দেখবেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীদার ব্যক্তিদের নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে ব্যক্তিবোধের সংঘাতের কথা। রাষ্ট্রে-কর্পোরেট যৌথ মৃগয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় এই দুই বিচারপতিই লিখছেন :

> ...রাষ্ট্রের বিপুল শক্তি বা অপরাপর সহ-নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানুষ কোনও কারণ ব্যতিরেকে অস্ত্র ধরে না, সঙঘবদ্ধ হয় না। অস্তিত্ব রক্ষার প্রবৃত্তি এবং টমাস হবস্ যাকে বলেছেন অরাজকতার ভয়— যা কিনা আমাদের সামূহিক চৈতন্যে খোদাই রয়েছে— এ থেকেই আমরা একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চাই। কিন্তু সেই ব্যবস্থা যদি মানবিক মূল্যবোধের বিনিময়ে বা দুর্বল-গরীব-বঞ্চিতদের উপর অন্যায়-অত্যাচারের মাধ্যমে আসে তবে মানুষ বিদ্রোহ করে...।

উন্নয়নী হিংসার বলি

কত লক্ষ আদিবাসী-বনবাসী মানুষ আজ জমিহারা-গৃহহীন? যোজনা কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করে উপরোক্ত রায়ে বলা হয়েছে :

> ১৯৫১ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ৪৫ লক্ষ আদিবাসী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে উৎখাত হন। উন্নয়ন-উদ্বাস্তুদের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ এরাই। এদের মাত্র ২৫ শতাংশ পুনর্বাসন পেয়েছেন। যদিও কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই তবু সাধারণভাবে বলা যায় দলিত ও আদিবাসীরাই মাওবাদীদের পদাতিক বাহিনীর প্রধান-অংশীদার।

২০০৮ সালে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এই বিশেষজ্ঞ কমিটির 'উগ্রপন্থী-এলাকায় উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ' (Challanges in Extremist Affected Areas) শিরোনামে রির্পোটের হিসেব : বিগত ষাট বছরে শুধুমাত্র বাঁধ নির্মাণের জেরে বিস্থাপিত মানুষের ৪০ শতাংশই আদিবাসী-বনবাসী। বৃহৎ পরিকাঠামো-প্রকল্প-শিল্পপ্রকল্প ও খনিজ উত্তোলনের জেরে উন্মূলিত জনতার সিংহভাগ এই জনগোষ্ঠীর। এই মানুষগুলি জমিহারা-গৃহহারা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের গ্রাসে বন্দী। তারই পরিণতিতে জবরদস্তি অভিবাসনের পথে পা বাড়িয়েছেন ছত্তিশগড়ের মুরিয়া বা কোয়া জনজাতির মানুষ অন্ধ্রের খাম্মামে বা ওড়িশা থেকে বিশাখাপত্তনমে। ছত্তিশগড়ে রাষ্ট্র-নিয়োজিত বা মদতপ্রাপ্ত 'সালওয়া জুড়ুম'-এর ভাড়াটে সৈনিক 'বিশেষ পুলিশ অফিসার' বাহিনী বা বিহারে উচ্চবর্ণের খুনের দল রণবীর সেনার আক্রমণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের অনেকেই। এর সঙ্গে রয়েছে সামন্তবাদী হিংসা এবং পরোক্ষ শোষণ-অত্যাচার। নয়ের দশক থেকে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি এই সামগ্রিক আক্রমণকে সংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

গৌহাটি স্থিত নর্থ-ইস্টার্ন সোশ্যাল রিসার্চ সেন্টারের অধিকর্তা ওয়াল্টর ফার্নান্দেজের হিসাব মোতাবেক, স্বাধীনতোত্তর ভারতে ১৯৪৭ থেকে ২০০১ সালে কমবেশি ৬ কোটি মানুষ যদি ছিন্নমূল হয়ে থাকেন তথাকথিত বিকাশের প্রয়োজনে, তাহলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, খনিজ আহরণ ইত্যাদির কারণে ২০০১-২০১০, এই এক দশকেই, ১.৫ কোটি মানুষকে জমি ও গৃহচ্যুত করেছে নব্য উদারবাদী সরকার ও কর্পোরেট লুঠেরারা। ইতিহাসের নিরিখে দেখলে এই উচ্ছেদ অভিযানে ব্যাপকতা নজিরবিহীন। 'ফেলে যাওয়া মানুষের দল: বিকাশ ও বিস্থাপন (Abondoned : Development and Displacement)' শীর্ষক 'পারসপেকটিভ্স' প্রকাশনায় মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতে উন্নয়নের বলি জনসংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যার থেকে ১ কোটিরও বেশি। ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার তা তিনগুণ এবং ২০০৬ সালে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মিলিত জনসংখ্যার সমান। বিস্থাপনের প্রধান ক্ষেত্রগুলির বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব ও পরবর্তী সময়ে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য এন সি সাক্সেনার তথ্য অনুযায়ী বৃহৎ বাঁধগুলির কারণে ৪ কোটি মানুষ ছিন্নমূল। এমনকি বৃহৎ বাঁধের প্রবক্তা ও লগ্নির জোগানদার বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব ধরলে এই সংখ্যা ৩.৯ কোটি।

বাঁধ ও জলাধারের তলায় চাপা পড়ে যাওয়া আদিবাসীদের কথা বলতে গিয়ে গবেষক সত্যজিৎ সিংহকে উল্লেখ করেছেন পারপেসপেকটিভ টিম। সরকারি সূত্র বিশ্লেষণ করে সিংহ প্রকল্প-ভিত্তিক হিসাব দেখিয়েছেন। সিংহের হিসাব: সর্দার সরোবর ও কারজান (গুজরাট), চাণ্ডিল ও কোয়েল-কারো (ঝাড়খণ্ড), পোল্লাভরম (অন্ধ্র), তুলতুলি (মহারাষ্ট্র), আপার ইন্দ্রাবতী (ওড়িশা), পঙ ও ভাকরা (হিমাচল প্রদেশ) সহ ১৮টি বৃহৎ বাঁধ প্রকল্পে ছিন্নমূলদের ১৮ থেকে ১০০ শতাংশ আদিবাসী। জমির মালিকানা এবং অন্যান্য স্বত্ব-সংক্রান্ত নথিপত্র না থাকায় এদের সিংহভাগ ক্ষতিপূরণ পান না। পেলেও তা বছরের পর বছর ঘুরে নামমাত্র। একাধিকবার উৎখাতের সংখ্যাও নগণ্য নয়। পুনর্বাসিতদের ক্ষেত্রে তথ্য : ওড়িশা (৩৫.২৭ শতাংশ), অন্ধ্র (২৮.৮২ শতাংশ), কেরালা (১৩.১৮

শতাংশ), পশ্চিমবঙ্গ (৯ শতাংশ)। এসবই পুরনো হিসেব। সাম্প্রতিক সময়ে সিকিম থেকে অরুণাচল, তামিলনাড়ু থেকে হিমাচল, একের পর এক ছোট বড় নদী-বাঁধ এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। তার জেরে বিধ্বস্ত আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির সংখ্যাচিত্র জুড়লে উন্নয়নী হিংসার যে ভয়াবহ ছবি উঠে আসে তা পরিকল্পিত 'এথনিক ক্লিনজিং' তথা জনজাতি উৎসাদন-নিধনের ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও প্যালেস্টাইনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মহারাষ্ট্র থেকে ওড়িশা, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে নন্দীগ্রামে গণ উত্থানের জেরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে কর্পোরেট হাঙরদের জমি-ক্ষুধার আগ্রাসন কিছুটা থমকে গেলেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উপর তাদের চাপ অব্যাহত। ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইনের পরিবর্তন এবং নতুন জমিহারাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন আইন নিয়ে চাপান-উতোর চলছেই। কত শতাংশ জমি মালিক এবং জমি-নির্ভর গ্রামীণ জনতার সম্মতি পেলে সরকারি উদ্যোগে জমি অধিগ্রহণকে মানবিক বলা যাবে, তাই নিয়ে দড়ি টানাটানিতে ব্যস্ত কেন্দ্রের 'আম আদমি' সরকার ও কংগ্রেস দলের কুশীলবেরা। 'জনস্বার্থ'-র দোহাই পেড়ে অধিগ্রহণের সীমানা বাড়াতে নানাবিধ ফর্মুলা পেশ হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারি জমিতে ভোগস্বত্ব-চাষের অধিকার পাওয়া আদিবাসী-মূলবাসী ও অন্যান্যদের সম্মতি আবশ্যিক কিনা তা নিয়েও শাসক দল ও বিরোধী সংসদীয় দলগুলির নানা মুনির নানা মত। তার মধ্যেই ছোটনাগপুরের টেনান্সি অ্যাক্ট, 'প্রভিশনস অফ দ্য পঞ্চায়েতস' (এক্সটেনশন টু দ্য সিডিউল্ড এরিয়াস) অ্যাক্ট বা পেসা ১৯৯৬, এবং সিডিউলড ট্রাইব্স অ্যান্ড আদার ট্রাডিশনাল ফরেস্ট ডোয়েলার্স (রেকগনিশন অব ফরেস্ট রাইট্স) অ্যাক্ট ২০০৬ ইত্যাদি পুরনো ও নতুন আইনকে কলা দেখিয়ে আদিবাসীদের জমি দখল চলছে সরকারি মদতেই। 'মাইনিং'-এর প্রয়োজনে বেসরকারি পুঁজির জমি-আগ্রাসনকে সহনীয় করতে লভ্যাংশের টুকরো আদিবাসীদের পাতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে কোথাও চাকরি, কোথাও পেনশন। অধিগৃহীত জমির এক ছোট অংশ ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহারের ফাউও মিলতে পারে। কর্পোরেট লবি লড়ে যাচ্ছে যথাসম্ভব মুফতে জমি পেতে। আর আম-আদমির রাখোয়ালারা ব্যস্ত 'মানবিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি'র সোনার পাথরবাটি বিক্রি করতে।

কিন্তু বহু সংগ্রামে আদায় করা বনাধিকার আইনের মতো আইনগুলি প্রয়োগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অনীহা এতটাই যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দফায় দফায় তাগাদার চিঠি পাঠাতে হচ্ছে। অভিযোগ করতে হচ্ছে রাজনৈতিক ঔদাসীন্য ও আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে। বস্তুত এই আইনটির প্রণয়নের পথে বাধা এবং তৎপরবর্তী প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত শ্লথগতি আদিবাসী-বনবাসীদের অরণ্যের অধিকার সম্পর্কে ধারাবাহিক ঔপনিবেশিক মানসিকতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা জরুরি।

অরণ্যের অধিকার

আদিবাসী-বনবাসীদের অরণ্যের অধিকার হরণের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনায় সমাজতাত্ত্বিক রামচন্দ্র গুহ তাঁর 'জঙ্গলে গণতন্ত্র' শীর্ষক রচনায় মনে করিয়ে দিয়েছেন— ''রাষ্ট্র-উদ্যোগে অরণ্য-শাসনের ইতিহাস সামাজিক সংঘাতের ইতিহাস।'' ১৭২০ সালে ইংলন্ডের গ্রামের এক যাজকের মন্তব্য, বন-সংক্রান্ত আইন আর স্বাধীনতার ধারণা পরস্পরবিরোধী। এ কথা আজও প্রযোজ্য সরকারি মানসিকতায়। গুহ দেখিয়েছেন কীভাবে বনবিভাগীয় আমলাতন্ত্রের সঙ্গে বনবাসী-আদিবাসীদের লাগাতার সংঘাত-সংঘর্ষের জেরে সরকারি পরিভাষা বদলেছে। 'বৈজ্ঞানিক বনসৃজন', 'যৌক্তিক জমি-ব্যবহার' ইত্যাদি লব্জ, যা আদতে বনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায়িক টিম্বার উৎপাদনের পোষাকি আড়াল মাত্র— তার পরিবর্তে এসেছে চিনি মাখানো বাক্যবন্ধ-— গোষ্ঠীগত ব্যবস্থাপনা, অংশীদারি ভিত্তিক উন্নয়ন এবং 'যৌথ বন-ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক উন্নয়ন'। কিন্তু বাস্তবে বনবাসী আর বন-আমলাদের সম্পর্ক আর ক্ষমতার সমীকরণ কি বদলেছে? আজও কি বনরক্ষক বাহিনী আদিবাসী-বনবাসীদের নিদারুণ অত্যাচার করে না?

উনিশ শতকের শেষ আর বিংশ শতকের শুরুতে ৮০০০ কিমি রেললাইন পাততে গিয়ে গাড়োয়াল-কুমায়ুনের জঙ্গল প্রায় সাবাড় করার পর ব্রিটিশ সরকারের হুঁশ ফেরে। ফলে বন বাঁচিয়ে কাঠ যোগাড়ে ১৮৬৪ সালে ভারতীয় বন বিভাগের পত্তন হয়। আর এর সঙ্গেই অরণ্য-আত্মজদের ঐতিহ্যগত বনাধিকার কেড়ে রাষ্ট্রের মৌরসিপাট্টা কায়েমের আইনি- উদ্যোগ শুরু হয়। পাঁচ বছরের মধ্যেই সরকারি আইন এলো, যার মর্মার্থ— যে জমি চাষ হয় না তার দখলি-স্বত্ব সরকারের। যুক্তিটা হলো, মোগল জমানায় রাজা-বাদশাদের খেয়ালখুশিই বনবাসীদের পরম্পরাগত অধিকারের ভিত্তি, মোগল-বিজয়ী ইংরেজ উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করেছে। তফাৎ হচ্ছে, আগের জমানা ইংরেজের মতো বেনিয়া ছিল না, বনবাসীদের জমি-বসত কেড়ে রাজত্ব বা সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানোর পুঁজিবাদী তাড়না তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। ১৮৭৮ থেকে বনের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ চাপানোর যে ব্যবস্থা চালু হলো কালক্রমে তা বনবাসীদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। গুহ একে বলেছেন, 'জঙ্গলে স্বৈরতন্ত্র'। 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ও' প্রোটেক্টেড ফরেস্ট'-এর নামে বনে প্রবেশাধিকার এবং বনজ সম্পদ ব্যবহারে বনবাসীদের ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা ও দমনমূলক ব্যবস্থা শুরু হয়। এর পর এলো

'ফরেস্ট ভিলেজ'-এর ধারণা— বনবাসীদের বনের ভিতরে থাকার অধিকার বনবিভাগের মর্জি-নির্ভর হলো। নিজ-ভূমে পরবাসী বানানোর সেই পরম্পরা আজও চলেছে।

সাতের দশক থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হলো বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বনাম বনবাসীদের অধিকারের প্রবক্তাদের মধ্যে টানাপোড়েন। গুহ-র বর্ণনায় প্রথম পক্ষে দাঁড়ালেন সংরক্ষণবাদী জেহাদির দল। এদের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়েছে। উন্নয়ন যজ্ঞের পুরোহিতদের সামনে নতজানু হবে বনবাসীরা এমনটাই ধরে নেওয়া যেত। বৃহৎ বাঁধ, লৌহ আকরিকের খনি বা ইস্পাত প্রকল্পের জন্য আদিবাসী-বনবাসীদের জমি দখলের প্রবক্তাদের সঙ্গে জুড়লেন এরা। বাঘ ও অন্যান্য বিপন্ন জন্তু বাঁচানোর স্বার্থকে আদিবাসীদের স্বার্থের উপরে রাখলেন। এদের সবচেয়ে বড় মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ালো পশ্চিমী সংরক্ষণবাদীদের নানা সংস্থা। পশ্চিমী মিডিয়ায় এরা নায়কের মর্যাদা পান। পাশাপাশি বনবাসীদের প্রতি সহানুভূতি-শূন্য প্রচারে অরণ্য-সন্তানদের হয় বিপথগামী নয় প্রাণী-হন্তারক রূপে দেখানো হয়। পশ্চিমী মিডিয়ার চোখে ধনী শহুরে ভারতীয় মধ্যবিত্তই পরিবেশ-সচেতন বন্যপ্রাণী-প্রেমী। তারাই যেন বিপন্ন ব্যাঘ্রকূল এবং প্রলয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। বন ও বিপন্ন প্রাণী সংরক্ষণের কাজটি অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দেশ জুড়ে বন ধ্বংস এবং বাঘ ও অন্যান্য প্রাণীর নির্বিচার হত্যার জন্য আদিবাসী-বনবাসীকুল কতটা দায়ী আর কতটা ঔপনিবেশিক যুগের শাসকবৃন্দ আর তাদের আজকের উত্তরসূরীরা— এ প্রশ্ন তুলেছেন গুহ এবং অন্যান্য অনেক সমাজ-সচেতন পরিবেশবিদ।

গুহ-র তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে দেশে গোটা ছয়েক সংরক্ষিত অভয়ারণ্য ছিল। আজ জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্যের সংখ্যা চারশোর বেশি। দেশের মোট এলাকার ৪.৩ শতাংশ অঞ্চল বিস্তৃত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আয়তন দ্বিগুণ করার প্রস্তাব রয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এখন বৃহৎ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত— পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ। সুন্দরবন সহ এইসব বনাঞ্চলের 'কোর এরিয়া' তো বটেই, 'বাফার জোনে'ও আদিবাসী-বনবাসী এবং জঙ্গল-নির্ভর মৎস্যজীবী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীরা প্রতিদিন নানাবিধ হয়রানি, অত্যাচারের শিকার। জ্বালানি কাঠ, মধু, বনজ ফলমূল, মাছ, লাক্ষা ইত্যাদি 'মাইনর ফরেস্ট প্রডিউস' সংগ্রহের পরম্পরাগত এবং আইনি অধিকার প্রতিমুহূর্তে পদদলিত। একদিকে বনবাসীদের জমির অধিকার নিয়ে নানাবিধ টালবাহানা চলেছে দশকের পর দশক। বনের জমিতে অর্থকরী বনসৃজন এবং টিম্বার উৎপাদনের নামে বনবিভাগীয় আমলাতন্ত্র আর ঠিকাদার-টিম্বার মাফিয়াদের রমরমা বেড়েছে। অন্যদিকে উন্নয়নের নামে বনসংলগ্ন জমি এবং বনজ সম্পদ চলে যাচ্ছে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট কোম্পানিদের হাতে।

বন আইনের বিবর্তন

জঙ্গল সংক্রান্ত আইনের বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কীভাবে ঔপনিবেশিক মানসিকতা স্বাধীনতার পরও ক্রিয়াশীল। একই সঙ্গে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রভাবে সাম্প্রতিক সময়ে আদিবাসী-মূলবাসীদের অরণ্যের অধিকার, প্রয়োগে না হোক, খাতায়-কলমে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে।

প্রথমেই বলতে হয় ১৮৯৪ সালের কুখ্যাত জমি অধিগ্রহণ আইনের কথা। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব মোতাবেক এই আইনে 'জনস্বার্থে' সরকারকে যে কোনও জমি কুক্ষিগত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বনের জমি, আদিবাসীদের জমিও পড়ে। ১৯৮৪ সালে সংশোধনী এনে 'জনস্বার্থ'-র সংজ্ঞার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট জমি-হাঙরদের জন্য সরকারি অধিগ্রহণের রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। সর্দার সরোবর প্রকল্প থেকে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে প্রতিরোধের ঝড় ওঠায় ২০০৩ সালে প্রকল্প-ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য জাতীয় 'রিলিফ' এবং পুনর্বাসন নীতি ঘোষিত হয়। সেখানেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'পাবলিক পারপাস' বা 'জনস্বার্থ'-র সংজ্ঞাকে ধোঁয়াটে রাখা হয়েছে, যাতে কর্পোরেট স্বার্থে সরকারি বদান্যতার দরজা খোলা থাকে। সেই প্রচেষ্টা সংসদে নতুন অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন বিলের নানা রকম সরকারি বয়ানে ও সংশোধনীতে স্পষ্ট। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পক্ষের টানাপোড়েনের জেরে এই বিলটির কোন্ বয়ান সংসদে পেশ হবে এবং কবে তা আইনে পরিণত হবে তা কেউ জানে না।

কিন্তু আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে সরব নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন জনজাতীয় সংগঠনের নেতৃত্ব মনে করিয়ে দিয়েছেন, সংবিধানের পঞ্চম তফসিলের সঙ্গে সংবিধানের ২৪৪ এবং ২৪৪এ ধারা মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে, জঙ্গল ও জমির অধিকার সহ আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এতে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার সংক্রান্ত ধারণাটিকে লেনিনীয় সূত্রায়ণের প্রেক্ষিতে দেখলে ভুল হবে। এটা বরং ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যেই অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন এবং ঐতিহ্যরক্ষার প্রকল্প। অন্ধ্র, ছত্তিশগড়, গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও রাজস্থান— এই নটি রাজ্য পঞ্চম তফসিলের আওতায় পড়ে। এছাড়া অন্যান্য আইন এবং নিয়মাবলী দ্বারা আদিবাসী স্বার্থ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। উত্তর-পূর্বের জনজাতীয় অঞ্চলগুলির স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা স্পষ্ট এই তফসিলে। অবশ্য অরুণাচল, নাগাল্যান্ড এবং তামিলনাড়ু, কেরালা, উত্তরাখণ্ডে বহু জনজাতীয় গোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও দুই তফসিলেই এদের অন্তর্ভুক্তি ঘটেনি এখনও।

১৯৯৪ সালে দিলীপ সিংহ ভুরিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সরকারি বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মেনে ১৯৯৬ সালে তফসিলভুক্ত

এলাকায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত আইন 'প্রভিশন্‌স অব দ্য পঞ্চায়েত্‌স (এক্সটেনশন টু সিডিউল্‌ড এরিয়াস) অ্যাক্ট' বা 'পেসা' হয়। 'পেসা'র পটভূমি তৈরি হয় ১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনের মাধ্যমে, যাতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী-রাজের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সম্প্রসারণ ঘটে। 'পেসা'-র মাধ্যমে এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা আদিবাসী-মূলবাসীদের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলেও প্রযুক্ত হয়। এই আইনে উন্নয়ন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের আগে এবং উন্নয়ন-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রকল্প ঘোষণার আগে গ্রামসভা বা তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েতের অন্যান্য সংস্থার মতামত নেওয়ার কথা বলা হয়। খনি প্রকল্প বা ভূগর্ভের সম্পদ-সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করার আগে গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতের সুপারিশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। রাজ্য বিধানসভায় আইন পাস করে বনসম্পদের উপজ নানা বস্তুর (যেমন জ্বালানি কাঠ, মধু, মাছ, লাক্ষা ইত্যাদি) উপর গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতের স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করার নিদান থাকে। এমনকি বেআইনিভাবে উচ্ছেদ ও জমিহারাদের ভূমি-বিচ্ছেদ আটকানো এবং জমি ফেরানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে বিধানসভাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

এককথায় 'পেসা'-তে গ্রামীণ গোষ্ঠীজীবন যাপন এবং সমষ্টিগত ভাবে ব্যবহার্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ— জল, জমি, জঙ্গল, খনিজ, পশুচারণক্ষেত্র এবং ধর্মাচরণ ও সাংস্কৃতিক পরিসর ইত্যাদির উপর গ্রামসভার আইনি অধিকারকে স্বীকার করা হয়। বিশেষত আদিবাসী-জনজাতীয় অঞ্চলে মাইনিং ও অন্যান্য বেসরকারি কর্পোরেট প্রকল্পের ক্ষেত্রে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সংস্থাগুলির মতামতকে মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আদিবাসীদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ রাজ্য আইনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

সন্দেহ নেই, তলা থেকে আন্দোলনের চাপেই এহেন গণতান্ত্রিকতা। কিন্তু এত কিছুর পরও 'পেসা' প্রয়োগের করুণ চিত্রটি মনে করিয়ে দেয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক কায়েমি স্বার্থ কত শক্তিশালী। ২০০৬ সালে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট বলছে:

> বেশির ভাগ রাজ্যই মাইনিং, বন, আবগারি এবং মহাজনী ব্যবসা সংক্রান্ত রাজ্য আইনগুলি সংশোধন করে পেসা প্রয়োগের পথে এগোনোর বদলে পুরনো যুগের আইন ও নিয়মাবলীই অনুসরণ করছে। বনসম্পদের অপ্রধান উপজ সংগ্রহ, বনের ঝোরা-নালা-পুকুর ইত্যাদি অপ্রধান জলের উৎসগুলির দেখভাল ও ব্যবহার পরিকল্পনা এবং আদিবাসী জমির বেআইনি হস্তান্তর রোখা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে 'পেসা' প্রয়োগের কোনও উদ্যোগ আজও নেওয়া হয়নি। গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতগুলিতে যে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়ার কথা পেসা বলেছে তাও বাস্তবে ঘটেনি। উল্টে এমএলএ, এমপি, অ-আদিবাসী প্রতিনিধিদের তফসিলভুক্ত এলাকায় গ্রামসভা বা পঞ্চায়েতে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এর থেকে বড় অগণতান্ত্রিকতা ও বিবেকহীন কাজ কী হতে পারে?

এই রিপোর্টেই কেন্দ্রীয় জমি অধিগ্রহণ আইন এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের অসঙ্গতির উল্লেখ করে তা সংশোধনের কথা উল্লেখিত।

এর আগে ভুরিয়া কমিটিও বলেছিল: তফসিলভুক্ত এলাকায় আদিবাসী-অর্থনীতির উপর অভিঘাত বিবেচনা না করে যথেচ্ছ শিল্পস্থাপন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সরকারিভাবে শিল্পস্থাপনযোগ্য এলাকার মানচিত্র আগাম তৈরি করে তা স্থানীয় মানুষের কাছে পেশ করতে হবে যাতে তৃণমূলস্তরের গণপ্রতিষ্ঠানগুলি এতে কার্যকরভাবে যুক্ত হতে পারে। গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে শেষ কথা বিবেচিত হওয়া উচিত। কোনও কৃষিজমি বা সমষ্টিগতভাবে ব্যবহার্য জমি শিল্পের প্রয়োজনে হস্তান্তর বা বিক্রি করা যাবে না। তফসিল এলাকায় স্থাপিত শিল্পে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ৫০ শতাংশ অংশীদারি পাবে। এর বদলে শিল্পসংস্থা স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। কোম্পানি সহ লগ্নিকারীদের শেয়ার ২৬ শতাংশের বেশি হবে না।

১৯৯৭ সালে সমতা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সরকারি জমি, আদিবাসীদের জমি এবং জঙ্গলের জমি প্রাইভেট কোম্পানি ও অ-আদিবাসী লোকদের হস্তান্তর বা 'লিজ' দেওয়ার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। একই নিষেধাজ্ঞা তফসিলভুক্ত এলাকায় মাইনিং-এর জন্য জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। রাজ্যগুলিকেও এই মর্মে আইন সংশোধনে বা প্রণয়ণে উদ্যোগী হতে বলেছেন সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি একের পর এক আইন এবং প্রশাসনিক আদেশ বলে 'পেসা' বা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বানচাল অথবা পাশ কাটানোর চেষ্টা চালিয়েছে। ২০০০ সালে এমনই এক অপচেষ্টায় কেন্দ্রীয় খনি দপ্তর বলে: ''সমতা মামলায় (সুপ্রিম কোর্টের) বিচারপতিদের অধিকাংশের রায়ে তফসিল এলাকায় অ-আদিবাসীদের কাউকে খনি প্রকল্পের জন্য জমি হস্তান্তর সংবিধানের পঞ্চম তফশিলের বিরোধী বলে ঘোষিত। কিন্তু মনে করা হচ্ছে পঞ্চম তফসিল এবং সংবিধানের ২৪৪ ধারা জমি হস্তান্তরে সরকারের সার্বভৌম অধিকারকে কেড়ে নিতে পারে না।'' এই নোটে সমতা মামলার রায়-জনিত 'অচলাবস্থা' কাটাতে ২৪৪ ধারা সংশোধন করে মাইনিং ইত্যাদির জন্য জমি হস্তান্তরের রাস্তা সুগম করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ওড়িশা ও অন্ধ্র সরকারও এই পথ ধরে।

বন ও প্রাণী সংরক্ষণ এবং বনবাসীরা

এই পটভূমিকায় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনগুলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই আরণ্যক ও অরণ্য-নির্ভর

আদিবাসী-মূলবাসী গোষ্ঠীগুলির অধিকারগুলি পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণের পথে বাধা কী পরিমাণ দুস্তর। ১৯২৭ সালে ভারতীয় বন আইন (যা আজও বহাল) বন ও বনজ সম্পদের উপর সরকারের প্রায় একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছে। অরণ্যনির্ভর গোষ্ঠীগুলির চিরাচরিত অধিকারগুলি আমলাদের মর্জিনির্ভর সুযোগ সুবিধা তথা বদান্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। বনে প্রবেশাধিকার ও বনজ সম্পদ আহরণ এমনকি জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহের অধিকার কার্যত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বন ধ্বংসের বা বন্যপ্রাণী হত্যার দায়ে কার্যত আদিবাসী-মূলবাসীদের অপরাধী গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক কালের 'নোটিফায়েড ট্রাইব্স' বা 'ক্রিমিনাল ট্রাইব্স' ধারণার ইতরবিশেষে স্বাধীনতার পরও হয়নি। ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রাণীহত্যা, বনজ সম্পদের নির্বিচার শোষণ এবং লুণ্ঠন কমিয়ে সংরক্ষণে জোর দেয়। কিন্তু আদিবাসী-মূলবাসীরা ব্রাত্যই থেকে যান। বরং বন-আমলাতন্ত্র, বনরক্ষী ও সংরক্ষণবাদী এলিটদের রমরমা বাড়ে। সংরক্ষণের মূল্য চোকাতে বলি হন অরণ্য-গ্রামগুলির মানুষ। বনের ভিতরে বা বনের লাগোয় চাষের খেত, পশুচারণক্ষেত্র থেকে তাদের উৎখাত অভিযান জোরদার হয়। জাতীয় পার্কগুলির ক্ষেত্রে এটা নিয়মে পরিণত হয়। একটি হিসেব মোতাবেক ৩০ লক্ষ অরণ্যবাসী এবং আরও কয়েক লক্ষ জঙ্গল-লাগোয়া অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ওপর সরকারি উচ্ছেদের খাঁড়া নেমে আসে।

১৯৮০ সালের বন সংরক্ষণ আইন এবং ১৯৮৮ সালে তার সংশোধনী আইনে বনের উপর কেন্দ্রীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ জোরদার হয়। একই সঙ্গে 'নন-ফরেস্ট পারপাস' বা বন সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনও প্রয়োজনে জঙ্গলের জমির ব্যবহার নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ চলে। আইনে তাই 'পারপাস'-এর ব্যাখ্যায় চা-কফি-রাবার চাষ ইত্যাদি অর্থকরী প্ল্যান্টেশন বা বাগিচার বিস্তারকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলেও বন আমলাতন্ত্র একে বনাঞ্চলে বনবাসীদের ঐতিহ্যগত অধিকার লঙ্ঘন, সঙ্কোচন এবং তাঁদের জন্য সরকারি উন্নয়নের প্রকল্পগুলি বন্ধের ছাড়পত্র মনে করে। ফলে 'ট্রাইবাল সাবপ্ল্যান' অনুযায়ী বনের এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা বা পানীয় জল প্রকল্পে বাধা তৈরি হয়। এত করেও অবশ্য বন উজাড় হওয়া বন্ধ হয়নি। ১৯৮৮ সালের আইনে সেটা স্বীকার করে সরকার। এই আইনে বনবাসীদের বন-নির্ভরতা এবং তাদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে বনের সম্পর্ক কিছুটা স্বীকৃতি পায়। বনভিত্তিক বৃহৎ শিল্প স্থাপনকে উৎসাহ না দিয়ে বনবাসীদের সহায়তায় বনসৃজন ও সংরক্ষণের ধারণা কিছুটা কল্কে পায়। কেন্দ্রীয় সরকার 'জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট'-এর নীতিকে উৎসাহিত করে।

এই নীতির সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিক্ষোভ-বিতর্কের জেরে সর্বোচ্চ আদালতের মন্তব্য, মনোভাব ও রায়ের ভিত্তিতে পরবর্তী বন আইন ও সরকারি নির্দেশাবলীর পটভূমি তৈরি হয়। বনের সরকারি সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে আমলাদের নথির বাইরে বন ও বনবাসীদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি মেলে। অন্যদিকে 'নন-ফরেস্ট ইউজ' সরকারি মর্জি নিয়ন্ত্রিত হয়। পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দেয় যে বনের জমির দখলদারি বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে আদালতের উদ্যোগে 'সেন্ট্রাল এমপাওয়ার্ড কমিটি' গঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে বহিরাগত জমি-হাঙর এবং পরম্পরাগত জঙ্গলবাসীদের মধ্যে ফারাক টানার প্রশ্নে সরকারি নীতির ধোঁয়াশাকে ঘিরে। তাঁদের জমির অধিকার সংক্রান্ত পাট্টা প্রদান নিয়ে জটিলতা বাড়ে। নয়ের দশকে কমিশনার ফর সিডিউল্ড ট্রাইব অ্যান্ড সিডিউল্ড কাস্ট্স এবং পরবর্তীকালের প্রখ্যাত সমাজকর্মী ডঃ বি ডি শর্মার রিপোর্টে স্পষ্টতই বলা হয়: আদিবাসীদের জমি ও অন্যান্য অধিকারের দাবির নিষ্পত্তি যদি বন দফতরের নথিপত্রের ভিত্তিতে করা হয়, তাহলে তা তাঁদের অধিকার নাকচের সামিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাদের গ্রামে ও অঞ্চলের সাধারণ মানুষ জানেন ও চেনেন, বন দফতরের খাতায় তাঁদের অনেকেরই নাম নেই, তাঁদের জমি ও ফসলের স্বত্বের স্বীকৃতি নেই। এই মানুষগুলো তাহলে কোথায় যাবেন?

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি এসব ওজর-আপত্তি মানে নি। ২০০২ সালে আসাম ও মহারাষ্ট্রে বনবাসীদের উচ্ছেদ জোরদার হয়। বি ডি শর্মা ও অন্যান্যরা প্রতিবাদে পথে নামলে ২০০৪ সালে সংসদীয় নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দফতর একটি সার্কুলার দেয়। এতে আদিবাসী-মূলবাসীদের 'দখলদারি'-র আইনিকরণের 'কাট-অফ ইয়ার' ১৯৮০ সালের বদলে ১৯৯৩ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজ ও জনজাতি সংগঠনগুলি এটা মেনে নেননি।

সমালোচনার মুখে পড়ে সুপ্রিম কোর্টও। সমালোচকরা বলেন, সুপ্রিম কোর্ট 'মানুষ এবং পরিবেশের সংঘাত' সম্পর্কিত বানানো তত্ত্বটির ন্যায্যতার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এর ফলে একদিকে অনেক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালত আদিবাসীদের উৎখাতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষায় জোড়াতালি দেওয়া কিছু ব্যবস্থার নিদান হেঁকেছেন। সমালোচকদের বক্তব্য: প্রকৃতি ও মানুষের সংঘাত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক-বাহকদের সৃষ্টি এবং অরণ্যসন্তানদের পরম্পরাগত অর্থনীতি এবং জ্ঞান, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ তার বিপরীতধর্মী একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি— এই সত্যকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ আদালতের দ্বিধা ও সীমাবদ্ধতা থেকেই এই দোলাচল।

সরকারি ও বিচারবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে টানাপোড়েন এবং মুক্ত বাজার-অর্থনীতির প্রবক্তাদের ক্রমবর্ধমান প্রতাপের সঙ্গে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের তীব্রতাবৃদ্ধি— এই প্রেক্ষাপটে পরবর্তী

আইনি সংশোধনগুলিকে বোঝা যেতে পারে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংশোধনী আইন ২০০২ এবং ২০০৬ বনবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত দাবিদাওয়া নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টারকে দিয়ে তদন্তের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়। অন্যটায় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পগুলির প্রয়োজনে বনের ভিতরে ও লাগোয়া এলাকায় অধিকার সঙ্কোচনের ব্যবস্থা জোরদার হলো। ফের এই নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝড় ওঠে দেশ জুড়েই।

বনাধিকার আইন ২০০৬

এই ধারাবাহিকতাতেই উঠে আসে ২০০৬ সালের দ্য সিডিউল্ড ট্রাইব্স অ্যান্ড আদার ট্র্যাডিশনাল ফরেস্ট ডোয়েলার্স (রেকগনিশন অব ফরেস্ট রাইট্স) অ্যাক্ট। এটাই সাম্প্রতিকতম আইন। নতুন আইনে আদিবাসী ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীদের সঙ্গে 'ঐতিহাসিক অবিচার'-এর কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সব ধরনের বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জমির অধিকার এবং বনজ সম্পদ ব্যবহারের অধিকারের স্বীকৃতি মিলেছে। অ-আদিবাসীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন প্রজন্ম ধরে বনবাসী বা বননির্ভর জীবিকায় যুক্ত পরিবারগুলিকেও এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ৭৫ বছর (২৫ বছরে এক প্রজন্ম) বসবাসের প্রামাণ্য নথিপত্র পেশ করতে হবে। গোল বেঁধেছে এই নথিপত্র নিয়ে। কেননা এই পরিবারগুলোর অনেকেরই এত পুরনো নথিপত্র নেই। থাকলেও তা হারিয়ে গেছে, বা ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নথিপত্রের অজুহাতে তাদের অধিকার হননের চেষ্টার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। দাবি উঠেছে এই শর্ত তুলে নিতে হবে। সাধারণভাবে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরের আগে যারা বনাঞ্চলে বসবাস করছেন তাদের বনাধিকার মিলবে। জমির অধিকার বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর হবে কিন্তু জমি বিক্রি বা অন্য কাউকে হস্তান্তর করা যাবে না। একটি পরিবার ৪ হেক্টর পর্যন্ত চাষের জমি পাবে।

এই আইনের সমর্থকদের মতে, বনাধিকার প্রয়োগে গ্রামসভার গুরুত্ব এতে বেড়েছে। জমি ও বাস্তুভিটের স্বত্বাধিকার প্রাপকদের তালিকা গ্রামসভাই তৈরি করে পাঠাবে মহকুমা স্তরের নজরদারি কমিটিকে। শুধু ব্যক্তি বা পরিবারকে জমি-মালিকানা নয়, গোষ্ঠীগতভাবে ব্যবহৃত জমি ও জঙ্গল, গ্রামের পশুচারণক্ষেত্র, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিসর ইত্যাদির অধিকারও গুরুত্ব পাবে। বনজ সম্পদ সংগ্রহের অধিকারের পাশাপাশি গ্রামসভার মাধ্যমে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন বনবাসীরা। এক্ষেত্রে প্রাণী শিকারের ঐতিহ্যগত অধিকার ব্যতিরেকে 'কমিউনিটি ফরেস্ট' সংক্রান্ত পুরনো সমস্ত অধিকার মান্যতা পাবে। সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে উৎখাত তথা ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসন না পাওয়া মানুষ বা অন্য বনাঞ্চল থেকে খেদানো আদিবাসী-মূলবাসীরা ২০০৫ সালের ১৩ ডিসেম্বরের আগে বনের জমি দখল করে বসতি করে থাকলে তাদের নতুন করে ছিন্নমূল হতে হবে না। সরকার গ্রামোন্নয়ন তথা বনবাসী উন্নয়নে স্কুল-হাসপাতাল-অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনে বনের জমি ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এসব করতে গেলেও গ্রামসভার অনুমতি লাগবে। এসব কাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ এক হেক্টরের কম হবে এবং প্রতি হেক্টরে ৭৫টির বেশি গাছ কাটা চলবে না। আইনে বনদপ্তরের মৌরসীপাট্টা কমানো হয়েছে এবং গ্রামসভার মাধ্যমে বনবাসীদের ক্ষমতায়ণের কথা বলা হয়েছে।

এই আইনের সমালোচকরা অবশ্য 'প্রগতিশীল ও জনমুখী' চরিত্র সত্ত্বেও পেসা আইন প্রয়োগের করুণ চিত্রটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। গ্রামসভার গুরুত্ববৃদ্ধি সত্ত্বেও জমির অধিকারের প্রশ্নে দাবি-নিষ্পত্তির ক্ষমতা রয়ে গেছে সরকারি আমলাতন্ত্রের হাতেই। তারাই পাট্টা দিচ্ছেন বা দাবি নাকচ করছেন। বনবাসীর সংজ্ঞায় ইচ্ছে করে ধোঁয়াশা রেখে অ-আদিবাসীদের অনেককেই বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ। সবচেয়ে বড় কথা, গ্রামসভার মাধ্যমে বনাঞ্চলে তৃণমূল স্তরে অংশীদারি-ভিত্তিক গণতন্ত্রের ধারণা কষ্টকল্পনাই থেকে যাবে বলে তাঁরা মনে করছেন। কেননা গ্রামসভার গঠন ও পরিচালন ব্যবস্থায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। রাজনৈতিক দলবাজিতে দীর্ণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রান্তিক আদিবাসী-বনবাসীদের কণ্ঠ হারিয়ে যায়। এই আইনেও গ্রামসভা গঠনের জন্য সভা ডাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সহ বহু রাজ্যেই বনাধিকার আইন প্রয়োগ থমকে আছে বনবিভাগের আমলাদের বাধা এবং রাজনৈতিক দলগুলির চাপে। আমলারা নতুন আইন মেনে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফরেস্ট রাইট্স কমিটি গঠন না করে পুরনো আইন মোতাবেক বনবিভাগের ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটি, ইকো-ডেভলপমেন্ট কমিটি বা জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ এইসব কমিটির মাধ্যমে বিপুল উন্নয়নী তহবিল এবং বনজ সম্পদের বাণিজ্যিক কেনাবেচা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রামসভাকে এই মধুভাণ্ডের ভাগ দিতে বনকর্তারা নারাজ। অন্যদিকে পঞ্চায়েতী রাজনীতির মাধ্যমে গ্রামসমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের আওতার বাইরে বন-গণতন্ত্র বিকাশে মোটেই আগ্রহী নয়। বনের জমির পাট্টা বিতরণে আমলা ও নেতাদের মৌরসীপাট্টা বজায় না থাকলে তাদের ক্ষমতার ভিত্তি অনেকটাই নড়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কিছু রাজ্যে বনাধিকার আইনে বর্ণিত গ্রামসভাকে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার অধীন করে সরকারি নির্দেশ জারি হয় ২০০৮ সালে।

এহেন অবস্থায় আইনটির প্রগতিশীল চরিত্র স্বীকার করলেও সমালোচকরা এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে সন্দিহান। তাঁদের

বক্তব্য: সমস্ত আইন ও নীতি হচ্ছে শাসকশ্রেণীর দ্বারা ও তার প্রয়োজনে। দেশের শাসকরা তাদের উন্নয়নের মডেল বদলাবেন না এবং নানা চাপে-তাপে কিছুটা জনমুখী আইন করলেও তার প্রয়োগ সম্ভাবনাকে লাগাতার অন্তর্ঘাত করে যাবেন। তাছাড়া আদিবাসী সমাজ সমসত্ত্ব কোনও সমাজ নয়, এবং গ্রামসভাও গ্রামীণ ক্ষমতাতন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্তি পাবে না। এই পটভূমিতে বনবাসীদের ক্ষমতায়ন এবং অংশীদারি গণতন্ত্রের ধারণা আকাশ কুসুম থেকে যাবে।

অন্যদিকে আইনটির সম্ভাবনায় যারা আস্থা রাখেন তারা অবশ্য এটিকে দীর্ঘ গণ আন্দোলন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ফসল বলে মনে করেন। রাষ্ট্রচরিত্র বদল বিনা জনমুখী আইন প্রয়োগের লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যারা সন্দিহান, তাদের নৈকষ্যবাদী বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে বনাদিকার আইনের সমর্থরা বনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও জনমুখী উন্নয়নের জন্য সংগ্রামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে তুলে ধরছেন।

এই বিতর্কের মধ্যেই প্রান্তজনদের বিক্ষোভ-আন্দোলন ধূমায়িত হচ্ছে সারা দেশ জুড়েই। নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক তথা সংসদীয় রাজনৈতিক পথে এবং আদিবাসী ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পথে লড়াই চলেছে অরণ্যবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার। লুণ্ঠন ও হত্যালীলা যেখানে ব্যাপকতর ও নগ্নতর— সেখানে তা সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। ছত্রিশগড় থেকে ঝাড়খন্ড, দণ্ডকারণ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজ অঘোষিত যুদ্ধ-পরিস্থিতি। এই অগ্নিগর্ভ আরণ্যক ভারতের দিকে এতদিন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি নজর দেয়নি। ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, ওড়িশায় বা তেলেঙ্গানায় জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আকাbখা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আত্মপরিচিতি বাঁচানোর সংগ্রামকে আত্মসাৎ করে তারা পৃথক রাজ্যের দাবিতে জনপ্রিয় আন্দোলনগুলির পিঠে সওয়ার হয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। লুণ্ঠন-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অলাতচক্র থামেনি। বিক্ষোভ-বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান অভিঘাত ক্ষমতার অলিন্দে উত্তরোত্তর অনুভূত হচ্ছে। নাড়া খাচ্ছে শহুরে নাগরিক সমাজও। ফলে আদিবাসী-বনবাসীদের নিজস্ব ঘরানার আন্দোলন, মাওবাদী সশস্ত্র আন্দোলন এবং পরিবেশ ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সম্মিলিত প্রভাব পড়ছে দেশের মূলধারার রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা ও আইনের ওপরও। কংগ্রেসের অন্যতম আম-আদমি মুখ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ও অধুনা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জয়রাম রমেশ সম্প্রতি স্বীকার করেছেন, মাত্র ৫০টি লোকসভা কেন্দ্রে আদিবাসীদের নির্ধারক ভূমিকা থাকায় ভোটের কারবারিরা তাঁদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতো না। কিন্তু উন্নয়নের নামে মাইনিং এবং অন্যান্য কর্পোরেট মেগা প্রকল্পের জন্য আদিবাসীদের জমি লুণ্ঠন যে বিস্ফোরক সামাজিক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে তাতে ট্রাইবাল ভারতের বেদনা-বিদ্রোহ আজ দেশের রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রীয় ইস্যু হয়ে উঠেছে। আর এই ক্ষেত্রে মাওবাদীদের ভূমিকার গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করেননি বরং সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি ও যোজনা কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটির বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে তিনি মেনে নিয়েছেন: মাওবাদীদের পদাতিক বাহিনীর অধিকাংশই আদিবাসী। পপুলার সংস্কৃতিতেও এর প্রভাব দৃশ্যমান। বলিউডের দিকে তাকান— কয়েক দশক আগে গোবিন্দ নিহালনির আদিবাসীদের সামন্তবাদী আক্রমণ ও নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একজন আদিবাসী মানুষের নিজস্ব ধরনের প্রতিবাদ নিয়ে ছবি 'আক্রোশ' ছিল প্রান্তধারার প্রতিনিধি। আজ প্রকাশ ঝা-র 'চক্রব্যূহ' মূলধারার ব্লক-ব্লাস্টার।

আজ যখন প্রান্তবাসী-বনবাসীদের অস্তিত্বের লড়াই হিংস্র রাষ্ট্রীয়-কর্পোরেট আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক চরিত্র নিচ্ছে, তখন শাসকদেরই ঠিক করতে হবে সিধো-কানহু, তিলকা-বীরসার সন্তানদের তারা কোন্ পথে ঠেলে দিতে চান।

শিল্প বান্ধব অথবা শিল্পপতি বান্ধব কেন্দ্রীয় সরকার

২২ পৃষ্ঠার পর

সিপিএম সিঙ্গুরে শিল্পের দাবিতে মিছিল করছে; স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে। কর্পোরেট তোষণের রাজনীতিতেই আকণ্ঠ ডুবে আছে। অতএব এফডিআই বিরোধী লড়াই কে করবে?

আমার তৃতীয় দুশ্চিন্তার কারণটা আরও গভীর। ক্ষমতাসীন বাম ডান আমার দৃষ্টিতে অভিন্ন। তাদের স্বর, ক্ষমতার স্বর। কিন্তু ক্ষমতাহীন সিপিআই(এম-এল) লিবারেশন... বামও বটে। আমি আশান্বিত এদের এফডিআই বিরোধিতায়, পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধিতায়। কিন্তু এরাও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ঠেকাতে যে গণআন্দোলনের পরিসর প্রস্তুত হয়েছিল তার নেতৃত্ব দিতে অনাগ্রহী। ৬ অক্টোবর, ২০১২ কলকাতায় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূল যতই খুচরো ব্যবসায়ে এফডিআই-এর বিরোধিতা করুক তার আসল পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে।" কী সাংঘাতিক! ভাবুন, হাজার নয়, লাখো কমিউনিস্ট নিধন হলো চিয়াং কাইশেকের হাতে; তারপরও তারই সাথে ঐক্য করে জাপ সাম্রাজ্যবাদকে রুখলেন মাও সেতুঙ। চিয়াং কাইশেককে পরীক্ষা দিতে হলে চীনা ইতিহাস টের পেত কত ধানে কত চাল। তবে স্মরণ রাখা যেতে পারে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম পর্বেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনে লিবারেশন সিপিএমের সাথে জোট করেছিল কোনো প্রিটেস্ট বা টেস্ট ছাড়াই। একেই কি বলে বাম ছুৎমার্গিতা? ঠিক জানিনা।

অতএব দুশ্চিন্তার কারণ থেকেই যাচ্ছে।

আক্রান্ত পরিবেশ, আক্রান্ত মানুষ

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

সাম্রাজ্যতন্ত্রের একেবারে গোড়ার দিকে ইউরোপীয় জাতিসমূহ স্রেফ পেটের তাগিদে আমাদের গোলার্ধে পা রেখেছিল। আমাদের মতো এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ছিনতাই করে তারা তাদের ঐশ্বর্যের আদি ইমারত গড়ে তোলে। ঐশ্বর্যের ভাঁড়ারে টান পড়ায় আজকে আবার তাদের নতুন করে ঐশ্বর্য জোগাড় করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ছিনতাই-এর আয়োজন করেছে। তাই আজকের প্রকৃতি-পরিবেশ আবার ঐশ্বর্য-শিকারিদের হাতে ধর্ষিত হচ্ছে, বিপন্ন ও আক্রান্ত হচ্ছে। এই আক্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে অপ্রত্যাহারযোগ্য-ভাবে পরিবর্তিত করছে।

মুনাফার তাড়নায় এই শিকারিরা চায় প্রকৃতি থেকে তাদের খেয়ালখুশি মতো অপরিমিত হারে সম্পদ আহরণ করতে। প্রকৃতিকে তাদের খেয়ালখুশি মতো গড়ে-পিটে নিতে। তারা চায় প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মের স্বাভাবিক অবরোধ অতিক্রম করে মুনাফা-তাড়িত তাদের পছন্দের নিয়মে প্রকৃতিকে বেঁধে ফেলতে।

বিশ্বের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাগুলো সেই তথাকথিত আদিম পুঁজি পুঞ্জীভবনের দিনগুলো থেকে দুটি বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করে আজও তাদের সেই প্রকৃতি-পীড়ন করে মুনাফার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আমাদের কাহিনী তাই শুরু করতে হবে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমাজ-সংগঠনের অগ্রণী দেশ, প্রকৃতি ধর্ষণের মুখ্য ধর্ষক সেই মার্কিন দেশ নিয়েই।

মার্কিন দেশের হালচাল

গত পাঁচ বছরে মার্কিন দেশের আবহাওয়ায় বেখাপ্পা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যে অঞ্চলের অর্থনীতি যত বেশি কার্বন-কেন্দ্রিক, সেখানে বিপর্যয়ের পরিমাণ বেশি। স্থানীয় ভাবে বিধ্বংসী ঝড় ও অতিবৃষ্টি যেমন এই বেখাপ্পা চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য, গড়পড়তা পুরো উত্তর আমেরিকা জুড়ে খরা হলো তেমনি অন্য এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মার্কিন দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা ২০১২-কে বিরাট খরার বছর বলে আখ্যা দিয়েছেন— দেশটির ২৫ শতাংশ অঞ্চল তীব্র খরা কবলিত ছিলো। অথচ এই বছরেই সেদেশের অন্তত তিনটি রাজ্যে অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হয়েছে, নিউইয়র্ক শহরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে বিধ্বংসী স্যান্ডি ঝড়।

মার্কিন দেশের ব্যবসায়ীদের ব্যবসার মূলমন্ত্র হলো সংকটকে সুযোগে রূপান্তরিত করা; প্রকৃতি ধ্বংস এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ— এই দুই বিপরীতধর্মী বিষয়কে যুগপৎ ব্যবসার উপকরণে পরিণত করা। তাই মার্কিন দেশে ঘটমান এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় গড়পড়তা মার্কিন নাগরিকদের কাছে আতঙ্কের কারণ হলেও এতে মার্কিন ব্যবসায়ীরা উল্লসিত হয়। 'ত্রাণ-ব্যবসা'-র সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের অর্থ আমদানি বাড়ে, ত্রাণসামগ্রীর ব্যবসায়ীদের ব্যবসাও বাড়ে, তাদের শেয়ারের দাম নিউইয়র্ক-টোকিওর স্টক-এক্সচেঞ্জে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে।

একটা হিসেব দেওয়া যাক। স্যান্ডি ঝড়ে নিউইয়র্ক শহরের যে ধরনের ক্ষতি হয়েছে তার একটা বড় অংশ হয়েছে ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি, খামার ও বাগান, গাড়ি ইত্যাদি নষ্ট হওয়া জনিত ক্ষতি। এই জাতীয় ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ ১৫০০-২০০০ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য। বাড়ি-গাড়ি এবং গৃহস্থালির কাজে লাগে এমন দ্রব্যাদি সরবরাহের খুচরো ব্যবসার মার্কিন দেশব্যাপী দুটি বৃহৎ সংস্থার নাম হোম-ডিপো এবং লাওয়ে। এর মধ্যে হোম-ডিপো সংস্থার শেয়ারের দাম স্যান্ডির পর নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ খোলার এক সপ্তাহের মধ্যে বেড়েছে ৩ শতাংশ আর লাওয়ের বেড়েছে ৬ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১২-র মাঝামাঝি নির্মাণ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৩ বছরের পুরনো মন্দার সময়ের সাপেক্ষে বেড়েছে ৮২ শতাংশ। কর্মসংস্থানের প্রবণতার দিকে তাকিয়ে মার্কিন অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো অনুমান করছে যে নিউইয়র্ক শহর, নিউ জার্সির সাগর বেলাভূমি বরাবর নির্মাণ কাজের জন্য সারা মার্কিন মুলুক থেকে বেকার শ্রমিকরা এখানে এসে হাজির হবে। ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৬০ হাজার শ্রমিক সেখানে নানান কাজে এখনই যুক্ত হয়ে পড়েছেন।

খরা-অতিবৃষ্টির কারণে মার্কিন দেশের মূল কৃষিজাত খাদ্যশস্য, যেমন ভুট্টা আর সয়াবিনের, উৎপাদন শোচনীয়ভাবে কমেছে। সারা বিশ্বে বাণিজ্যিকভাবে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য ব্যবসার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়, মার্কিন দেশ সেই সব খাদ্য শস্যের মাত্র ১ শতাংশ উৎপাদন করে কিন্তু বাণিজ্যিক বণ্টন ব্যবস্থার ৯০ শতাংশ তার দখলে। ফলে খাদ্যশস্য আমদানি-রপ্তানিতে কখনও নিয়ন্ত্রণ, কখনও অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য বাজারে লভ্য করে দেশটি বিশ্ববাজারে খাদ্যের দাম নির্ধারণ করে। খাদ্যশস্য গুদামে জমিয়ে রেখে মার্কিন দেশ খাদ্য-ঘাটতির দেশগুলোতে আরও বেশি দামে বর্তমানে খাদ্য রপ্তানি করছে এবং বিভিন্ন দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে।

এর পাশাপাশি মার্কিন দেশের মনস্যান্টোর মতো দুর্বৃত্ত আধুনিক প্রযুক্তিজাত খাদ্যের ব্যবসায়ী সংস্থাগুলো খাদ্যের বাজারে এই কৃত্রিম অতি-চাহিদা সৃষ্টি করে এই সুযোগে তাদের

দেশে প্রত্যাখ্যাত ও জমে থাকা অপ্রমাণিত, ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর জিন-প্রযুক্তিজাত ভুট্টা এবং সয়াবিন অপেক্ষাকৃত সস্তায় খাদ্য-ঘাটতির দেশগুলোতে রপ্তানি করে আর এক দফা মুনাফা করছে। কর্পোরেট মুনাফা, মৃত্যু ব্যবসা এবং পরিবেশ-ধ্বংস, এই ত্রহস্পর্শের পেছনে ক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী দর্শন, তার সীমাহীন লালসা, যা সে মানুষ মেরে, প্রকৃতি ধ্বংস করে চরিতার্থ করতে চায়। তাই আমরা দেখি যে পরিবেশ বাঁচানোর, মানবজাতিকে উন্নত সাংস্কৃতিক মানবিক জীবনযাপনের নিশ্চিন্তি প্রদানের জন্য যত আন্তর্জাতিক শুভ উদ্যোগ, সেগুলো বানচাল করতে, বিপরীতমুখী করতে, লক্ষ্যচ্যুত করতে সদাই হাজির থাকছে এই সমস্ত দুর্বৃত্ত কর্পোরেট সংস্থাগুলো। কিয়োটো বিধি (কার্বন নির্গমন নিরোধক আন্তর্জাতিক বিধি) থেকে সাম্প্রতিক দোহা সম্মেলন (ভূ-উষ্ণায়ণ কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগের একটি দফার আলোচনা)— সর্বত্রই মনসান্টো, কারগিল, ড্যানিয়েল আর্চার, লকহীড যুদ্ধবিমান প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো মঞ্চে হাজির থাকছে। তারাই এইসব আন্তর্জাতিক বিধিগুলির মূল ধারাগুলি মুসাবিদা করছে, তারাই রাষ্ট্রনায়কদের কর্পোরেট সংস্থার নির্দিষ্ট করা বিধি মানতে বাধ্য করছে আর নাটের গুরু মার্কিন দেশকে তার যাবতীয় কুকর্মের দায় থেকে রেহাই দিচ্ছে।

ইউরোপের কথা

ইউরোপের অবস্থা এমন কিছু সুখকর বা প্রীতিপ্রদ নয়। সেখানেও পুঁজির হাতে পরিবেশ পীড়ন ঘটেই চলছে। সেখানে বেখাপ্পা শীতল আবহাওয়া নাগরিক জীবনের ছন্দ ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি নানান সংকটের জন্ম দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্তারা পরিবেশ-বিপর্যয়ের মূল কারণ পুঁজির অত্যাচারকে সর্বতোভাবে আড়াল করতে ব্যস্ত।

বিশ্বায়নের নামে দুর্বৃত্ত পুঁজি যে জমি-ডাকাতি ও প্রকৃতি লুণ্ঠন পুনরায় শুরু করেছে তার ফলে পৃথিবীর প্রকৃতি-পরিবেশ, বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও সমাজ আজ বিপন্ন। কর্পোরেট দুনিয়া আর তাদের তাঁবেদার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্বায়ন সমর্থক স্বৈরাচারী, তঞ্চক, ব্যক্তিগত লালসা তাড়িত, দেশের প্রতি আনুগত্যহীন একদল বিদূষকের হাতে বিশ্বের পরিবেশ পণবন্দী হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি এক মরণফাঁদে পতিত হয়েছে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ৯৯ শতাংশ মানুষ। আক্রান্ত প্রকৃতি জন্ম দিয়েছে আক্রান্ত মানুষের— জন্ম হয়েছে এক নতুন ধরনের শ্রেণী দ্বন্দ্বের।

চীন

> **"...চীন হলো পৃথিবীর বৃহত্তম ভোক্তা দেশ, যারা মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে গরুর মাংস, সবই গোগ্রাসে গিলে খায়...।"**
>
> **— ম্যাকডোনাল্ড সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন**

বিশ্বায়ন কেবল একটি রাজনৈতিক-অর্থনীতির রূপায়ণ নয়— বিশ্বায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হরেক রকম মানবতা-বিরোধী উপাদান, যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সমাজের নানা ক্ষেত্রে। তঞ্চকতা, হিংসা, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, অবদমন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বায়িত দেশগুলি যে অমানবিক প্রবণতাগুলির জন্ম দেয়, নিজেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বলে বিজ্ঞাপিত করলেও বিপ্লবোত্তর চীন বিশ্বায়নকে আদর করে বরণ করার সেই সব বিষময় ফলগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রসারণ

মার্কিন দেশের যুদ্ধবাজ লবির নেতৃত্বে বিশ্বায়নপন্থীরা নিউক্লিয়ার অস্ত্র-র বিষয়টি একটি দ্বি-মুখী তরোয়াল হিসেবে ব্যবহার করে। বিশ্বায়িত দুনিয়ার স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে চীন (চীনকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বাইরে রাখা হয়েছিলো, চীন অনেক আবেদন-নিবেদনের করে এই ব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় যোগ দেয়, যেখানে অন্যান্য বহু দেশ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগ দিতে চায়নি বলে তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে একঘরে করে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগ দিতে বাধ্য করা হয়) বিশ্বায়নের এই সমস্ত কু-ফল যে কেবল আত্মস্থ করেছে তাই নয়, পরিবেশের দিক থেকে ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রক্রিয়া আগ্রাসীভাবে অনুশীলন করছে।

বহুরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিধি লঙ্ঘন করে চীন বিভিন্ন দেশকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ সরবরাহ করে চলেছে। ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশকে যে চীন নানা রকম নিউক্লিয়ার দ্রব্য সরবরাহ করছে তা এখন জানাজানি হয়ে গেছে। এর ফলে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জনিত পরিবেশ দূষণ এবং মানুষের স্বাস্থ্যহানিও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে।

আফিং-এর কথা

সারা বিশ্বেই নেশার দ্রব্য সরবরাহ করার গোপন এবং 'কালো ব্যবসা'র একটা বিরাট বাজার রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্বৃত্ত এবং পেশাদার খুনে-বদমাশরা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। চীন দেশটিও বর্তমানে মধ্য-আমেরিকার নেশার ব্যবসার স্বর্গরাজ্যগুলির চেয়ে তেমন কিছু আলাদা নয়। 'বাজার-সমাজতন্ত্র'-কে আঁকড়ে ধরার পর চীনে যে সব নয়া-আর্থিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে, সেখানে যেমন একদিকে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি এই সমস্ত অঞ্চলে নেশার দ্রব্য-র উৎপাদন, বণ্টনের এক বিরাট বাজার গড়ে উঠেছে। যে আফিং-কে কেন্দ্র করে চীনে বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটেছে, সেই চীনে এখন বাজার অর্থনীতির মৃগয়াক্ষেত্র ইউনান, সিচুয়ান, গুইঝু, গুয়াংঝি, হুনান, কুইংঘাই প্রভৃতি অঞ্চল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আফিং-এর খামারে ভরে গেছে। নয়া আর্থিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদগ্র তাগিদে চীন ওপরে বর্ণিত অঞ্চলগুলো থেকে আদিবাসী সংখ্যালঘু নাগরিকদের স্রেফ হাটিয়ে দিয়েছে। তাদের সামান্য জমি-জোত-

বসতবাড়ি গিলে খেয়েছে খেলনার, অতিরিক্ত দূষণপ্রবণ ব্যাটারির কারখানা। জীবনধারণের তাগিদে এই সংখ্যালঘু নাগরিকরা রোজগার করছে আফিং বিক্রি করে।

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

পরিবেশ দূষণ এবং পরিবেশের ক্ষতির ফল এখন সারা চীন দেশ জুড়েই প্রকাশিত হচ্ছে। সারা এশিয়াতে কিছু কিছু ছোঁয়াচে রোগ ছড়ানোর জন্য চীনই মুখ্যত দায়ী। চীন নিজেও তার থেকে রেহাই পায়নি। সেদেশের বড় বড় অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক এবং নিবরচ্ছিন্ন ভাবে কলেরা এবং ম্যালেরিয়া প্রায় মহামারী রূপে বারে বারে ফিরে আসছে। নেশার দ্রব্য সহজে লভ্য হওয়ায় অতিরিক্ত নেশা-জনিত মৃত্যু চীনে সমস্যার স্তর ছাড়িয়ে সংকটের রূপ নিয়েছে।

চীনা সমাজে আর্থিক অসাম্য বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে বেশ্যাবৃত্তি, আর এই সংগঠিত বেশ্যাবৃত্তি ব্যাপক আকারে যৌন রোগের জন্ম দিয়েছে। ডঃ জর্জ হাতেম বিপ্লব-পূর্ব সাংহাই-তে যৌনরোগ নির্মূল করার অভিযানে যোগ দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেন যে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা এবং আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে যৌনরোগ নির্মূল হওয়ার নয়। ডাঃ হাতেম চীনে থেকে যান। চীন বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার সময় ডঃ হাতেম রূপান্তরিত হন চীনা নাগরিক মা-হাইতে রূপে, আর ১৯৫০ এর মধ্যে সাংহাই শহর তার কলঙ্ক— বেশ্যাবৃত্তি এবং যৌনরোগ— থেকে মুক্ত হয়। আজকের চীনের শহরগুলোর চেহারা ভিন্ন— মা-হাইতে-দের স্বপ্ন মৃত।

পরিবেশ দূষণ ও চীন

বিশ্ব-পরিবেশ দূষণে আজকের একজন মুখ্য খলনায়ক চীন। ওজোন স্তর ধ্বংসের জন্য দায়ী যে সব মারাত্মক গ্যাসসমূহ মানবজাতি তার সীমাহীন অবিমিশ্রকারিতার ফল হিসেবে নির্গমন করে থাকে, সেই নির্গমনে চীনের ভাগ ১৮ শতাংশ। ভূ-উষ্ণায়ন গ্যাস নির্গমনে এখন চীন দ্বিতীয় স্থানে, ২০২০ সালে আসবে প্রথম স্থানে! (তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে এই দেশটির জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি) লুপ্তপ্রায় যে সমস্ত প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য মানবজাতি যখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন 'সমাজতান্ত্রিক' চীন দেশে এই লুপ্তপ্রায় প্রাণীগুলিকে হত্যা করে তাদের বিভিন্ন দেহাংশের রমরমা ব্যবসা চালানো হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসে চীনের স্থান তালিকার একবারে শীর্ষে।

চীন তার শিল্প-উৎপাদন বাড়ানোর উদগ্র তাগিদে শক্তি চাহিদা বাড়িয়ে চলেছে বেহিসেবি ভাবে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ চালানোর জন্য সে দেশ প্রধানত নির্ভর করে কয়লা-ভিত্তিক তাপ বিদ্যুতের ওপর। তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমনের ফলে সারা পৃথিবীর দশটি সবচেয়ে দূষিত শহরের পাঁচটি চীনে অবস্থিত— রাজধানী বেজিং, সাংহাই, ঝিয়ান, সেনইয়াং, এবং অবধারিতভাবেই নয়া-আর্থিক অঞ্চল সমৃদ্ধ গুয়াংঝু। বায়ুমন্ডলে ভাসমান কণার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, চীনের বেশির ভাগ শহরেই ভাসমান কণার হার সেই গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে ২০ থেকে ৩০ গুণ বেশি। চীন সরকারের নিজেদের হিসেব মতো, বায়ু-দূষণ-জনিত কারণে ১৯৯২-৯৫ সালে চীনে ৯ লক্ষাধিক মানুষ অকালমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। পরবর্তী ১৫ বছরে এই সংখ্যা আরও ৯ শতাংশ বেড়েছে বলে অনুমান। শিল্প সংস্থাগুলো যে বিপুল পরিমাণে সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করেছে, তার ফলে চীনের কয়েকটি অঞ্চলে অ্যাসিড বৃষ্টি প্রায় 'স্বাভাবিক' ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বৃষ্টির মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণে অম্ল চাষের জমিতে জমা হচ্ছে তার ফলে এখনই চীনের ৩০ শতাংশ জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত তিন বছরে এই ভয়াবহ সমস্যা সংকটের রূপ গ্রহণ করেছে।

জলের অপচয়

১৯৮০ সালে যখন চীনে পুরনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং বেসরকারিকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়, তখনকার তুলনায় আজকের চীনে শিল্প এবং গৃহস্থ ক্ষেত্রে জলের চাহিদা ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বিচারে শিল্পস্থাপন এবং বড় বড় উঁচু উঁচু বাড়ি নির্বিচারে জল তোলায় ভূগর্ভস্থ জলের ভাঁড়ার দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে— জলের হাহাকার বাড়ছে। এদিকে চীন প্রতিদিন প্রায় ৩৭০ কোটি টন তরল এবং আধা-তরল শিল্পবর্জ্য তৈরি করে, যার ৮০ শতাংশই পরিশোধিত না হয়ে নদী, জলাশয় বা হ্রদে স্রেফ ফেলে দেওয়া হয়। ফলে চীনে প্রবাহিত মুখ্য নদীগুলোর ৮৬ শতাংশ জল গৃহস্থ-ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

চীনের ৬ কোটি মানুষ সারাদিনের ব্যবহারের ন্যূনতম জলও পায়না— এদিক থেকে এই ৬ কোটি মানুষের দুর্দশা অব-সাহারা অঞ্চলের শুখা জায়গাগুলোর মতোই। চীনে উন্নয়নের এই মডেল চালু থাকলে ২০২০ সালেই চীনের ৩৫ শতাংশ চাষের জমি প্রায় এক শতাব্দীর জন্য চাষের অযোগ্য হয়ে পড়বে, দূষিত গ্যাস নির্গমন বাড়বে আজকের তুলনায় ৪০ শতাংশ এবং সালফার ডাই অক্সাইড নির্গমন বর্তমান সময়ের চেয়ে ১০০ শতাংশ বা তারও বেশি বেড়ে যাবে।

চীনের পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা অনেক দিক থেকেই এই ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে চীনের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু উন্নয়নের মায়া হরিণের পেছনে ছুটতে গিয়ে চীনের পরিবেশের অবস্থা আজ পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতো বা তার চেয়েও সাংঘাতিক আকার গ্রহণ করেছে। চীনের পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মত হলো, চীনের পরিবেশ ধ্বংসের বর্তমান হার প্রশমন করতে হলে চীনা সরকারের উচিত জিডিপি-র অন্তত ২ শতাংশ পরিবেশ রক্ষার

কাজে খরচ করা। আর, বর্তমান প্রবণতাকে বিপরীতমুখী করতে হলে জিডিপি-র আরও ১-২ শতাংশ বেশি ব্যয় করা দরকার হবে। কিন্তু চীনা সরকার ফি বছর অস্ত্র প্রস্তুত খাতে বাজেট বাড়াচ্ছে বিপুল হারে, কিন্তু পরিবেশ রক্ষার জন্য গত দু-দশক ধরে তারা জিডিপি-র মাত্র ০.৮৫ শতাংশ ব্যয় করছে। চীনে পরিবেশ রক্ষার খাতে ব্যয়ের সিংহভাগ সরবরাহ করে বিশ্বব্যাঙ্ক বা এশিয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক লগ্নিকারী সংস্থাগুলো, যাদের আবার যে দেশগুলো বেশি টাকা দেয় তাদের অ্যাজেন্ডা সুরক্ষিত করার দায় রয়েছে।

চীনে পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত নাগরিক সংগঠনগুলো স্থানীয় স্তরের বাইরে আঞ্চলিক বা রাজ্য স্তরের শাখা গড়তে পারে না— চীনা আইন তাদের এই অধিকার দেয়নি। সে দেশে দূষণ সৃষ্টিকারী সংস্থাগুলোর জরিমানার পরিমাণ এতই কম যে, দুর্বৃত্ত সংস্থাগুলো দূষণ-নিরোধক দামি যন্ত্রপাতির খরচা এড়িয়ে গিয়ে জরিমানা দেওয়া চালিয়ে যায়। চীনা আইনমতে তারা যেহেতু জরিমানা দিচ্ছে অতএব তাদের সাত খুন মাপ।

১৯৯৩ সালে সারা চীনের রাস্তায় মাত্র ৩৭ হাজার পেট্রোল-ডিজেল চালিত ব্যক্তিগত মালিকানার চার চাকার গাড়ি চলতো। ২০১২ সালে সেই সংখ্যাটা পৌঁছেছে সাড়ে তিন কোটিতে পৌঁছেছে। আগামী দশ বছরে তা ১৫ কোটিতে পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই বৃদ্ধি ঘটছে শহরগুলিতে। ফলে চীনের শহরগুলি ধোঁয়া-ধুলো-আবর্জনায় ভরে গেছে বলাই যায়। সারা পৃথিবীর ২০টি সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণযুক্ত শহরের ১৬টিই চীন দেশে অবস্থান করে।

তাদের সাবেকি ধরনের প্রোটিন ছেড়ে মার্কিনিদের অনুকরণে জীবন-যাপন করার তাড়নায় চীনের সুবিধাভোগী অল্প সংখ্যক মানুষ মার্কিন ধাঁচের খামার বানিয়ে মূলত মাংসাশী হতে চাইছে। চীনের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রোটিন ক্ষুধার শিকার হওয়া সত্ত্বেও এই অল্পসংখ্যক মানুষের এই খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ফলে কার্বন-ঘন খাদ্য উৎপাদনে চীন এখন এশিয়ার বৃহত্তম দেশে পরিণত হয়েছে।

চীনের উচ্চকোটির জনতার এই খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে পোয়া বারো ম্যাকডোনাল্ড-জাতীয় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর। তাদের জন্য গোমাংস সরবরাহের জন্য নির্বিচারে চারণভূমি ধ্বংস করা চলছে। উচ্চমানের উপরিস্তরের মাটি নষ্ট করা হচ্ছে। ফলে চীনে মরুভূমির বিস্তার বাড়ছে বিপজ্জনক হারে। মাংসজাতীয় দ্রব্যের এই বাড়তি উৎপাদনের প্রায় সবটাই ভোগ করে চীনের নব্য ধনী সম্প্রদায়। মাও-এর মৃত্যুর সামান্য কিছু বছর আগে, যখন কমিউন ব্যবস্থা জোরদার ছিল, তখন চীনের গ্রামাঞ্চল-শহরাঞ্চলে পরিবার পিছু কম-বেশি ৫ কেজি দুধ লাগত। গ্রামাঞ্চলের ধনীরা এখন ১১ কেজি আর শহরাঞ্চলের ধনীরা তার প্রায় দ্বিগুণ, ২০ কেজি, দুধ খায়। মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রেও পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে গ্রাম-শহরের ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

চীনের প্রকৃতি যত বেশি ধর্ষিত হচ্ছে দেশটির পরিবেশ অনাচারের বিরুদ্ধে তার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে, চীনের কর্তাব্যক্তিরা তত সংকটটিকে প্রযুক্তিগত সমস্যা ধরে নিয়ে প্রযুক্তিগত সমাধানের জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন। চীন দেশের উত্তরাংশ জল সংকটে বিপর্যস্ত, এই বিপর্যয়েরও মূল কারণ অপরিমিত দূষণ, লাগামহীন প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ এবং পরিবেশগত ক্ষয়। যে রাজনীতি-অর্থনীতি এই সমস্যার জন্য মূলত দায়ী, সে দিকে নজর না দিয়ে কর্তাব্যক্তিরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও বড় আকারের পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে আনছেন। চীনের উত্তরাংশের জল সংকট নিরসন করার জন্য রূপায়িত হচ্ছে 'উত্তর-দক্ষিণ চীন জলব্যবস্থা প্রকল্প', যেখানে বিরাট বিরাট বাঁধ, জলাধার, পাইপ লাইন ইত্যাদির মাধ্যমে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, গতি ও স্রোত রুদ্ধ করে, ক্ষেত্র বিশেষে স্রোত বিপরীতমুখী করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এভাবে ইয়াংসি নদীর ৪৪৮০ কোটি ঘনমিটার জল তুল নিয়ে পীত নদী এবং হুয়াই নদীতে চালানের এক বিপজ্জনক প্রকল্প চীন রূপায়ণ করছে। চীনের থ্রি-গর্জেস বাঁধ নিয়ে বিতর্ক তো সুবিদিত।

পশ্চিমী দুনিয়া যেমন তাদের দেশের আবর্জনা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চালান করে নিজেদের দেশের পরিবেশ দূষণ কমানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, চীন দেশটি সেইভাবে তাদের দূষণ মূলত ভিয়েতনাম ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিতে চালান করে দিচ্ছে।

ঘরের পাশের পড়শি

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের সব মহল্লায় সর্বক্ষণ পানীয় জলের সরবরাহ থাকে না। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ জলের ৯৭ শতাংশই আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত।

বাংলাদেশ সরকার এক সময়ে রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের উপর বিপুল পরিমাণে ভর্তুকি দিয়ে তা কৃষকের হাতে তুলে দেয়। এর ফলে কীটনাশক ও সারের অতিব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়েছে, অতিরিক্ত জল লাগে এমন চাষ করায় চাষের জলের যোগানে টান পড়ে চাষ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সারা পৃথিবীতে যত ভূ-উষ্ণায়ণ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়, তাতে বাংলাদেশের ভাগ মাত্র ০.২ শতাংশ। অথচ ভূ-উষ্ণায়ণের ফলে দেশটি ভয়াবহ হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে করা হচ্ছে যে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী বিরাট জায়গা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়বে। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সাগরবাঁধগুলিকে সুদৃঢ় করে ও নতুন বাঁধ নির্মাণ করে জায়গাগুলিকে হয়ত বাঁচানো যায়

সেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য সে দেশের নেই। আবার বাংলাদেশ বিশ্ব রাজনীতিতে এমন ভৌগোলিক অবস্থানে নেই যে তাকে বাঁচাতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির কোনো তাগিদ থাকবে। ফলে পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ শুধু আক্রান্ত নয়, সে দেশের এক বিরাট অঞ্চলের ভৌগোলিক অস্তিত্ব বিপন্ন।

এই আমাদের দেশ

এত কথার পর এইবার আমাদের দেশ এই ভারতের বিষয় নিয়ে কিছু বলা জরুরি। একটি এনডিএ সরকার এবং দুটি ইউপিএ সরকারের 'অভিভাবকত্ব' আমাদের দেশটিকে পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশি-বিদেশি পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে। জল-জঙ্গল-জমি-বাতাস আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য এবং জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই শতাব্দীর শুরুর থেকেই ভারত সরকার লাগাতার ভাবে বেসরকারিকরণের তাড়নায় একের পর এক পরিবেশ-বিধি লঙ্ঘন করছে।

কারখানার ভেতরে শ্রমিকের পেশাগত সুরক্ষা নেই-কারখানার অভ্যন্তর দূষিত। এর মাশুল গুনতে শ্রমিকরা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়। প্রতি বছর উৎপাদন ক্ষেত্রের শিল্পে বাড়ছে শিল্প দুর্ঘটনা, বাড়ছে শ্রমিকের মধ্যে পেশাগত রোগের পরিমাণ। কারখানার অভ্যন্তরের দূষণ কারখানার শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, সে পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়। কারখানার মালিক দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এই অবস্থায় কারখানার অভ্যন্তরের দূষণ বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, পরিবেশ দূষণের জন্ম হয়। কারখানার শ্রমিক আবার সামাজিক মানুষ হিসেবে পরিবেশ দূষণের শিকার হন। এই বিষময় চক্র চলে নিশ্চিন্তে। মানুষের জীবন আর জীবিকার ওপর অত্যাচার চালিয়ে মালিক মুনাফা করে— তেমনি একই অর্থনৈতিক মুনাফার তাড়নায় মালিক পরিবেশ বিপন্ন করে।

যে প্রাকৃতিক সম্পদ সমাজের যৌথ মালিকানায়, সেই প্রাকৃতিক সম্পদ যদি ব্যক্তি মালিকের সম্পদে পর্যবসিত করা যায় তবে সেই সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকের মুনাফা বাড়ায়। মালিকের কাছে শ্রমিকের শ্রমের মূল্য, উৎপন্ন সম্পদ মেরে দেওয়া যেমন মুনাফা, তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করাও মুনাফা।

এই সব আলোচনা নেহাতই তত্ত্ব কথা বলে মনে হলে আমাদের তথ্যের শরণাপন্ন হতে হবে। 'মাওবাদী' অধ্যুষিত এলাকা পালামৌ। বিড়লার কস্টিক কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি মান্ধাতার আমলের পারদ তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে রাসায়নিক উৎপন্ন করত এই সেদিন পর্যন্ত। ফলে আশপাশের মানুষ 'মিনি-মিনামাতা' দূষণের শিকার। জাপানের মিনামাতা মিথাইল-মার্কারির দূষণ উপকথায় পরিণত হয়েছে, কিন্তু দৈনিক ১৮ টাকা উপার্জনে সক্ষম ভালুয়া, দন্দিয়া খুর্দ গ্রামের ক্ষয়রোগগ্রস্ত মৃতপ্রায় মানুষদের দুর্দশা জানার জন্য মূলস্রোতের গণজ্ঞাপন সংস্থাগুলোর কোনও আগ্রহ নেই। বিড়লার এই কারখানাটি স্থানীয় ভালোয়া নদীটির এক বড় অংশ তার কারখানায় ঢুকিয়ে নিয়েছে। যে তিনটি গ্রাম নদীর এই অংশের পারে স্থাপিত হয়েছিল, তাদের বাসিন্দারা নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রথমে তারা নদীর ওপর অধিকার হারায়। তারপর একদিন নদীর ভাটার অংশে দূষণের ফলে মাছ মরতে থাকে। একদিন সেইসব ভাসমান মৃত মাছগুলোকে খাওয়ার জন্য কাক-চিল-পাখিদেরও পাওয়া যায় না। পারদ দূষণে একটা বিরাট অঞ্চলের পাখির দল পরপারে যাত্রা করেছে। এক সময় বিড়লার কারখানাকে শিল্পের কাজে জল ব্যবহার করার জন্য সরকারকে সেস দিতে হত। ভালোয়া নদীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে তোলার পর বিড়লা গোষ্ঠীর সেই জলের সেস দেওয়ার প্রয়োজন ফুরোয়—সেসের টাকা মুনাফায় পর্যবসিত হয়। ভারতের পরিবেশ আইন মতে কস্টিক সোডা-র মতো রাসায়নিকের বর্জ্য পদার্থ শুদ্ধিকরণ ছাড়া কারখানার বাইরে ফেলা নিষেধ। শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল। অতএব বিড়লা সংস্থা এই কারখানার তরল বর্জ্য শুদ্ধিকরণ ছাড়াই নির্বিচারে আশেপাশের কৃষিজমিতে ফেলে দেয়। কারখানা সংলগ্ন সাতটি গ্রামের চাষের জমির ৮০ শতাংশ দূষিত, তাতে ক্ষারের পরিমাণ এত বেশি যে জমিতে এক ফোঁটা সবুজ নেই!

'পশ্চাৎপদ' বিহারের এহেন দুর্দশা দেখে যাঁরা ভাবছেন যে ভারতের এই অবস্থা হলেও ঝকঝকে ইন্ডিয়ার অবস্থা এত করুণ নয়। ১০০ শতাংশ সাক্ষর মানুষের রাজ্য কেরালা। কীটনাশক এন্ডোসালফিন-এর প্রকোপে মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি, চাষের জমি ধ্বংস—এই সমস্ত সাংঘাতিক পরিবেশ দূষণের কবলে পড়ে কেরালা এখন খবরের শীর্ষে। বহুজাতিক 'সফ্ট ড্রিংকস'-এর প্রস্তুতকারক সংস্থা কোকোকোলা তাদের ব্যবহৃত কোকোকোলা-র বোতলজাত করা এবং অন্যান্য শিল্পের কাজে এত বিপুল পরিমাণে ভূমিজল উত্তোলন করছে যে কারখানার আশেপাশের প্রায় ৩ বর্গ কিমি অঞ্চলের মানুষ আর ভূগর্ভস্থ পানীয় জল পাচ্ছেন না। বলাই বাহুল্য, কোকোকোলা এই অন্যান্য জল ব্যবহারের জন্য জল-কর দেয়না। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির হালও খারাপ— স্থানীয় অঞ্চলের মাটি বসে যাচ্ছে, চাষের জন্য জলও অমিল।

রাজধানী দিল্লি ভ্রমণে গেলে বায়ু দূষণের জন্য সারা শীতকালে শহরের কাজকর্ম শুরু হতে হতে সকাল সাড়ে নটা। ভোরবেলা দুধের কাউন্টার থেকে দুধ আনতে যাওয়ার পথে কুশায়ার জন্য চলন্ত গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে পঙ্গু হওয়ার পরিমাণে সারা দেশের শীর্ষে দিল্লি, এমন গাড়ির দুর্ঘটনায় প্রতি ছটিতে দুজন মৃত্যুবরণ করেন। কুয়াশা বা ধোঁয়াশার মধ্যে মূল ভাসমান

কণা হল শহরের মধ্যে অবস্থিত ইন্দ্রপ্রস্থ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লার সূক্ষ্ম গুঁড়ো, বেআইনি সীসা কারখানার গুঁড়ো ইত্যাদি। দিল্লিতে প্রতি সপ্তাহে নতুন তিন হাজার গাড়ি রাস্তায় নামে, প্রতি কুড়ি দিনে একটি নতুন উড়াল পুলের পরিকল্পনা হয়, প্রতি মাসে দিল্লি শহর তার লাগোয়া গ্রামের সবুজ অঞ্চল ধ্বংস করে চওড়া রাস্তা, শপিং মল এবং বহুতল বাড়ি নির্মাণ করে। দিল্লি শহরের কেন্দ্রস্থলে সবচেয়ে গরিবেরা দৈনিক ৩০ টাকা রোজগার করে বেঁচে থাকে, আর দক্ষিণ দিল্লির গড়পড়তা বহুতল বাড়ির বাসিন্দা দৈনিক ৩০০ টাকা খাওয়া ছাড়া অন্যান্য বিনোদনে খরচ করে। একই বাড়িতে তিনটি গ্যারাজ, তিনটি গাড়ি এবং তিনটি টেলিভিশন আছে, মূল দিল্লি শহরে এমন ফ্ল্যাটের সংখ্যা, ডিডিএ-র সমীক্ষা অনুসারে প্রতি পাঁচটির একটি!

নয়ডা অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ অনিয়মিত, যমুনা নদী সর্ববৃহৎ জীবন্ত এবং চলমান নর্দমা। জলবাহিত রোগে পুরো উত্তর ভারতের মধ্যে দিল্লি শীর্ষে। দিল্লির ভাট্টি মাইনস অঞ্চলে পাহাড়ের শিরা অন্তর্হিত, গড় মুক্তেশ্বর বাঁধ দূষিত। সর্বত্র সবুজ লোপাট, কুশ্রী ধরনের চিহ্ন নিয়ে হতপ্রায় শ্রীহীন প্রাণহীন কংক্রিটের জঙ্গলে আধুনিকতা বাঁধানো দাঁতের ঝলকানিতে দেদীপ্যমান।

চেন্নাই শহরের স্টেশনের বাইরে এলেই নাকে রুমাল চাপা দিতে হবে। শহরের যাবতীয় তরল এবং কঠিন আবর্জনা ঘোলা এক বিরাট নালা দিয়ে প্রবাহমান। সাগর যে শহরের প্রান্ত ছুঁয়ে আছড়ে পড়ছে, দূষণের কবলে পড়ে সেই শহরটা কুকুরের মতো জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। জল দূষণ এত সাংঘাতিক যে হোটেলে জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে হোটেলের মালিকের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না— কেননা জল আপনি নিজ দায়িত্বে খেয়েছেন! রাস্তা সরু, বাতাস ভারি সীসার গুঁড়োয়।

স্বাস্থ্যকর ভ্রমণের স্থান রাণিক্ষেত-আলমোড়া। বেহিসাবি বাগিচা চাষ ধ্বস নামাচ্ছে, জলসম্পদ নষ্ট করছে। বাইরে থেকে আসা গাছের চাষের ফলে বাতাস ফুসফুসের পক্ষে বিপজ্জনক পরাগরেণু সম্পৃক্ত, যা মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। আদি বাসিন্দারা হৃদয়ে ক্ষত নিয়ে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের আশঙ্কায় কালানিপাত করছেন।

নর্মদা নদীর প্রায় প্রতি কিলোমিটার জুড়ে কিছু না কিছু নির্মাণ কার্য চলছে, তাল মিলিয়ে চলছে উচ্ছেদ। সুরাটের হোটেলের ফোয়ারার জন্য জলের জোগান দিতে, প্যাটেল পরিবারের খেতিতে জল দিতে দফায় দফায় সরদার সরোবর বাঁধের উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে। প্রতি মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে গড়ে ৫০০ পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যায়, গড়ে ১০০ একর চাষযোগ্য জমি জলমগ্ন হয়। তথাকথিত পুনর্বাসনের নামে কয়েকশো হেক্টর করে বনাঞ্চলকে বসতি বানানোর কাজে ব্যবহারের 'ছাড়পত্র' দেওয়া হয়।

কুদানকুলম-এ আন্দোলনরত মানুষদের ওপর অত্যাচারের ছবি এখন ইন্টারনেটের সৌজন্যে শিক্ষিত মানুষের আওতায়। পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের দূষণ নিয়ে এত কথা হয়েছে যে তা আবার বলতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখতে হয়। তবে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে বিশ্বব্যাঙ্কের পেনশনভোগী ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিবর্তে ব্যক্তি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ পরমাণু মন্ত্রকের চেয়ারম্যান সাহেব যতই গলার শির ফুলিয়ে ভারতের পরমাণু গবেষণা ও পরমাণু কেন্দ্রগুলোর সুরক্ষা নিয়ে উন্মত্ত চিৎকার করুন না কেন, সরকারি হিসেব মতেই ভারতে প্রতি মাসে প্রায় দুটি করে পরমাণু-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ঘটছে। তা সে তেজস্ক্রিয় জল মানুষ খেয়ে ফেলছে থেকে শুরু করে তেজস্ক্রিয় গ্যাস লিক, যাই হোক না কেন।

বঙ্গ আমার, জননী আমার

সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা পশ্চিমবাংলা কি মরুভূমির মাঝে স্নিগ্ধ ছায়া-ভরা মরূদ্যান? না, পশ্চিমবাংলার হাল-হকিকৎ আরো চমৎকার!

দূষণের দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমবাংলা সারা ভারতের শীর্ষে। এই তালিকার পরবর্তী স্থানগুলিতে রয়েছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ু। দূষণের দিক থেকে সবচেয়ে বিপজ্জনক শিল্পগুলিকে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ লাল-শ্রেণীভুক্ত শিল্প বলে চিহ্নিত করে থাকে। সারা দেশে যতগুলি এই লাল-পর্যায়ভুক্ত শিল্প রয়েছে, তার সবচেয়ে বেশি অংশ আছে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ এদেরকে বিশেষ সুনজরে দেখে থাকেন। এই রাজ্যের ৪৩টি শিল্পগুচ্ছকে সংকট-সৃষ্টিকারী গুচ্ছ বলে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ মনে করে।

অভিনেতা তৃণমূল সাংসদ শ্রী তাপস পালের এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে লোকসভার ১৪ মে, ২০১২-তে যে জবাব পাওয়া গেছে তার নির্যাস খানিকটা এইরকম : এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ ৫৬টি স্পঞ্জ আয়রন সংস্থাকে শিল্প গড়ার ছাড়পত্র দিয়েছে। এর মধ্যে বর্ধমান জেলায় এক গুচ্ছে ২৬টি, পুরুলিয়ায় ১৪টি, বাঁকুড়ায় ১১টি এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৫টি। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে দূষণ প্রতিরোধকারী সব কটি ব্যবস্থা চালু অবস্থায় না থাকলে কোনও স্পঞ্জ আয়রন কারখানাকে দূষণ-ছাড়পত্র না দেওয়া। ছাড়পত্র দেওয়ার দলিলে পর্যদ কী মন্তব্য করেছে শুনে নিন : "Full proof Air Pollution Control (APC) and abatement system for such units are yet to be arrived at. The major sources of emission from the industry are Rotary Kiln.... And large amount of solid waste in the form of charcoal poses a serious disposal problems"। সংক্ষেপে বলতে গেলে, দূষণ পর্যদের মতে এইসব শিল্প সংস্থার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ

সংক্রান্ত পদ্ধতি চালু নেই। বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা গুরুতর সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এতসব জানা সত্ত্বেও এইসব শিল্প সংস্থাকে পর্ষদ ছাড়পত্র দিয়েছে। এর মূল কারণ কি এটাই যে এইসব সংস্থার কাছ থেকে যে সামান্য জমিমানার টাকা পর্ষদের হাতে আসে, সেটাই পর্ষদের বিভিন্ন মোচ্ছবে ব্যবহার করার মূল উৎস! অতীতে এইসব স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় দূষণের অভিযোগের খবরে উত্ত্যক্ত হয়ে পর্ষদের পরিদর্শক দল যখন ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে দূষণ পরিদর্শনে (নাকি ভ্রমণ বলাই বেশি সঠিক?) হাজির হন, তখন দেখা যায় যে পরিদর্শক দল দূষণের দায়ে অভিযুক্ত সংস্থার দেওয়া গাড়ি করে কারখানায় হাজির হয়। তাদের ব্যবস্থা করা 'লাঞ্চ প্যাকেট' ভক্ষণ করে, অভিযোগকারী স্থানীয় বাসিন্দাদের হুমকি দিয়ে কোম্পানির গাড়ি চড়ে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে হাজির হন। গ্রামবাসীরা এতে দমে না গিয়ে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললে আন্দোলনের নেতাদের 'মাওবাদী' আখ্যা দিয়ে, মিথ্যে মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। বলা বাহুল্য খুন, রাহাজানি, অগ্নিসংযোগ, নারী-ধর্ষণ প্রভৃতি অভিযোগ আনা সত্ত্বেও পুলিশ শেষ পর্যন্ত এইসব আন্দোলনকারীদের আজও চার্জশিট দিতে পারেনি। প্রমাণ বা সাক্ষী কোনটাই পুলিশের হাতে নেই।

এই অন্যায্য গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে, কলকাতা শহরে স্মারকলিপি প্রদানের মতো আইনি জমায়েতকে 'চক্রান্ত' আখ্যা দিয়ে জমায়েতের অন্যতম সংগঠককে পুলিশ জমায়েতের প্রায় একমাস পর অন্য একটি প্রকাশ্য সভা থেকে গ্রেপ্তার করে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এবার এই প্রতিবাদী ব্যক্তিটিকে কিন্তু 'দেশদ্রোহ'-র ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। দূষণ, বিশ্বায়ন এবং পুঁজির অশুভ যোগাযোগের বৃত্তটি প্রতিষ্ঠিত হলো।

অনেকে বলতে পারেন, এইসব ঘটনা 'পরিবর্তন'-এর আগের জমানার বিষয়, 'পরিবর্তিত' পরিস্থিতিতে আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে। একথা তো ভুললে চলবে না যে বামফ্রন্ট সরকার সাময়িকভাবে হলেও ১১টি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ছাড়পত্র বাতিল করেছিল, অন্যদের নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে জরিমানা করত। কিন্তু 'পরিবর্তিত' সরকার এসে ছাড়পত্র বাতিল তো দূর অস্ত্, জরিমানাও প্রায় তুলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ ট্রাইবুনাল, যার শীর্ষে রয়েছেন হাইকোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি, রেশমি সিমেন্ট ইউনিট নামের একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা বন্ধ করার যখন সুপারিশ করে, তখন এই 'পরিবর্তন'-এর সরকার সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও সেই তালে পা মেলায়। মা-মাটি-মানুষের সরকারের পরিবেশমন্ত্রী শ্রী সুদর্শন ঘোষ দস্তিদারের খোদ দপ্তর— পরিবেশ। সেই পরিবেশ দপ্তরের নিজস্ব সরকারি ওয়েবসাইট এই স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ নিয়ে কী বলছে শোনা যাক : "The damage created by a single SIV (Sponge Iron Unit) per annum on ecological constituents was financially calculated as : Agriculture : Rs. 1,09,23,300.00, Cattle : Rs. 3,89,18,125.00 and Human Health : Rs. 5,20,83,325.00"। ৫৬টি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার সম্মিলিত প্রভাব হিসেব কষতে গেলে যে গাণিতিক রাশিটি উৎপন্ন হবে, তা স্পষ্টতই বিরাট, জ্যোতির্বিজ্ঞানের রাশির সঙ্গে কেবল তা তুলনীয় হতে পারে।

দূষণ পর্ষদের ভূমিকা আরও অনেক দিক থেকে গণস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। মোবাইল টাওয়ার নিয়ে প্রায় প্রতিদিন পর্ষদের দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়ছে, অথচ স্থানীয় অঞ্চল পরিদর্শন করে অবস্থার সরেজমিনে তদন্তের বিষয়ে পর্ষদের অনীহা প্রবল। একটি আপিলের শুনানি মাঝে মধ্যে বসে, কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষের দুর্গতি নয়, মোবাইল সংস্থার তথাকথিত ইঞ্জিনিয়ারদের দেওয়া তথ্যই পর্ষদের কর্তাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পায়। পর্ষদের মতে মোবাইল টাওয়ার সংক্রান্ত দূষণ আটকানোর বিষয়টি তাদের এক্তিয়ারে নেই, তারা কেবলমাত্র বায়ুদূষণ এবং জলদূষণ নিয়ে কিছু করতে পারে। বনগাঁ, বালি, বাঘাযতীন, ব্রেসব্রীজ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যখন মোবাইল টাওয়ার থেকে বায়ু দূষণ বা বেআইনি জেনারেটরের অভিযোগ ওঠে, তখন পর্ষদ তার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করে না। কালীপূজোর রাতে পর্ষদের নিজস্ব দপ্তরের বাড়ির উল্টো দিকে শাসক দলের উঠতি নেতার পুজোতে দেদার শব্দবাজি ফাটে, আর পর্ষদের কর্তারা বিবৃতি দেন আগের তুলনায় অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

'টু-স্ট্রোক অটোরিক্সা' নিয়ে এবং ১৫ বছরের পুরনো যানবাহন নিয়ে যে নাটক গত ক'বছর চলে আসছে, বর্তমানে তা শেষাংকে পৌঁছেছে বলে অনুমান। 'কাটা' তেল-এ অটো চলা এবং দূষণ নিয়ে কিছু বলা নিষেধ— কেননা তেণ্ডুলকারের নাটকের প্রতিধ্বনিতে শোনা যায়, চোপ, এখন গণতন্ত্র চলছে। ২০০৭ সালে যেখানে ৪৫২৬টি পাবলিক বাস চলত, বর্তমানে তার তিনভাগের একভাগ চলে। ২০০৭ সালে প্রতি এক লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ৮টি সরকারি বাস চলত, এখন তিন লক্ষ মানুষ পিছু ৮টি বাস। ২০০৬-০৭ সালে এই কলকাতা শহরের বায়ুতে ভাসমান কণার পরিমাণ ছিল ঘনমিটার পিছু ৩৬ মাইক্রোগ্রাম (দিল্লির চেয়ে বেশি), বর্তমানে তা বেড়ে গেছে আরও অনেকখানি।

এই ঘটনার সঙ্গে আমরা পরিচিত যে কারখানার শ্রমিক মালিকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব, মানুষ সরকারের কাজে বিপন্ন হয়ে মন্ত্রীসভার কাছে স্মারকলিপি জমা দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যটি এমনই এক রাজ্য যেখানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দ্বারা দূষণ সৃষ্টির জন্য নাগরিকরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদেরই বিরুদ্ধে

সাংবাদিক সম্মেলন ক'রে নাগরিক 'চার্জশিট' পেশ করছে! এই 'সবুজ চার্জশিট'-এ প্রধান চারটি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পর্ষদ তার নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ, দুর্নীতির আখড়া, একটি নিষ্ক্রিয় সংস্থা, নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে তারা বৈজ্ঞানিক তথ্যে কারচুপি করে।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানা নিয়ে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে নাগরিকদের মাঝে-মধ্যে পর্ষদ অনেক তথ্য দেয়। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে পর্ষদের থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে পর্ষদ নতুন করে (পরিবর্তনের পর) গঠিত হওয়ার পর কোনও পদক্ষেপ তো নেয়ই নি, উল্টে মালিকদের বিরুদ্ধে আগের পর্ষদের নেওয়া পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। যে শব্দ দূষণের প্রতিরোধে কড়া আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রয়েছে, পর্ষদ সেই আইন প্রয়োগ করে না। চাপে পড়ে (শব্দ বাজির ক্ষেত্রে অন্তত পুলিশ প্রয়োজনীয়) পদক্ষেপ নিলে, আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় অভিযোগটি করা থেকে পর্ষদ বিরত থাকে।

নিজেদের কর্তব্য না করে পর্ষদ রাজ্য জুড়ে চলমান হুল্লোড়বাজী আর হুজুগে গা ভাসিয়েছে। শহরের সৌন্দর্যায়নের দায়িত্ব দেশের সংবিধান দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হাতে তুলে দেয়নি— এই খাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কোনও অর্থ ব্যয় করতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি পর্ষদ ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রবীন্দ্র সরোবরে একটি লেসার আলোর খেলা যুক্ত ফোয়ারা তৈরি করেছে। আলোর তীব্রতা বাড়ায় পাখি, মাছ এবং ভ্রমণকারীদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এবং শহরের মধ্যে সবুজের ছোঁয়া ধূসর হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণের পরিবর্তে পর্ষদের এই খামখেয়ালিপনার মাশুল দিচ্ছে প্রকৃতি আর মানুষ। ত্রিফলা আলো নিয়েও একই কথা প্রযোজ্য। ত্রিফলা আলোর জন্য কোনও পরিবেশ দূষণের অভিযোগ পর্ষদ গ্রহণই করে না, যদি করে তবে যে সমস্ত পৌর প্রতিনিধি এই আলো বসানোর উৎসাহী কুশীলব, অভিযোগকারীকে সেই পৌরপ্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করার 'সুপরামর্শ' দিয়ে দায়িত্ব সেরে ফেলে!

নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে দুর্নীতির সম্পর্ক শীতের পরে বসন্তের আগমনের মতো স্বাভাবিক ঘটনা। বিভিন্ন রংয়ের বিভিন্ন জাতের 'পরিবর্তনকামী'দের দাক্ষিণ্য বিতরণের আতিশয্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে 'পরামর্শদাতা' নিয়োগ অব্যাহত। বলাই বাহুল্য, এমন অনেক 'পরামর্শদাতা'-র নিয়োগ বেআইনি, দুর্নীতিতে ভরপুর। বর্তমানের 'পরিবর্তিত' পর্ষদে জনৈক 'পরামর্শদাতা' নিযুক্ত হয়েছেন ২১/১০/২০১২। তথ্যের আইনে জানতে চাওয়া একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গেছে যে ঐ 'পরামর্শদাতা' ভদ্রলোকটি ২১/১০/২০১২ থেকে ৩১/১২/২০১২ সময়-সীমায় মোট ৬৯ হাজার টাকা 'পরামর্শ'-এর জন্য পেয়েছেন। এছাড়া পর্ষদ তাঁর যাতায়াতের জন্য ২৪ ঘণ্টার ভিত্তিতে গাড়ি সরবরাহ করেছে। আরও আছে। দূষণ মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়ার কমিটিতে যে বিশেষজ্ঞ সদস্য, সেই সদস্যই আবার সেই বিষয়ে দূষণের আবেদন জমা পড়লে তার আপিল সংক্রান্ত আধা-আইনি সংস্থার বিশেষজ্ঞ সদস্য!

হলদিয়াতে দূষণের প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে ২০১১-র শুরুর থেকে নতুন করে শিল্প স্থাপনের ওপর কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ হলদিয়াতে সমীক্ষা করে জানায়, সেই অঞ্চলে দূষণ কমতির দিকে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া এই ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে, রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত ২০১১-এর শেষে হলদিয়াতে শিল্প-স্থাপন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আংশিক প্রত্যাহার করে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু যদি কেউ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সরবরাহ করা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য দেখেন, যা কিনা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে, তবে তিনি শিহরিত হয়ে দেখবেন যে হলদিয়াতে দূষণ আসলে বাড়তির দিকে, কমতির দিকে নয়! এককের কারচুপিতে এই কাণ্ডটি পর্ষদ ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটিয়েছেন বলে ভুক্তভোগী মানুষদের ধারণা।

পশ্চিমবঙ্গে 'প্রমোটার রাজ' নিয়ে সরকারের বিভ্রান্তি থাকলেও পাড়ায় পাড়ায় সিন্ডিকেট দাদাদের প্রকাশ্যে ঘুরতে দেখে এই বিষয়ে মানুষের ধারণা একটু অন্যরকম। জলাভূমি ভরাট, সাধারণের ব্যবহারের জায়গা দখল, বেআইনি নির্মাণ, বেআইনি ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন ইত্যাদি পরিবেশ ধ্বংসের যাবতীয় আয়োজন সাড়ম্বড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 'পরিবর্তন'-কে যাঁরা 'সিরিয়াসলি' নিয়েছিলেন, মানুষের ভালো করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তৃণমূল দলটির হয়ে কাজ করছেন, এখন তাঁরা দলের কাছে বিড়ম্বনা, বোঝা। প্রোমোটার বিরোধিতার মাশুল তারা গুণছেন। যাঁরা পুকুর ভরাটের মতো বেআইনি কাজের বিরোধিতায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দ্বারস্থ হলে তাঁদের 'সসম্মানে' বিদায় দেওয়া হচ্ছে। ১০৮ নং ওয়ার্ডে একটি ১০ একরের জলাশয় মানুষের চোখের সামনে ভরাট হচ্ছে দেখতে পেয়ে স্থানীয় মানুষরা পর্ষদে অভিযোগ জানান। এলাকাটি পর্ষদের পদক্ষেপ নেওয়ার এক্তিয়ারভুক্ত। পর্ষদ যথারীতি তখন সৌন্দর্যায়ন বা অনুরূপ অকাজে ব্যস্ত থাকায় কুম্ভকর্ণ-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পরিবেশ রক্ষার কয়েকটি সংগঠন একজোট হয়ে প্রচার চালায় এবং এক সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানায়। শেষ পর্যন্ত 'দূষণ পর্ষদের' হস্তক্ষেপ নয়, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পুকুর বোজানো সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

তপন দত্তর মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন

হাওড়া জেলায় ডোমজুড় ব্লক-র তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট-এর নাম ছিলো শ্রী তপন দত্ত। তিনি জলাভূমি ভরাট প্রতিরোধে একটি নাগরিক কমিটি গঠন করে বালি-জগাছা অঞ্চলের একটি শিল্প সংস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। এতে অবশ্যই তাঁর পার্টির নেতাদের সায় ছিল না। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদও তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু প্রোমোটার-মাফিয়ারা দত্ত-র বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যায়। দত্ত-র আন্দোলন পরিচিতি লাভ করলে ২০১১-র মে মাসে একদিন দত্ত যখন স্থানীয় থানা থেকে সাপুইপাড়ায় তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন, তখন জগাছার ঘোষপাড়ার রেলওয়ে লেভেলক্রশিং-এর সামনে একদল 'অপরিচিত দুষ্কৃতিকারী' তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এই নেতাকে কয়েক হাত দূরত্ব থেকে ৭টি গুলি ছোঁড়া হয়। সে বছর জলাভূমি দিবসে (১৬ই জুন ২০১১, নতুন 'পরিবর্তন' ঘটে গেছে) নিক্কো পার্কে যে হই-হল্লা হয় তাতে মন্ত্রী-শান্ত্রী-সভাসদ এবং 'পরিবেশবাদী'দের নক্ষত্র-খচিত সমাবেশে স্বাভাবিক কারণেই জলাভূমি বাঁচানোর শহীদ তপন দত্ত-র নাম কারুর একবারও মনে পড়েনি।

বালি-জগাছা অঞ্চলে জল জমার সমস্যা সংকটে রূপান্তরিত হলে সেখানে পরিবেশ বিপর্যয়ের শুরু হয়। তপন দত্ত এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানাতে পারেন যে আনমল, ডিএলএফ ইত্যাদির মতো জমি ডাকাত এবং জমি মাফিয়ারা ঐ অঞ্চল সংলগ্ন ৭৫০ একরের একটি জলাভূমি বেআইনিভাবে ভরাট করছে। ঐ ভরাট করা জলাভূমি অঞ্চলে ভূতপূর্ব রেলমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর শ্রী দীনেশ ত্রিবেদী এবং শ্রী মুকুল রায়-এর তত্ত্বাবধানে একটি রেলওয়ে কোচ তৈরির কারখানা নির্মাণের প্রকল্প ঘোষিত হয়। জলাভূমি ভরাটের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে নিকাশী নর্দমাও বন্ধ হয়ে গেছে, খালের এক অংশও ভরাট হয়েছে।

এই অনাচার থেকে মুক্তির জন্য তপন দত্ত "বালি-জগাছা জলাভূমি বাঁচাও কমিটি" গড়ে তোলেন, আবেদন নিবেদনের পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্ট-এ একটি মামলাও দায়ের করেন। মামলাটি যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ মনে করে হাইকোর্ট জলাভূমি ভরাট করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু কোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে জলাভূমি ভরাটের কাজ চলতেই থাকে। তপন সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। পরবর্তীকালে তপন-এর স্ত্রী কয়েকজন প্রভাবশালী শাসকদলের নেতা ও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে খুন প্ররোচনা দেওয়া সংক্রান্ত এফআইআর দায়ের করেন। পুলিশ সম্প্রতি শাসক দলের কয়েকজন নেতাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। জনৈক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে। কিন্তু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে না পুলিশ না শাসক দল, কেউই কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

পরিবেশ-সুরক্ষা বজায় রাখার প্রতিবাদ করলে মৃত্যুর মিছিলে তপন একা নন। দীপক দাস শব্দ-বাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। পরিবার কেস করলে, পুলিশ কেস (নং ৪০৩, ৩১.৪.৯৭) করে, দুজন অপরাধী ধরা পড়ে, কিন্তু কীভাবে জানা নেই আজও তারা মুক্ত।

তপন দত্ত হত্যা মামলায় যদিও বেশ কিছু নেতৃত্বস্থানীয় তৃণমূলী নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং একজন ক্ষমতাশালী মন্ত্রীর নাম এই হত্যা মমালায় জড়িয়ে গেছে, কিন্তু যে দুজন সিআইডি অফিসার এই মামলার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করছিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের বদলি করে দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হওয়ার ঘটনা সারা পৃথিবী জুড়েই ঘটছে। আমাদের দেশ ভারত বা আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে কোনও ব্যতিক্রম নয়। নর্মদা বাঁধের কাজ থামাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আদিবাসী নিহত হয়েছেন, গোয়াতে দ্যুঁপঁ-র নাইলন ফ্যাক্টরির দূষণের প্রতিবাদ মিছিলে গুলি চললে নীলেশ নিহত হন, উত্তরবঙ্গে সুন্দর ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের ডবল সুপার ফসফেট সার কারখানার দূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় যুবক শহিদ হন। সাম্প্রতিক নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনে নারী-শিশু-বৃদ্ধ থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থার অধ্যাপক— গ্রেপ্তার-অত্যাচারের হাত থেকে কেউই রেহাই পাননি। নয়াচরের প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাব কত জনকে যে বিব্রত, বিপন্ন করেছে, ইতিহাসের পাতায় আর কদিন পরে এরা সবাই গভীর বিস্মৃতির অতলে ডুব দেবে।

বিশ্বায়ন আর তার কৃৎকৌশল মানুষকে অল্প কটা করপোরেশন আর তাদের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ঠাণ্ডা ঘরে অবস্থানকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিপক্ষে সরাসরি দাঁড় করিয়েছে। সীমান্তবর্তী মানুষের ওপর আক্রমণ তাই পরিবেশের ওপর আক্রমণে রূপ নিচ্ছে। আবার পরিবেশের ওপর আক্রমণ রূপ নিচ্ছে সরাসরি রুটি-রুজি কাড়ার আক্রমণে। এই কথা বুঝেছেন কলিঙ্গনগরের, নর্মদা-পাড়ের, নোনাডাঙ্গার বাসিন্দারা। উপোসি ভারত লড়াই করছে আগ্রাসী ইন্ডিয়ার সঙ্গে, যাদের গাঁটছড়া বাঁধা দ্যুঁপঁ, ড্যানিয়েল আর্চার, ম্যাকডোনাল্ড ইত্যাদি দুর্বৃত্ত সংস্থার সঙ্গে।

একবিংশ শতাব্দীতে হয়ত আমরা এক নতুন শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং তার নিরসনের রাস্তা, নতুন পদক্ষেপের এক রূপরেখা দেখতে পাবো।

আক্রান্ত স্বদেশ : আক্রান্ত জনস্বাস্থ্য

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

নাগরিক কবিয়াল বা গানওয়ালা গেয়েছেন—

"মঙ্গলগ্রহে জরিপ চলছে খুব
সেখানে শুনছি ঘর বাড়ি তোলা হবে,
জল্পনা ছোটে পশ্চিম থেকে পূব
গ্রাম থেকে গ্রামে ডাক্তার যাবে কবে?"

আমাদের ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ৬৫টি বসন্ত কাটিয়েও বেহাল জনস্বাস্থ্যে বিশ্বে অগ্রগণ্য। একদিকে তৃতীয় বিশ্বের এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বেরও বহু দেশ থেকে মধ্যবিত্ত রোগীরা এদেশে ছুটে আসছেন সুলভে উন্নতমানের চিকিৎসার সন্ধানে। ব্রিচ ক্যান্ডি, লীলাবতী, এসকর্ট, অ্যাপেলো বা ফোর্টিস হাসপাতালে হাঁটু পাল্টে, ছানি কাটিয়ে, হৃদয়ের অস্ত্রোপচার করিয়ে, স্থূলতা মুক্ত হয়ে, ইন্দ্রলুপ্তের উপর কচি দূর্বাদলশ্যাম চুল গজিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ফেরার আগে দর্শন করছেন তুষারমৌলী হিমালয়, সুন্দরবনের গহীন অরণ্য, রাজস্থানের অভিজাত সৌন্দর্য্য অথবা কালের কপোলতলে 'এক বিন্দু নয়নের জলে'র মত তাজমহল। আর অন্যদিকে প্রতিবছর দশলক্ষ শিশুর অন্তিম নিঃশ্বাস মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। পঞ্চাশ হাজার প্রসূতি মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে ঢলে পড়ছেন চিরনিদ্রায়। সাধারণ নানা সংক্রামক ব্যাধি— বহুকাল আগেই যাদের প্রতিষেধক বা জীবাণুনাশক আবিষ্কৃত হয়ে গেছে— সেইসব রোগে পোকামাকড়ের মতো মারা পড়ছেন সাধারণ মানুষ। প্রতি একশ জন আসন্ন-প্রসবার মধ্যে ৫৮ জন এবং তিন বছরের নীচে শিশুর মধ্যে ৬৮ জন মাঝারি থেকে দারুণ অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতার শিকার। সুষম খাদ্য নেই, নিরাপদ পানীয় জল নেই, শৌচালয় নেই, নিকাশি ব্যবস্থা নেই, নেই জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা বা শিক্ষা। মাঝে মাঝে মনে হয় ভারতবর্ষ এক বিশাল প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ— যার মাথাটা রয়েছে একবিংশ শতাব্দীতে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে চন্দ্রাভিযান, হাস্যমুখর বুদ্ধের নামে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভেটো প্রয়োগের অধিকার সম্বলিত স্থায়ী সদস্য পদ লাভে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতিস্পর্ধা, দূরসঞ্চার শিল্পে Numero Uno হবার অভীপ্সা। আর অন্যদিকে সেই সরীসৃপের দেহ বা পুচ্ছ পড়ে আছে অষ্টাদশ শতকের গাঢ় অন্ধকারে। চূড়ান্ত দারিদ্র্য, সীমাহীন অস্বাস্থ্য, অতলান্তিক অজ্ঞতার জগতে। ডা: বিনায়ক সেন বিভিন্ন বক্তৃতায় বারে বারে বলেছেন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়বরাদ্দের বিপুল ঘাটতির পাশাপাশি প্রবল অসাম্য (inequality)-র কথা। যোজনা কমিশন নিযুক্ত ডা: কে শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বাধীন উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি (HLEG) তাদের পর্যবেক্ষণে বারবার উল্লেখ করেছেন এই অসাম্যের কথা এবং তার ভয়ঙ্কর অভিঘাত এক কথায় বললে এদেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। ভাবতে অবাক লাগে, যে গণতন্ত্র তার সন্তানদের সাধারণ রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারে না— সে কিভাবে কমনওয়েলথ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা ফর্মুলা এক রেসিং কার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে? একদিকে ধনীর স্বাস্থ্য রক্ষার ও চিকিৎসার বিপুল আয়োজনে প্রোজ্জ্বল সাইনিং ইন্ডিয়া। অন্যদিকে গভীর অবসাদময় অন্ধকার ভারত। দেশ ভাগ হয়ে গেছে এই দুটি আনুভূমিক খণ্ডে।

'উন্নয়ন'-উচ্ছেদ ও জনস্বাস্থ্য

কিছু স্মৃতি রোমন্থন করা যাক। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখে সংহতি কমিটির ডাকে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের তরফে আমরা প্রথম সিঙ্গুর যাই। সেখানে বাজেমেলিয়া গ্রামে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। তখন টাটার ন্যানো কারখানার জন্য ৯৯৭ একর কৃষিজমি দখলের ফরমান জারি হয়ে গেছে। আতঙ্কে কাঁপছেন গ্রামবাসীরা, আবার প্রতিরোধের জন্য যূথবদ্ধ হচ্ছেন। বাজেমেলিয়া গ্রামের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ অত্যন্ত উর্বর তিন/চার ফসলি জমি পড়েছে ঐ 'অভিশপ্ত' ৯৯৭ একরের মধ্যে। গ্রামে এমন কোন পরিবার নেই, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অনেকগুলি পরিবারের বাস্তুজমিতেও হাত পড়তে চলেছে, প্রতিবাদে সামিল হয়ে ইতোমধ্যেই পুলিশের হাতে অকথ্য মার খেয়েছেন শিশু, মহিলা সহ বহু মানুষ। এর পরে ঘটবে ২০শে ডিসেম্বরের ঘটনা। সরকারি নির্দেশে পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কৃষকের রক্তে সিঙ্গুরের মাটিকে লাল ক'রে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ' সেই সোনার মাটিকে।

যাই হোক, ১৯শে অক্টোবর ওখানে ১০৩ জন রোগীকে আমরা দেখি। যেটা উল্লেখ করার, তা হল এদের মধ্যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ মানসিক উত্তেজনা, অবসাদ অনিদ্রা, ভীতি (phobia) বা অন্যান্য মানসিক উপসর্গের শিকার। প্রায় প্রত্যেকেই বললেন, এই সব উপসর্গ শুরু হয়েছে টাটাদের দখলদারির ঘটনা শুরু হবার পর। শতকরা পায় ৩৭ জন রোগী উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন এবং তাদের এই অসুখও বহুলাংশে জমি অধিগ্রহণের সাথে যুক্ত। পেপটিক আলসার সিনড্রোম, বুক ধড়ফড় করা, দুর্বলতা, মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব, মাথাঘোরা বা চোখে অন্ধকার দেখা প্রভৃতি নানাধরনের somatization-এর লক্ষণ এদের অনেকেরই ছিল। যুদ্ধ,

প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ধরনের মানসিক বৈকল্য (stress disorders) দেখা দেয়, তার অনেকগুলিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে। পরে আরও দু'বার সিঙ্গুরে গেছি স্বাস্থ্য শিবির করতে। অঞ্চলের পরিস্থিতির যত অবনতি হয়েছে, সরকারের আচরণে মানুষের মধ্যে যত অনিশ্চয়তা ও হতাশা বেড়েছে— তার সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই ধরনের নানা সমস্যা।

একটা সুখী স্বচ্ছল সমাজ— যাদের অন্তত মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা ছিল— তাঁদের রাতারাতি যদি উন্নয়নের নামে, প্রগতির নামে বা শিল্পায়নের নামে জীবিকা ও বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করার আয়োজন পাকা করে ফেলা হয়, তবে সেই জনগোষ্ঠীর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য কী দাঁড়ায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সিঙ্গুর। জমি অধিগ্রহণ, কারখানাও না হওয়া এবং জমিও না ফেরত পাওয়া— এই চক্রে বাজেমেলিয়া, খাসের ভেড়ি বা বেড়াবেড়ির ঘরে ঘরে আজ তীব্র অনটন, অনাহার ও অপুষ্টি। ঐখানে শিশু ও কিশোর কিশোরীদের মধ্যে পুষ্টি সংক্রান্ত সমীক্ষা চালালে যে লেখচিত্র পাওয়া যাবে, তাতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। সম্ভবত একই চিত্র পাওয়া যাবে ভারতবর্ষের আরও প্রায় ২৫০টি চালু হওয়া প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ)-এর উচ্ছেদ হওয়া বা উচ্ছেদের মুখোমুখি দাঁড়ানো হাজার হাজার কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর, ক্ষুদ্র হস্তশিল্পী, ছোট বা মাঝারি ব্যবসায়ী, দোকানদার বা কায়ক্লেশে দিনগুজরান করা পরিবারগুলির মধ্যে।

যোজনা কমিশনের প্রাক্তন সচিব এন সি সাকসেনা দেখিয়েছেন যে স্বাধীন ভারতবর্ষে গত ছয় দশকে উন্নয়নের নামে, বড় বড় সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্প গড়তে, তাপ বা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, এয়ারপোর্ট, কারখানা, বাঁধ, জলাধার অথবা সামরিক বাহিনীর অস্ত্র পরীক্ষা ও যুদ্ধের মহড়া দেবার জন্য উচ্ছেদ হয়েছেন ছয় কোটিরও বেশী মানুষ, যা দেশ বিভাগে মোট ছিন্নমূল মানুষ সংখ্যার ৩ গুণ, প্যালেস্টাইনের সংঘর্ষে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সংখ্যার ৮ গুণ, কসভোর জাতি দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যার ৩০ গুণ। কোনো যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াই দেশের সরকার দ্বারা দেশের মানুষের উচ্ছেদের এবং অন্তর্দেশীয় জনসঞ্চালনের (inland migration) এত বড় ঘটনা দুনিয়ায় বিরল। যে উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, জলসেচ, ইস্পাত বা ভোগ্যপণ্যের জন্য এই উচ্ছেদ— তার ছিঁটেফোটা সুফলও এরা পাননি। পিতৃপুরুষের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্যসূচকের অধোগতি সংক্রান্ত নানা সমীক্ষা করে অ্যাডিলেডের ফ্লিন্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিষয় অধ্যাপক ড. ফ্রান বন বলেছেন— "All the indications are that the current forms of globalisations are making the world safe place for undettered market liberalisation and the consequent growth of inequality and posing severe threat to both peoples' health and health of the planet." একথাটা আমাদের দেশের পক্ষেও ভয়ঙ্করভাবে সত্য। বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবিকা থেকেও উচ্ছেদ। পৈত্রিক কৃষিজমি থেকে, হস্তশিল্প থেকে, স্থানীয় নদীতে মাছ ধরার থেকে উচ্ছেদ। এক কথায় যুগ যুগ থেকে চলে আসা স্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থাটারই উৎপাটন। এবং কোনো সঠিক পুনর্বাসন ছাড়াই। নর্মদা উপত্যকা পরিকল্পনা ও সর্দার সরোবর মানুষের শোকের ইতিহাসে এক মাইল-ফলক। উড়িষ্যায় কলিঙ্গনগর, পসকো কারখানা, মহারাষ্ট্রের রাজারহাট, পুজালি বা চাঁদমণি চা বাগান, অধুনা-পরিত্যক্ত এনরনের দাভোল প্রকল্প, ঝাড়খন্ডের কোয়েল কারো প্রকল্প, বম্মাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, কেরালার পুইয়ামকুট্টি, বা উত্তরাখণ্ডের তেহরি বাঁধের ফলে সহস্রাব্দ প্রাচীন জনপদ ডুবে যাওয়ায়। পন্ডিত নেহরু যেসব শিল্প পরিকল্পনাকে বলেছিলেন নতুন ভারতের মন্দির, তা আদিবাসী, সাধারণ কৃষক ও গরিব মানুষের শ্মশান বা করবস্থানে পরিণত হয়েছে। কোয়েল প্রকল্পে ৮০০০, বাগরি বাঁধের জন্য ৫০০০০, মহেশ্বর বাঁধের জন্য ১০০০০, তেহরির জন্য ৩০০০০ ও ইন্দ্রাবতীর জন্য ১০০০০ মানুষ গৃহচ্যুত হয়েছেন। নর্মদার বাঁধের জন্য প্লাবিত ২০০টি গ্রাম ও ১ লক্ষ হেক্টরের বেশি বন ও কৃষি জমি। পূর্বতন ও বর্তমান সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (UPA) সরকারের আমলে যত SEZ অনুমোদন পেয়েছে তার মিলিত আয়তন হরিয়ানা রাজ্যের চেয়ে বেশী। সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানা 'সফল' হলে প্রতিদিনই লাগত ৩৫ হাজার গ্যালন জল। সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে যে গুজরাটের সানন্দে টাটার কারখানার আশেপাশের গ্রামগুলিতে ইতিমধ্যেই তীব্র জলকষ্ট শুরু হয়েছে এবং বাড়ছে স্থানীয় মানুষদের বিক্ষোভ। পসকোর ইস্পাত কারখানায় লাগবে ৬৭৫ লক্ষ গ্যালন জল। ধ্বংস হয়ে যাবে আশেপাশের সমস্ত কৃষিজমি। নন্দীগ্রামে ২৫ হাজার একর জমিতে প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাব 'সফল' হলেও তার বিপর্যয়কর অভিঘাত পড়তো জনস্বাস্থ্যে।

এর পাশাপাশি আদিবাসীদের পাঁচ ছয় হাজার বছরের বসতভূমি অরণ্য এলাকাগুলিতে খনি সংক্রান্ত অনিয়ন্ত্রিত কাজকর্ম চালানোর অনুমতি দিয়েছে সরকার। বক্সাইটের লোভে গোন্দ উপজাতির বাসভূমি নিয়মগিরি পর্বতকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলার প্রকল্প নিয়েছে কুখ্যাত বেদান্ত কোম্পানি। মেঘালয়ের পাহাড়গুলি একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে লাফার্জ এর সিমেন্ট উৎপাদন করতে। কেবলমাত্র উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড এবং ছত্তিশগড়ে ১১৭টি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন (mining) নিয়ে দেশি ও বিদেশি কোম্পানিদের সাথে। একদিকে তা নিয়ে আসবে পরিবেশ ধ্বংস, অন্যদিকে তা ভারতবর্ষের ১.৭ লক্ষ গ্রামে ১৪.৭ কোটি মানুষ, যারা জীবনের জন্য অরণ্যসম্পদের ওপর

নির্ভরশীল, তাদের অনাহার ও মৃত্যুর কারণ হবে। একইভাবে ভারতের ১৭০০০ কিমি তটরেখায় ৫০ লক্ষ ধীবর সহ ২ কোটি মানুষের অস্তিত্ব, জীবিকা ও স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়েছে অর্থনীতি উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের সরকারী নীতির জন্য। বিদেশি ট্রলারগুলিকে অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়ে ও গভীর সমুদ্রের সীমার দূরত্ব তটরেখা থেকে ২০০ মিটারের জায়গায় কমিয়ে ৫০ মিটার করার ফলে। SEZ গুলি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের কারাগার, যেখানে মহিলা শ্রমিকদের নিয়মিতভাবে গর্ভ সঞ্চার না হবার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হয়। গর্ভবতী হলেই অথবা অসুস্থ হয়ে টানা ৭ দিন অনুপস্থিত থাকলেই চাকরি চলে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ সুমিত সরকার বলেছেন, ''ভারতের ইতিহাসে এ হচ্ছে সবচেয়ে বড় জমি দখলের ঘটনা, যা ইংরেজ আমলেও ঘটেনি।" পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েল অধিকৃত গাজা অঞ্চলে (Gaza Strip) একটি স্বাস্থ্য সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, প্রায় পাশাপাশি বাস করা প্যালেস্টিনীয় পরিবারগুলির বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচক ইজরায়েলি পরিবারগুলির চেয়ে অনেক খারাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কালো মানুষদের (Black Americans) মধ্যে স্বাস্থ্যসূচকগুলির অবস্থা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় অনেক নীচে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মোট জাতীয় উৎপাদনের সাড়ে তেরো শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে থাকে। উপরের উদাহরণ দুটি থেকে প্রমাণ হয়, কেবল আর্থিক প্রবৃত্তি নয়, সম্পদ বণ্টনের অসাম্য (inequal distribution) স্বাস্থ্যহীনতার এক প্রধান কারণ।

নব শিল্পায়ন ও স্বাস্থ্যের উপর আগ্রাসন সংক্রান্ত আর একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বর্ধমান, দুর্গাপুর, বাঁকুড়ার বড়জোড়া এলাকায় গড়ে উঠেছে ১৭টা ফেরো অ্যালয় ও ৪২টা স্পঞ্জ আয়রন কারখানা, যা বামফ্রন্ট সরকারের গর্বের বিষয় ছিল। অথচ এইসব কারখানা কী সাংঘাতিকভাবে পরিবেশ দূষণ ছড়াচ্ছে, আশেপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমির ফসল ও গাছপালা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে চোখ, ফুসফুস বা পেটের রোগ দ্রুত বাড়ছে, তার অনেক রিপোর্টই খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আর এইসব কারখানায় কাজ করা শ্রমিকদের অবস্থা তো অবর্ণনীয়। শ্রম আইনের কোন অস্তিত্ব নেই। দিনে ১৪-১৮ ঘণ্টা কাজ। মজুরি দিনে ২০ টাকা ও একবেলা সামান্য খাবার। কোন পরিচয়পত্র নেই। কারখানার ধোঁয়ায় নানা রোগের প্রকোপে আক্রান্ত প্রায় সকলেই। মধ্যযুগের দাস শ্রমিকদের চেয়েও খারাপ অবস্থা। বেসরকারি খবরে প্রকাশ যে, গত তিন বছরে মারা যাওয়া ভিনরাজ্যের প্রায় দশ বারোজন শ্রমিকের মৃত্যুর পর তাঁদের মৃতদেহ বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যাতে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। পরে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশে পুলিশ দাবিহীন দেহ হিসাবে সে সব মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেছে এবং পোস্টমর্টেমের পর পুড়িয়ে ফেলেছে।

শহরমুখী স্রোত : বিশ্ব জুড়ে

'খাতা পেরোলাম, ইমিগ্রেশন খাতা
লঞ্চ পেরোলাম, তার পর ট্রেন পথ
কোন এক দেশে আমরা যাচ্ছিলাম,
যত গেছি, তত ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে পথ"...

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে বিশ্বায়ন-উত্তর বিশ্বে তীব্রভাবে বেড়েছে অসাম্য। কমেছে সাধারণ মানুষের মাথাপিছু আয় ও খাদ্যের যোগান। আরো বেশি বেশি মানুষ তলিয়ে গেছেন দারিদ্র্যসীমার নীচে। বাসস্থান ও পেশা থেকে উচ্ছেদ গত তিরিশ বছরে যা ঘটছে তা মানব সভ্যতার বিগত ৫০০০ বছরের ইতিহাসে অপরিচিত ছিল।

পাশাপাশি রোগ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সরকারের প্রত্যাহার, Public Health প্রকল্পগুলো ধাপে ধাপে তুলে দেওয়া, পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই পণ্যে পরিণত হওয়া, জীবনদায়ী ওষুধের দাম কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার গুণ বৃদ্ধি, কর্পোরেট-বান্ধব ওষুধ নীতি এসব প্রসঙ্গে ঢুকছি না, কারণ তা এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় নয়। আর একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হল অল্প বেতনের স্বাস্থ্যকর্মী, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি ধরনের কর্মী প্রভৃতিদের কর্মচ্যুতি। এর ফলে গ্রামের মানুষের, বিশেষত গরিবদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সরাসরি পঙ্গু হয়ে পড়েছে। চীনে ১৫০০০ গ্রামীণ ক্লিনিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণের সময় থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে ২০ লক্ষ খালি-পা ডাক্তারের বাহিনীকে। জিম্বাবোয়েতে এক বিস্তৃত পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে আশির দশকে SAP প্রবর্তিত হবার সময় থেকে শিশুমৃত্যু বেড়েছে এবং টীকা দানের হার প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গেছে। চীনেও মহিলাদের মধ্যে মৃত্যুহার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বেড়েছে শিশুমৃত্যুর হার। গড় আয়ুকালের বৃদ্ধির হার কমে এসেছে। ফিরে এসেছে নানা সংক্রামক ব্যাধি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি।

১৯৯৭ সালে Trade and Development রিপোর্টে UNCTAD স্বীকার করেছে, যে দেশ যত দ্রুত উদার অর্থনীতির পথে গেছে, সেখানে তত বেকারি বেড়েছে এবং অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন হ্রাস পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এইসব পরিবারের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ কমেছে ২০ থেকে ৭৩ শতাংশ। ২০০৪ সালে Indian Development Report স্বীকার করেছে যে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার জন্য ঋণগ্রস্থ গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা গত দুই দশকে প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামীণ কর্মচ্যুতি, বেকারি, কৃষি থেকে উচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে সর্বহারা বা আধা সর্বহারা মানুষদের শহরমুখী স্রোত। এক বেসরকারী তথ্যে প্রকাশ যে, উত্তরবঙ্গে প্রায় ৩০,০০০ রাজবংশী কৃষক ক্ষেতখামার থেকে উচ্ছেদ হয়ে শহরে রিক্সা বা ভ্যানচালক, দরওয়ান, বাড়ি বা দোকানের চাকরে পরিণত হয়েছেন। বলা হল,

২০৩০ সালে নাকি ভারতবর্ষে শতকরা ৬৫ জন মানুষ শহরবাসী হবেন। এই অপরিকল্পিত, দারিদ্র্যতাড়িত জনসঞ্চালন সৃষ্টি করেছে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অপরিকল্পিত নগরায়নের। নিকাশী ব্যবস্থা, পানীয় জল, চিকিৎসা বা ন্যূনতম পৌর সুবিধা ছাড়াই গড়ে উঠেছে ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ। মুম্বই-এর চারপাশে ধারাভি এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি অঞ্চল। তার ৭০ শতাংশ অধিবাসীই জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া কৃষক পরিবারের সন্তান, মহারাষ্ট্র বা অন্য রাজ্যের। এই নোংরা, ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর নগরগুলো হয়ে উঠেছে নানা সংক্রামক রোগের সুতিকাগার। এছাড়া আছে যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদের War Economy টিকিয়ে রাখার জন্য বিশ্বজুড়ে Localised Warfare— পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়া, আফ্রিকার রোয়ান্ডা বা বুরুন্ডি এবং অবশ্যই আফগানিস্তান ও ইরাকে। এখন উদ্যোগ চলছে ইরান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া আক্রমণের। সম্প্রতি প্রখ্যাত মেডিক্যাল জার্নাল Lancet দেখিয়েছে যে ইরাকে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার মার্কিন উদ্যোগের পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সেখানে মারা পড়েছেন ৬.৫ লক্ষ মানুষ, যার ৩০ শতাংশ শিশু। বিশ্বজোড়া অস্ত্রশস্ত্রের বাজার টিকিয়ে রাখার জন্য এই যুদ্ধ নিয়ে এসেছে ব্যাপক গৃহহীনতা, অনাহার, অসুস্থতা ও মৃত্যু, যে collateral damage এর হিসাব কখনো করা হয়নি। দেখা যাচ্ছে ২০০১-২০০২ সালে প্যালেস্টাইনের অধিকৃত গাজা অঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১০০-এ ৪৫, যেখানে সংলগ্ন ইজরায়েলে তা ৮ ও জর্ডনে ১৬।

যুদ্ধ, নগরায়ন এবং পুঁজিবাদের লালসায়, বনসম্পদ, জলসম্পদ প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি জীবনধারণের অবস্থার অবনতি ঘটাচ্ছে। বাড়ছে মানসিক রোগ, মদ ও ড্রাগের নেশা, টিবি, যৌনরোগ ও এইচআইভি-এড্স। নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ম্যালেরিয়া, প্লেগ, পীত জ্বর, কলেরা, ডিপথেরিয়া। বহু ওষুধ-প্রতিরোধী টিবি (MDRTB) বস্তুত নয়া অর্থনীতির দান। ভারতবর্ষে এই ধরনের যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতহারে। Emerging Infectious Disease নামক বিখ্যাত মেডিক্যাল জার্নালে দেখানো হয়েছে কীভাবে নতুন নতুন মারাত্মক সংক্রামক রোগ বিশ্বের নানা কোণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, মহামারীর সৃষ্টি করছে। এর মধ্যে আছে HIV, Rota virus, SARS, Hepatitis C, Ebola and Hunta Virus। SARS ছড়িয়ে পড়ার জন্য বিশেষজ্ঞরা চীনের গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পূর্বতন Cooperative Medical Care System ভেঙে পড়াকেই দায়ী করেছেন।

ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসবিদরা (medical historians) দেখিয়েছেন যে ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাল হল নানা সংক্রামক রোগের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার শুরু। ইউরোপ থেকে আমেরিকা ও এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে প্লেগ, টাইফাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, গুটিবসন্ত, সিফিলিস, ম্যালেরিয়া, হুকওয়ার্ম সংক্রমণ, ফাইলেরিয়া, Yaws প্রভৃতি।

এখন আবার দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাপক জনসঞ্চালন ও সাধারণভাবে আর্থিক অবস্থার অবনতি নতুন নতুন মহামারীর জন্ম দিচ্ছে। তীব্র আঘাত পড়ছে বৃদ্ধদের ওপর। একদিকে পেনশনের অবলুপ্তি ও সুদের হার হ্রাস, অন্যদিকে বয়স্ক লোকেদের জন্য কাজের বাজার সংকুচিত হওয়া। তাছাড়া পরিবার পিছু চাকুরি কমে যাওয়ায় এবং পরিবারগুলোকে এলাকা ছেড়ে কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে হওয়ায় সমাজের পুরনো ব্যবস্থা, family support system ভেঙ্গে পড়েছে। অথচ সামাজিক নিরাপত্তা বা সোস্যাল সিকিউরিটি বলতেও তৃতীয় বিশ্বের এইসব দেশে কিছু নেই। ফলে বৃদ্ধদের জন্য পড়ে থাকছে প্রবাসী সন্তানেরা, পারিবারিক যত্ন ও ভরণপোষণের অবলুপ্তি, রোগব্যাধিতে কোন চিকিৎসা বা দেখাশোনার লোক না থাকা, অনাহার এবং মৃত্যু। এইসব হলো বিশ্বের ক্রমশ বাড়তে থাকা বয়স্ক মানুষদের জন্য বিশ্বায়নের দান!

সবুজ বিপ্লবের 'আশীর্বাদ' : ট্রেন নম্বর ৩৩৯

''ভূগর্ভ বিষ ফসলের দেহে মেশে
ও মেয়ে তোদের শরীরে শরীরে যায়,
দূরে বসে কেউ বন্ধ্যা করেছে তোকে
তুই কেড়েছিস মাটির তো সব দায়।''

প্রতি রাত্রে পশ্চিম পঞ্জাবের ভাতিন্ডা স্টেশনে এসে দাঁড়ায় ট্রেন নম্বর ৩৩৯। পোযাকি নাম অবহোর যোধপুর প্যাসেঞ্জার। স্থানীয় মানুষ বলেন, ''ক্যানসার এক্সপ্রেস''। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭-৪০ তে যাত্রা শুরু পঞ্জাবের অবহোর থেকে। ৮-৫৫ তে পৌঁছায় ভাতিন্ডা জংশনে, পাঁচ মিনিটের জন্য। মুহূর্তে শত শত মানুষ ধাক্কাধাক্কি করে ওঠেন ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরাগুলিতে। দ্রুত ভর্তি হয়ে যায় সমস্ত আসন, এমনকি কামরার মেঝেও। দুটি কামরার সংযোগস্থলের করিডোরেও তিল ধরনের জায়গা থাকে না। ট্রেন আবার চলতে শুরু করে। পাঞ্জাবের সমৃদ্ধ তুলা চাষের অঞ্চলগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে, হাজার মানুষকে তুলতে তুলতে। গুরসার স্নেওয়ালা, সঙ্গত মান্ডি, বাগওয়ালি, মান্ডি দাবওয়ালি, মানাস্কর হয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে পৌঁছায় রাজস্থানের বিকানীর জংশনে। ট্রেন প্রায় ফাঁকা হয়ে যায় সেখানে। বাকি যাত্রাপথটা আবার নিস্তরঙ্গ। শুধু ভাতিন্ডা থেকে বিকানীর, এই ৩২৪ কিলোমিটার যাত্রাপথে ১৬ বছরের যশপ্রীত থেকে লুধিয়ানার মধ্যবয়সী কৃষক শরণসিং, আড়াই বছরের ইন্দ্রাবীর থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সী মনজিৎ কৌর এর ভয়ঙ্কর শারীরিক যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে থাকে এই লৌহশকট। প্রতিরাত্রে। কিছু দিন বাদে বাদেই নিত্যযাত্রীর তালিকা থেকে অনেক নাম বাদ পড়ে যায়। শূন্যস্থান পূণ করেন নতুন নতুন যন্ত্রণাকাতর শিশু, পুরুষ, মহিলা, কৃষক, ক্ষেতমজদুর, শিল্পশ্রমিকের দল। ট্রেনের ভীড় কিন্তু এতটুকু কমে না। দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। অমানুষিক এ বেদনা বহন

করে ৫৪৭০৩ অবহোর-যোধপুর প্যাসেঞ্জার বা ট্রেন নম্বর ৩৩৯। তার গর্ভে জমে থাকে অসংখ্য রোগী ও তাঁদের পরিজনদের যন্ত্রণা, হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল। ট্রেনের যাত্রাপথের দুপাশের গ্রাম ও শহর-মফস্বলের ঘরে ঘরে দেওয়ালে ঝোলে বাবা-মা-ভাই-বোন-ছেলে বা মেয়ের অসংখ্য বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছবি। ট্রেন যদি কথা বলতে পারত, তাহলে নিশ্চয়ই চিৎকার করে বলে উঠত— ''কার পাপে? কার পাপে?''

কারা এই ট্রেনের যাত্রী? অসংখ্য ক্যান্সার রোগী। গলায় ক্যান্সার, চোখে ক্যান্সার, যকৃৎ-পাকস্থলী-অন্ত্রে ক্যান্সার, শিশুদের রক্তে ক্যান্সার। প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, এমন কি মাঝে মাঝে সপ্তাহে দুতিন রাতে এই ট্রেনে চেপে বসতে হয় অমরজিৎ, মনপ্রীত, হরবনস্, অজিত পাল, কনোয়ারজিৎ, সবজিৎ কৌর, যশপ্রীত কৌরদের। প্রথম সবুজ বিপ্লবের প্রোজ্জ্বল উদাহরণ, 'আধুনিক' নিবিড় কৃষি ব্যবস্থার সূতিকাগৃহ পঞ্চনদের উর্বর গ্রামাঞ্চল থেকে উজাড় করে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষেরা চলেছেন বিকানীদের ''আচার্য তুলসি আঞ্চলিক ক্যান্সার চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র'' নামক হাসপাতালে। ১৯৪২ সালে মহারাজ গঙ্গা সিংহ প্রতিষ্ঠিত ঐ হাসপাতালে প্রতিবছর প্রায় ষাট হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজারই পাঞ্জাবের মালওয়া অঞ্চল থেকে আসা রোগী। এক ক্যান্সার রোগীর কথায়— ''আমরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছি। কিন্তু একই দুর্ভাগ্য আমাদের এক সূত্রে গেঁথেছে। এই ট্রেনই আমাদের জীবনরেখা। এই ট্রেনযাত্রাই আমাদের জীবন।''

ষোলো বছরের যশপ্রীত চেয়েছিল ডাক্তার হতে। কিন্তু আজ সে দুরারোগ্য লিউকিমিয়ার রোগি হয়ে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুলছে। প্রথম যখন রোগ ধরা পড়ে, বিকানীরে গেলে এগারো ক্লাসে পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হবে ভেবে তাকে স্থানীয় হাতুড়ের কাছে চিকিৎসা করানো হত। এখন সে শুয়ে শুয়ে বিকানীর যায়। কেমোথেরাপি নিয়ে আবার ফিরে আসে। নাকের ক্যান্সারে একবার অস্ত্রোপচার হওয়া অমরজিৎ কৌর আবার গালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রতি সপ্তাহে বিকানীর যান। লান্ডে গ্রামের সর্বজিৎ কৌরের বয়স মাত্র কুড়ি বছর। ক্যান্সারের ফলে তার একটি স্তন বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু সর্বজিৎই নয়, ভাটিন্ডা, ফরিদকোট, মোগরা, মুক্তসর, ফিরোজপুর, সাঙ্গরুর, মালাউ, মানসা, লুধিয়ানার বহু গ্রামে পনেরো থেকে সত্তর বছরের মধ্যে অসংখ্য মহিলা স্তনের ক্যান্সারে ভুগছেন বা মারা গেছেন। মালওয়ার ৬৫টি গ্রামের প্রায় সত্তর হাজার মানুষের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে প্রতি বছর প্রায় আট হাজার মানুষ ক্যান্সারে মারা যাচ্ছেন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তথ্য অনুসন্ধানে জানা গেছে এই অঞ্চলে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ভারতবর্ষের জাতীয় গড়ের প্রায় সাতগুণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাপানে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণজনিত ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাবের কাছাকাছি। বহু পরিবারে দুই থেকে পাঁচজন ক্যান্সার আক্রান্ত, অনেকেই মারা গেছেন। ভাটিন্ডার দর্শন সিং-এর পরিবার 'কানা পরিবার' বলে খ্যাত, কারণ এই পরিবারের প্রায় সবাই রেটিনোব্লাসটোমা বা অন্যান্য চোখের ক্যান্সারে আক্রান্ত। এমনকি আড়াই বছরের ইন্দ্রাবীরও বাদ যায় নি। চব্বিশ বছরের লখীন্দর সিং-এর দুটি অন্ডকোষই ক্যান্সার আক্রান্ত হবার ফলে বাদ গেছে। প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে এই ধরনের অসংখ্য ভয়াবহ কাহিনী ছড়ানো।

ষাট সত্তরের দশকের গর্ব, ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর পক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারের বিষয় (প্রথম) সবুজ বিপ্লবের দান কর্কট রোগের এই করাল মূর্তি। দেশে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে, ফলন বাড়াতে, খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে আমাদের প্রয়োজন ছিল ভারতীয় কৃষকের পাঁচ হাজার বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের উপযোগী কৃষি নীতি। প্রায় পনেরোশো লক্ষ হেক্টর-এর উর্বর কৃষিজমির এই ভূখণ্ডে দরকার ছিল না বিদেশি কোম্পানির রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, তাদেরই তৈরি করা বীজ, মাটির তলাকার জল ডিজেল চালিত পাম্পসেট দিয়ে নির্বিচারে তুলে ফেলে উচ্চ ফলনশীল ধান গমের চাষ। আমাদের দরকার ছিল না। এ সবই করা হয়েছিল পেট্রোরাসায়নিক বহুজাতিক দানবদের স্বার্থে, তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা দেশীয় গোমস্তাদের সমৃদ্ধির জন্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারকে মারণগ্যাস সরবরাহ করত আইজি ফ্যারবেন বলে কোম্পানি। সেই গ্যাস ব্যবহৃত হত ইহুদি নিধনে। ন্যুরেমবার্গ বিচারে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় ঐ কোম্পানির নাম ছিল। বিচার এড়াতে একদিকে দেওয়া হল কোটি কোটি ডলার উৎকোচ ও অন্যদিকে রাতারাতি কোম্পানিকে ভেঙ্গে করা হল তিনটুকুরো— হেকস্ট, বেয়ার ও বিএএসএফ। মৃত্যু ব্যবসায়ীরা দেখা দিল সুভদ্র ঔষধ ব্যবসায়ী, কীটনাশক ব্যবসায়ী ও সার ব্যবসায়ী রূপে। হিটলারের নির্বাচনী ও যুদ্ধ তহবিলে লক্ষ লক্ষ মার্ক অনুদান দেওয়া কোম্পানি, যাদের ২৪ জন ম্যানেজার গণহত্যার দায়ে সোপর্দ হয়েছিল, কোন্ যাদুবলে তারা ছাড়া পেয়ে গেল? এদের মতো আরও অনেক কোম্পানি, যারা যুদ্ধের সময় মারণ রাসায়নিকের বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল, তারাই ভোল পাল্টে হল পেট্রো কেমিক্যাল কোম্পানি। নেমে পড়ল সার আর কীটনাশকের ব্যবসায়। যারা এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে চান তাঁরা Telfood Taylor এর ''The Sword and Swastika'' বইটি দেখতে পারেন। আর এদেরই স্বার্থে ভারতের সবুজ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমি লবণাক্ত হয়ে উর্বরতা হারিয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গেছে কয়েকশো ফিট নিচে। কীটনাশকের বিষে জর্জরিত কৃষক পরিবারগুলি। ঋণগ্রস্ততার মুক্তি কেবল আত্মহত্যার পথে। আজ এই 'বিপ্লবের'

রূপকার ড. স্বামীনাথন বলছেন— প্রথম সবুজ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে! সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে, তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিকল্পিত, ভারতবর্ষ থেকে দলে দলে কৃষিবিজ্ঞানী নিয়ে গিয়ে তালিম দেওয়া, এদেশের কৃষিমন্ত্রককে একচেটিয়া পুঁজির ব্যবসার স্বার্থে কাজে লাগানো এই 'বিপ্লবের' হলাহলে আজ প্রতি রাত্রে চলেছে ক্যান্সার এক্সপ্রেস, কৃষিজীবী পরিবারের হাজার হাজার গুরুতর অসুস্থ মানুষকে নিয়ে। মালওয়া অঞ্চলে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার একটিও ভালো হাসপাতাল নেই। চণ্ডীগড়ের পিজিআই (PGI) গরিব মানুষের কাছে গজদন্ত মিনারের মতো। তাই অসহায় রোগীরা যান বিকানীরের হাসপাতালে প্রায় নিখরচায় চিকিৎসার সুযোগ নিতে।

আজ ধ্বনি তোলা হচ্ছে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের। মনসান্টো, সিনজেন্ট্রার হাতে তুলে দেবার চেষ্টা চলছে হাজার হাজার বছরের কৃষিজ্ঞান অভিজ্ঞতার ফসল— প্রায় চার লক্ষ প্রজাতির দেশীয় বীজ ভাণ্ডার। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে বংশাণু পরিবর্তিত (GMO) বেগুন, চাল, টমেটো, ক্যাপসিক্যাম সহ ১৪টি ফসলের বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু করার জন্য— যা দেশীয় প্রজাতির বীজ ভাণ্ডারকে ক্রমশ ধ্বংস করে দেবে। অন্যদিকে চলছে জলসম্পদের অবাধ লুঠ ও অপচয়। প্রখ্যাত নদী ও জলসম্পদ বিশেষজ্ঞ ড. কল্যাণ রুদ্র দেখিয়েছেন যে বিদেশে রফতানির জন্য এমন সব ফসলের চাষ করা হচ্ছে, যাতে প্রচুর জল লাগে। আমেরিকা-ব্রিটেন চাইছে যেসব ফসল উৎপাদনে অনেক জল লাগে, তা তৈরি হোক তৃতীয় বিশ্বে— তারপর রফতানি করা হোক। ফসলের সাথে সাথে যে বিপুল পরিমাণ জলও বিনাপয়সায় পাচার হয়ে যাচ্ছে, তার নাম Virtual Water Trade। এক টন চাল বিদেশে রফতানি হলে তার সঙ্গে সাড়ে আঠাশ লক্ষ লিটার জলও চলে যায়। মাটির তলার জল টেনে তুলছি আমরা নির্বিচারে। তা পূরণ হচ্ছে না। পাচার হচ্ছে বিদেশে। ১৯৯৭-২০০১ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সময় নানা পণ্যদ্রব্যের সাথে ১৬২৫ ঘন কিলোমিটার জল চলে গেছে বিদেশে। জলের অভাবে ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ একর জমিতে খরিফ চাষ হয় নি। এবছরও অবস্থাটা তাই। লক্ষ লক্ষ একর জমিতে বোরো চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ এক কিলোগ্রাম ধান উৎপাদনের জন্য লাগে ৪৮০০ লিটার জল। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের স্থানে স্থানে জলস্তর হাজার ফিটেরও নীচে নেমে গেছে। শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, পলিস্তরে সঞ্চিত থাকা ফ্লোরাইড ও আর্সেনিক বিষাক্ত করে দিচ্ছে পানীয় জল। ড. রুদ্র 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে জলাভাবের ফলে আগামী দিনে হরিয়ানা ও দিল্লী পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে এগারো কোটিরও বেশি মানুষকে স্থানান্তরিত করতে হবে।

এরপর মারাত্মক রাসায়নিক কীটনাশক ও সারের কাহিনী। সবুজ বিপ্লবের সময় হেক্টর প্রতি ফসলের উৎপাদন ৩.৫৬ গুণ বাড়াতে গিয়ে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে ৩৪৪ গুণ। আদেশ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের ডিন ও কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা: জি পি আই সিং বলেছেন "সারা দেশে যত কীটনাশক ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র পাঞ্জাবেই তার ৪০-৫০ শতাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে আছে রাসায়নিক সার, যা থেকে নাইট্রেট ও নাইট্রাইট আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করেছে। প্রায় সমস্ত কীটনাশকই ক্যান্সার করতে পারে (Carcinogenic)। পৌষ্টিকতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine System) -কেও আক্রমণ করে। মালওয়া অঞ্চলে ব্যাপক ক্যান্সারের এটাই প্রধান কারণ।"

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ভূ-জল বিশেষজ্ঞ ড. নওল কিশোর বলেছেন "সমস্ত রকম জলে আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, লোহা, নিকেল ও পারার পরিমাণ বাড়ছে। এর প্রতিটির ফলেই নানারকম ক্যান্সার হতে পারে।" একবার ক্যান্সার রোগী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলে, চিকিৎসার খরচের পাশাপাশি মানুষটি ও তার পরিবারের বাঁচার অন্য সব রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। তিনি জমিতে বা অন্যত্র খাটতে পারেন না, ব্যাঙ্ক তাঁকে চাষ করার জন্য ধার দেয় না। অন্যান্য ছোট ঋণের দরজাও তাঁর সামনে বন্ধ হয়ে যায়। কৃষকদের মধ্যে কাজ করা এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধান বলেছেন, "আমরা সবুজ বিপ্লবের দাম চোকাচ্ছি। দেশের খাদ্যভাণ্ডার আজ কৃষকের বধ্যভূমি। সবুজ কৃষি প্রান্তর রাসায়নিকের বিষে মৃত্যুদণ্ডে পরিণত হয়েছে। সার ও কীটনাশক আমাদের মাটির তলাকার জলকে বিষিয়ে দিয়েছে।" শহরের মানুষেরা ফসলের ফলে সমৃদ্ধ। অথচ অন্নদাতারা পেয়েছেন অমুদ্র মন্থনে ওঠা হলাহল। অ্যাসিকেট, ক্লোরোপ্রোপেন, ডাই-ইউরন, ফ্লু মেটোরন, পেন্ডিমেথালিন, ট্রাইবুকস প্রভৃতি কীটনাশক বিষিয়ে দিয়েছে সমগ্র পরিবেশকে।

পাতিয়ালার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব জীববিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ড. সৎবীর কৌর-এর নেতৃত্বে ২১০ জন কৃষকের উপর এক পরীক্ষায় দেখা যায় যে ধান, গম, তুলো বা সবজি চাষের সাথে যুক্ত এইসব কৃষকদের মধ্যে ৭৫ জনের (৩৬ শতাংশ) দেহেই রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রভাবে কোষের মধ্যে বংশগতির ধারক ও বাহক ডিএনএ অণুতে নানাধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষেতে কীটনাশক ছড়াবার ঠিক পরেই, আর আবার পাঁচ মাস পরে, দুবার রক্তের নমুনা নিয়ে এই পরিবর্তন দেখা যায়। ড. সৎবীর কৌর বলেছেন যে ডিএনএ-র এই বিকৃতির ফলে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন ও কর্কট রোগের সৃষ্টি স্বাভাবিক। ভূপালের গ্যাস আক্রান্তদের মধ্যেও এমন নানা পরিবর্তন দেখা যায়— যাদের অনেকেই পরে নানা ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন।

আক্রান্ত সময়, আক্রান্ত স্বদেশ, আক্রান্ত জনস্বাস্থ্য। এমন সংকট বোধকরি মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোনোদিন আসেনি।

সূত্র: siddharthagupta@rocketmail.com

আক্রান্ত দেশবাসী

শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার নিয়ে এত নাচানাচি কেন?

দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী

শিক্ষা নিয়ে দেশের পরিচালকদের মাথাব্যথা চিরদিনই ছিল। এখন তার মাত্রা এতই বেড়েছে যে মাস্টার-ছাত্র-অভিভাবক নতুন নতুন ফতোয়ার সঙ্গে আর তাল রাখতে পারছেন না। এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে এই সব ফতোয়া খামখেয়াল বা ভাঁওতাবাজির ফল। শিক্ষার মাধ্যমে মানব সমাজ তার আহরিত জ্ঞান ও উদ্ভাবিত কলাকৌশল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেয়। বলা বাহুল্য, সমাজে যে শ্রেণীর প্রাধান্য চলে, তার নেতারা শিক্ষাকে ব্যবহার করতে চায় শ্রেণী প্রাধান্য বজায় রাখার কাজে। তাদের প্রয়োজন ও মতাদর্শের আদলে তৈরি হয় শিক্ষাব্যবস্থার ধাঁচ।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা চেয়েছে বাবু, মুৎসুদ্দি ও স্টিভেডর, কেরানি, আমলা ও সহকারী আধিকারিক, মুন্সেফ ও সাবজজ, ওভারসিয়ার ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, এলএমএফ ডাক্তার ও ড্রেসার, ইংরাজি সংস্কৃতি ও তার প্রভাবে সৃষ্ট দেশীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা। এই কাজের জন্য তারা এক শিক্ষাক্রম তৈরি করে যা আয়ত্ত করতে লাগে নকলনবিশি ও মুখস্তবিদ্যা। লাগে না সৃজনশীলতা বা স্বাধীন স্বকীয় চিন্তা। এই লক্ষ্যপথে যথার্থ অগ্রগতির সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত কার্যকর এক পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থাটি যে কত কার্যকর তা প্রণেতাদের কল্পনাতে ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একদিন বিলীন হতে পারে নিশ্চয় তাঁরা ভাবেন নি, কিন্তু সেই অঘটন ঘটা সত্ত্বেও সাহিত্য, শিল্পকলা, ও এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পশ্চিমী সাফল্যের অন্ধ অনুসরণ ও পাদপূরণই বিদ্যার্জনের শীর্ষ সম্মান বলে গণ্য হয়েছে ও দশকের পর দশক ধরে হয়ে চলেছে।

ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ দিন ক্ষয়িষ্ণু পুরনো জমিদার ও ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী উপাদান মিশ্রিত এক প্রাক-পুঁজিবাদী কৃষির পরিচালক জোতদাররাই কার্যত দেশের স্থানীয় শাসন চালাতে থাকে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বিস্তারের অন্যতম অস্ত্র হিসাবে গণ্য হয়ে শিক্ষার পরিমাণ বাড়তে থাকে (মূলত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা) কিন্তু শিক্ষার ঔপনিবেশিক ধাঁচে বিরাট কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। পুঁজির বড় মালিকদের তরফে রাধাকৃষ্ণন থেকে কোঠারি নানা কমিশন বসানো হয় শিক্ষার ধরন পাল্টানোর জন্য, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার কাঠামোয় কিছু পরিবর্তন (যেমন ১০ + ২ + ৩ + ২ বছরের নকশা) ছাড়া অন্তর্বস্তুতে যুগান্তকারী ওলোটপালোট কিছু ঘটে না। পাবলিক স্কুল, আইআইটি, আইআইএম, আইআইএসসি(বাঙ্গালোর), জেএনইউ, ডিএসই (দিল্লী) জাতীয় কিছু এলিট সংস্থা ও এলিট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গড়ে নিয়ে বা পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে বড় পুঁজি তার দরকারি অল্প কিছু উৎকৃষ্ট মানের ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ পেয়ে যায়। স্কুলের পঠনপাঠন পরীক্ষা একই ধাঁচে চলতে থাকে।

গত পাঁচ-দশ বছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও বড় পুঁজির কর্ণধারদের নজর পড়েছে। শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার আরটিই থেকে শুরু করে, স্কুল ও বোর্ড স্তরের পরীক্ষা তুলে দেওয়া কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, বাণিজ্য প্রশাসন, বিজ্ঞান, কয়েকটি মূল বিষয়ে সারা দেশে অভিন্ন পরীক্ষা চালু করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বশাসন, মানে যুগপৎ সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি দাক্ষিণ্যের অবসান, উচ্চশিক্ষায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্ব আরোপ, এবং বড় পুঁজি ও বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রে গবেষণা, শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি, বিশেষ করে বেসরকারি বিদেশি পুঁজিকে সাদর অভ্যর্থনা, এফেআই— পরিবর্তনের যেন বান ডেকেছে।

কিছু ব্যাপার পরিষ্কার। হংকং-এর এক কোম্পানি দু-তিন বছর আগে হিসাব করেছিল, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের বাজার মূল্য ৪ হাজার কোটি টাকা, এর অর্ধেকই বারো ক্লাস অবধি স্কুলশিক্ষার বাজার মূল্য। আন্তর্জাতিক নিরিখে ভারতের উচ্চশিক্ষার আক্ষরিক মান খুব খারাপ নয়। শিক্ষিত ও অনুশীলন-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ছাত্রের সংখ্যা প্রচুর। সুতরাং ভারতের শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে বিশ্ব পুঁজির নজর পড়বে এ আর আশ্চর্য কী। দেশ বিক্রিতে ওস্তাদ ভারত সরকার তাদের তিলক-শাঁখ-প্রদীপ সহকারে অভ্যর্থনা করেছে এও স্বাভাবিক বই কি। বিদেশিদের একটা বক্তব্য, ভারতীর শিক্ষা, বিশেষত স্কুলশিক্ষাকে সরকারি প্রশাসন ও সাবেকি জড়তা থেকে মুক্ত করতে হবে।

এছাড়াও স্কুল শিক্ষায় প্রস্তাবিত পরিবর্তন নির্দেশ করছে বড় পুঁজি। অবশেষে নিজের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক ধাঁচ পালটে 'আধুনিক' শিক্ষা নীতি চালু করতে চাইছে। তাই তথ্য প্রযুক্তি জগতের এক মাতব্বর কোম্পানি 'ইনফোসিস'-এর কর্ণধার কৃষ্ণমূর্তি সাহেব আইআইটি ছাত্রদের পড়ন্ত মান নিয়ে উদ্বিগ্ন।

আমেরিকার ঋণের সংকট, ইউরোপে রাষ্ট্রীয় ঋণের সংকট ও শ্রেণীসংঘর্ষের তীব্রতা বিশ্ব পুঁজিকে অস্থিরতার দিকে ঠেলেছে। বাঁচার জন্য পুরানো বহুজাতিক কোম্পানিরা ভারত, চীন, ব্রাজিলের পণ্য ও পুঁজির বাজারে নজর দিচ্ছে। ভারতের প্রসারণশীল বড় পুঁজিকে তারা বিশ্ব বাজারের এক জুনিয়ার অংশীদার হিসাবে গণ্য করে মোটর গাড়ি শিল্পের মতো পরিবেশ

দূষণকারী, উচ্চ কার্বন নিঃসরণের আসামী 'নোংরা' শিল্পে জায়গা দিয়েছে ও দিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে একদিকে তাদের দরকার খালাসি থেকে ফিটার, টার্নার, দক্ষতার নানা পাল্লার মজুর— আগের থেকে এঁদের দক্ষতা, অনুশীলন ও শিক্ষার মান বেশিই হতে হবে, কারণ বিশ্ব বাজারে দাঁড়াতে গেলে পুঁজিকে উন্নত প্রযুক্তির মেশিনে কম লেবার লাগিয়ে কম দামে উৎকৃষ্ট মানের মাল সরবরাহ করতে হবে। এই নতুন, আধুনিক, 'কর্মসংস্থানহীন বিনিয়োগ'-এর জন্য যে দক্ষ শ্রমিক ও অফিসার দরকার তাদের তৈরি করার জন্য চাই অন্য এক শিক্ষানীতি।

পুঁজিবাদের কালে সামাজিক অনেক উপাদানের মতো শিক্ষারও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে ব্রিটেনে। ঐখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি পরিষ্কার ভাগ :

১) বিনা পয়সার সরকারি স্কুল, এগুলি বৃটিশ আরটিই অনুসারে ১৪-১৬ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের কাজের বাজার থেকে আটকে রাখার খোঁয়াড়। এগুলি চলে যাঁদের বিদ্যা, চটজলদি সাধারণ বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তির সমাহারে, সেই হতভাগ্য বীরদের বলা হয় 'সাপ্লাই টিচার'। প্রত্যাশিত, এমন স্কুল থেকে পাশ করবে যে, সে খবরের কাগজের হেডলাইন বা কারখানার বিজ্ঞপ্তি পড়তে পারবে, অপাঠ্য হাতের লেখায়, ভুল বানানো কেজো চিঠি লিখতে পারবে, যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ জানবে। আমাদের দেশে ব্রিটিশদের সময় থেকেই পিয়নের চাকরির জন্য যে 'ক্লাস এইট'-পাশের ব্যাপার ছিল এও তাই।

২) মহার্ঘ প্রাইভেট ও পাবলিক স্কুল, এগুলি বেসরকারি এবং ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় বা তুলনীয় মানের প্রতিষ্ঠান বা পেশাগত অনুশীলনের জন্য তৈরি করে।

সব মার্কিন নীতির মধ্যে হিংস্র স্বার্থপরতা ও মুনাফা সর্বোচ্চ করার সুযোগসন্ধানে একনিষ্ঠার সংগে উদারনীতি ও ভাঁওতার যে মিশেল থাকে, শিক্ষানীতি তার বাইরে নয়। তবে দামের নানা পাল্লা আছে। 'মহল্লা'-কেন্দ্রিক কম খরচের স্কুলের মান ও উৎকর্ষের পাল্লার ভিন্নতাও চোখে পড়ার মতো। যদিও বিভাজনটাই আসল।

ভারতের আরটিই নীতি রূপায়ণে যখন দেখি 'মহল্লা' ভিত্তিক একটি সরকারি স্কুলও স্থাপন না করে মহল্লার প্রতি বেসরকারি স্কুলকে স্থানীয় দুর্বলতর অংশের পরিবার থেকে শতকরা ২৫ পড়ুয়া নিতে বাধ্য করা হচ্ছে, তখন বুঝি নতুন বড় পুঁজির শ্রমিক তৈরি হচ্ছে। ক্লাসে যারা বেতন দিয়েছে তাদের বেষ্টনীতে 'হংসো মধ্যে বকো যথা' অবৈতনিকরা বসবে। তাদের গৃহশিক্ষক আলাদা— কম দামের। তাদের স্কুল পোষাক ধবধবে সাদা নয়, ঈষৎ লালচে। কোনো কোনো দিন তাদের কেউ কেউ চটি পায়ে আসে। ভাবছেন, অন্যরা তাদের সমস্যা বুঝবে? ভুল ভাবছেন। উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসনের অধিকারীদের সতীর্থরাই নাম চালু করেছে— 'সোনার চাঁদ, সোনার টুকরো'। এই শতকরা ২৫ ভাগ ক্লাসে যেভাবে পড়ানোর সঙ্গে অভ্যস্ত, যেভাবে মুখস্থ করতে পারে, যে ধরনের গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ছে, তার আগে বিধিবদ্ধ পড়াশোনার ধারাবাহিকতা চ্যুত অবস্থা, যে ক্লাসে বয়স অনুযায়ী ভর্তি হয়েছে— কিছুই মেলে না তাদের পরিচিত জগতের সঙ্গে। প্রতি ব্যাপারেই শতকরা ৭৫ ভাগ যা চায় তাই হবে, স্কুল তো তাদের পয়সায় চলছে।

যে প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপক তাপস মুখার্জি-র এক সদস্য কমিশন আরটিই'র বুনিয়াদী তথ্যানুসন্ধান সম্পন্ন করেন ও আইনটির দিশার সাধারণ সূত্র প্রণয়ন করেন (তাঁর ভাগ্য এই আইনের যে অপভ্রংশটুকু রূপায়িত হয়েছে তা তাঁকে চোখে দেখতে হয় নি)। তিনি মনে করেছিলেন:

পড়ুয়ার পরিপার্শ্ব ও পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে;

ব্যক্তিত্ব, বিশেষ ক্ষমতা, দৈহিক ও মানসিক, সব মিলিয়ে তার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে প্রাথমিক শিক্ষায়;

শিক্ষা পদ্ধতি এগোবে ক্লাসঘরে সক্রিয়তা, আবিষ্কার, অনুসন্ধান, উপলব্ধি, সমস্যা সমাধানের পথ ধরে।

মূল্যায়ন পদ্ধতিই শিক্ষার রকম সকম নির্ধারণ করে। এই বোধ থেকে তিনি স্কুলের বাইরের কোনো পরীক্ষার বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা তুলে দিতে বলেন নি। ক্লাসঘরেই দৈনন্দিন ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুপারিশ করেছিলেন, যা মুখস্থ বিদ্যা নয়, উপলব্ধি ও অধীন জ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষমতা পরীক্ষা করে চলবে, এবং যার ভিত্তিতে শিক্ষান্তে স্কুলই শংসাপত্র দেবে। তাঁর সুপারিশের চিন্তন শাঁস বর্জন করে নানা বিচিত্র পরীক্ষার খোসা নিয়ে আমলাদের খেলা চলছে, কী কেন্দ্রে কী রাজ্যে। বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার এক ভূতপূর্ব ক্ষেত্রপ যশ পালের মুখে ঔপনিবেশিক ধাঁচের বদ্ধ জলায় আটক শিক্ষাক্ষেত্রে বড় পুঁজির নতুন চাহিদার হাঁকু পাঁকু শোনা যায় : ''আমাদের শিক্ষার বেশির ভাগটাই পড়ুয়াদের নতুন জ্ঞান নির্মাণের ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে শ্বাসরুদ্ধ করে।''

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় খেটে খাওয়া ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হওয়া কঠিন। বড় পুঁজির নব্য শিক্ষা চেতনা কার্যকর হলে 'এইট ক্লাস' পাশের বন্যা ও বড়লোকের উচ্চশিক্ষার জগতে কিছু 'দরিদ্র ও মেধাবী' পড়ুয়াদের সাফল্য দেখা যাবে। খেটে খাওয়া মানুষের ঘরের এই স্বাভাবিক অগ্রণীবর্গকে গিলে নেওয়া বড় পুঁজির রণকৌশলগুলির অন্যতম। এখন অপভ্রংশ দিয়ে কোন্ শ্রেণীর কেমন লাভ হবে কেউই ভাল বুঝছেন না। খেটে খাওয়া মানুষের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে যাঁরা চিন্তিত তাঁদের উপলব্ধি, পুরনো ঔপনিবেশিক ও বড় পুঁজির নব্য নীতি, কোনোটিই নিপীড়িতের অমৃত নয়। সেই অমৃতের সন্ধানে সাগর ছেঁচা শুরু হয়েছে নানা দিকে। ঘরের পাশেই নিপীড়িতের শিক্ষার চর্চা চলছে শ্রমজীবী হাসপাতালের উদ্যোগে।

আক্রান্ত অধিকার

কালা কানুন : সাদা চোখে —

অমিতদ্যুতি কুমার

দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র কতোটা প্রসারিত হচ্ছে তার একটা বাস্তব মাপকাঠি হলো 'আইনের শাসনে' গণতান্ত্রিক বাতাবরণ কতটা সুরক্ষিত হচ্ছে, প্রতিবাদ ও ভিন্নমতের অধিকার কী পরিমাণে জায়গা পাচ্ছে।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর বিদেশি হস্তক্ষেপ কী পরিমাণে 'মেনে নেওয়া হচ্ছে' তারও একটা মাপকাঠি হলো গণতান্ত্রিক বাতাবরণ, প্রতিবাদ ও ভিন্নমতের অধিকারের সংকোচনে বহির্শক্তির প্রভাবের মাত্রা কতোটা।

দেশের শাসকদের 'অভ্যন্তরীণ' প্রয়োজনের এবং 'বহির্শক্তির নির্দেশ'— এই দ্বিবিধ বাধ্যবাধকতা, অপরদিকে দেশের মানুষের গণতন্ত্র ও অধিকারের জন্য লাগাতার সংগ্রামের ফলে দেশের আইনি ও বিচারব্যবস্থায় কার্যত দুটি বিপরীত ধারা — দুটি আপাত-পরস্পরবিরোধী বিকাশ, লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত প্রয়োজনের অর্থাৎ শাসকদের 'অভ্যন্তরীণ' প্রয়োজন এবং বহির্শক্তির নির্দেশের দাবি মেটাতে ব্রিটিশ আমলে তৈরি পুলিশ-বিচার-আইনব্যবস্থাকে স্বাধীন ভারতেও ক্রমাগত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নতুন নতুন আক্রমণের জন্য সুসজ্জিত করা হচ্ছে। আবার দেশের মানুষের গণতন্ত্র ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম কিছুটা প্রশমিত করার জন্যও বটে এবং নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়নের কর্মসূচির বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার শর্ত পূরণ করার জন্যও বটে, মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, তথ্যের অধিকার আইন ইত্যাদি আইন এবং অধিকার সম্পর্কিত কিছু কমিশন/আধিকারিকও গঠিত হয়েছে— বিশেষত বিগত কুড়ি বছরে। এই আপাত পরস্পরবিরোধী দুই প্রক্রিয়া আসলে প্রথমটির, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্রমাগত দুর্বল করারই দু'টি ভিন্ন রূপ— দুধকে ক্ষীরে/রাবড়িতে পরিণত করার জন্য কড়াইয়ের তলায় জ্বাল দেওয়া এবং ওপরে বাতাস দেওয়ার সমতুল। দুধ থেকে ক্ষীরে পরিবর্তনের সময় অদৃশ্য বাষ্প নির্গত হবার মতই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও ক্ষয় পেতে থাকে এই প্রক্রিয়ায়।

প্রচলিত পরিভাষায় যেসব আইনকে কালা কানুন বা Black Law বলা হয়, নয়া উদারনীতির যুগে তাদের পোষাকি নাম হয়েছে নিরাপত্তা আইন (Security Laws)। অধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাদের আলোচনা এই পটভূমিতেই করা প্রয়োজন। কালা কানুন নামে একগুচ্ছ আইনকে অভিহিত করার পেছনে কারণগুলোও আর একবার ভেবে নেওয়া দরকার।

কালা কানুন 'কালা' কেন ?

প্রথমত, এই সমস্ত আইনই ক্ষমতার— রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতার— অস্বাভাবিক প্রয়োগ। ক্ষমতার এই (অপ)প্রয়োগের সংস্থান স্বাভাবিক আইনে/সংবিধানে না থাকলেও, স্বাভাবিক আইন বা সংবিধানে তথাকথিত 'বিশেষ পরিস্থিতির' জন্য বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থান আছে। সেই সংস্থান কাজে লাগিয়েই, শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের ব্যাখ্যান মতো এই সব আইন বলবৎ হয়।

দ্বিতীয়ত, এ ধরনের প্রায় সমস্ত আইনই প্রথমে বলবৎ করা হয় 'সাময়িক ব্যবস্থা'র কথা ব'লে। ১৯৪৬-এ উত্তর পূর্ব ভারতে 'সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন' ব্রিটিশরা চালু করে সে অঞ্চলে আওয়ান আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং নাগা বিদ্রোহের দোহাই পেড়ে। ১৯৫৮-এ নেহরু-সর্দার প্যাটেল ছ'মাসের বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলে ঐ আইনে ভারতের সংসদের অনুমোদন নিয়ে নেয়। এ আইন আজও চালু আছে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক জনমত ও আন্দোলনের বিরোধিতার মুখে যখন কোনো কালা কানুন তুলে নিতে বাধ্য হয় কোনো সরকার, তখনও তার সব থেকে অগণতান্ত্রিক 'কালা' ধারাগুলিকে অতি দ্রুতই চালু কোনো আইনে ঢুকিয়ে দিয়ে বা অন্য কোনো আইনের মোড়কে চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করে নেয়। বহু নিন্দিত টাডা, পোটা-র ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। 'বে আইনি কার্যকলাপ নিরোধক আইন' (UAPA) ১৯৬৭তে বলবৎ হবার পর ২০০৪, ২০০৮ এবং ২০১২-তে সংশোধন হয়েছে। প্রতিটি সংশোধনে তাতে আরো নতুন নতুন নখ-দাঁত যোগ করা হয়েছে। টাডা (১৯৮৫)-কে ১৯৮৭ এবং ১৯৯৩-তে নতুন করে বলবৎ করার পর ১৯৯৫-এ তার মেয়াদ শেষের ৫ দিন আগেই ফৌজদারি আইন সংশোধন করে তার সংস্থান-গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

চতুর্থত, 'কালা আইন' রূপে পরিচিত বিশেষ আইন এবং অধুনার নিরাপত্তা আইন স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলিকেই অগ্রাহ্য করে। যেমন :

- যে কোনো স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থায়, মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারেও অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো অভিযুক্তকে দোষী বলা যায়না। UAPA সমেত এই প্রায় সব আইনেই অভিযোগ হওয়া মাত্রই অভিযুক্তকে দোষী বলে গণ্য করা হয়।
- অপরাধ করলে বিচার ব্যবস্থায় অভিযুক্তকে জামিন দেওয়াটাই নিয়ম (rule) বলে একাধিক আদালত রায় দিয়েছে। এই আইনগুলিতে অভিযুক্তকে ১৮০ দিন পর্যন্ত জামিনের আবেদন করতে না দেওয়ার এবং তারপরেও

কার্যত জামিন না দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে বিচারের আগেই কমপক্ষে ছ'মাস এবং কয়েক বছর পর্যন্ত কার্যত বিনাবিচারে আটকের ব্যবস্থা করে 'বিনা বিচারে আটক আইন ঘুরপথে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

- স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থায় অভিযুক্ত দোষী না নির্দোষ তা নির্ধারিত হয় সাক্ষ্য-সাবুদের ভিত্তিতে। অনেকগুলি 'কালা' কানুনে সাক্ষ্য-সাবুদের পরিবর্তে বিচারকের 'ধারণা'কেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- অভিযুক্ত তাঁর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সাক্ষীদের পরিচয় জানতে পারবেন না, তারা পর্দার আড়ালে থেকে সাক্ষ্য দেবে, অভিযুক্ত তাকে জেরা করার সুযোগও পাবেন না।
- 'সংক্ষিপ্ত বিচার', গোপন বিচার (Camera trial), আদালতে অভিযুক্তকে হাজিরই না করা— এ সবেও ন্যায়বিচারের অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

পঞ্চমত, এই আইনগুলিতে কোনো অপরাধের সংজ্ঞা এমন অস্পষ্ট ও বিস্তৃত করা হয়েছে, যাতে কার্যত যে কোনো মানুষকেই এমন অপরাধে অভিযুক্ত এবং দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব।

ষষ্ঠত, কোনো অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেশি। সাধারণ ফৌজদারি আইনে যে সব অপরাধের শাস্তি বা জরিমানা, এক্ষেত্রে সেই একই অপরাধের জন্য জেল খাটতেই হবে। জরিমানার পরিমাণও এমন যে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়— অতএব জেলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যূনতম শাস্তির পরিমাণই মৃত্যুদণ্ড।

সপ্তমত, নাগরিকদের পুলিশি চর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করার, অন্যথায় শাস্তি দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে।

অষ্টমত, কোনো সম্পত্তি তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদী' অপরাধের জন্য বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই সন্দেহে একজন অধঃস্তন পুলিশ/সামরিক অফিসারের হাতে তা ধ্বংস করার ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে বেশ কয়েকটি আইনে।

নবমত, 'স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার' নিয়োগের মাধ্যমে বা সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ/আধা সামরিক/সামরিক/গোয়েন্দা অফিসারদের তত্ত্বাবধানে সরকারি অর্থে এবং সরকারের দেওয়া অস্ত্রে সজ্জিত ভাড়াটে খুনে বাহিনী তৈরি করার ব্যবস্থাও এই আইনগুলি প্রয়োগের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিহারে রণবীর সেনা, অন্ধ্রের সানলাইট সেনা, অসমের সালফা, কাশ্মীরের ইখনা-উল-মুসলিমিন, ছত্তিশগড়ে সালোয়া জুদামের বাহিনী ছাড়াও প্রতিটি প্রতিবাদী আন্দোলনে অন্তর্ঘাত সংগঠিত করার দৃষ্টান্তও সাম্প্রতিককালে সুবিদিত।

এছাড়াও মতপ্রকাশের ও সংগঠনের অধিকার হরণ, নাগরিকদের টোপ হিসেবে অথবা মানব-ঢাল (Human Shield) হিসেবে ব্যবহৃত হতে বাধ্য করা, ধর্ষণ-লুঠপাট-অগ্নিসংযোগ-গণপ্রহারে হত্যার মত অপরাধ সংগঠনও এই সব আইনের উদ্দেশ্য সাধনে বহুলভাবে ব্যবহৃত। বলাই বাহুল্য আইনগুলিতে এইসব অপরাধ/কাজ সংগঠনের সুস্পষ্ট সংস্থান সবক্ষেত্রে না থাকলেও এটাই বাস্তব, এবং প্রশাসনের খোলাখুলি ও বিচারবিভাগের পরোক্ষ একধরণের কার্যকর অনুমোদনও রয়েছে এসবের পেছনে।

কেন কালা কানুন ?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই, উপনিবেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের মুখে সাম্রাজ্যবাদকে দু'ধরনের কৌশল নিতে হয়েছিল। *প্রথমত*, তাদের নির্ধারিত সীমার মধ্যে কাজ করবে এবং উপনিবেশগুলিতে তাদের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবে না এমন প্রতিবাদী আন্দোলন/সংগঠনকে কিছুটা পরিসর দেওয়া। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে অনেকে এইভাবেই দেখে থাকেন। উপনিবেশগুলিতে পশ্চিমি ভাবধারা ও সংস্কৃতির বিস্তারের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক ভাবনার ও স্বাধীনতার মতাদর্শও কিছুটা বিস্তার লাভ করেছিল— সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিসর দেওয়ার বিকল্প ছিল না সাম্রাজ্যবাদের কাছে। *দ্বিতীয়ত*, কৌশলটি হল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও উপনিবেশিক শাসনকে প্রতিরোধ করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে নির্মমভাবে দমন করার পদ্ধতি, যা উপনিবেশ স্থাপনের শুরু থেকেই চালু ছিল, তাকে আরো তীব্র করা এবং এই দমনকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি 'সন্ত্রাসবাদ' নিয়ে বার বার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হতে থাকে। এই সব সম্মেলনের কাছে 'যুদ্ধ জয়' করে অন্য দেশকে উপনিবেশে পরিণত করা 'সন্ত্রাস' পদবাচ্য ছিল না, কিম্বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার জন্য যে বর্বর নির্মমতা চালানো হয়েছিল তা সন্ত্রাস ছিল না। স্বাধীনতার জন্য মানুষের আকাbখা যে প্রতিরোধে সক্রিয় হতে মানুষকে বাধ্য করে তাকেই এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধা হতে পারে এমন কাজকর্মকেই সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ধারিত সীমার বাইরে যে আন্দোলন তা 'রাজনৈতিক হিংসা'—এ ভাবেই স্বাধীনতা ও প্রতিরোধ আন্দোলনকে 'সন্ত্রাস' তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা হল। ভারতের সর্বাধিক পরিচিত এবং 'mother of all black laws' নামে পরিচিত কালাকানুন 'রাউলাট অ্যাক্ট'-এরও (১৯১৯) লক্ষ্য ছিল এই তথাকথিত 'রাজনৈতিক হিংসা'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে উপনিবেশগুলির এক ধরনের ভাগ বাঁটোয়ারা কিছুটা হবার পরও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হতে বেশি সময় লাগে নি। ভারতে ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা-বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য চালু হয় 'ভারত রক্ষা আইন' (১৯৬২তে ভারতের চীন যুদ্ধ এবং ১৯৬৫ ও

পরবর্তীতে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, এমনকি জরুরি অবস্থার সময়েও এই 'ভারত রক্ষা আইন' নবরূপে রাজনৈতিক বিরোধী, বিশেষ করে কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের এবং মুসলিম নেতাদের আটক ও নিপীড়নে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে)।

এর মধ্যেই ১৯৩৭ সালে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'সন্ত্রাসবাদ' নিয়ে একটি কনভেনশন তৈরি হয়—এবং ব্রিটিশ ভারত স্বভাবতই সেই কনভেনশনে স্বাক্ষর করে ১৯৪১-এ।

'রাজনৈতিক হিংসা' নিয়ে মাথাব্যথা

ক্ষমতাবানদের হিংসাকে বৈধতা দেবার জন্যই

'রাজনৈতিক হিংসা' নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের— স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে রাষ্ট্রসমূহের নানারকম সংগঠনের এই মাথাব্যথা 'অহেতুক' নয়। এরা সকলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা বা বজায় রাখার জন্য বিশাল বিশাল যুদ্ধযন্ত্র তৈরি করে — মানুষ নিজের শ্রমে যে সম্পদ তৈরী করে তার অন্তত ৬০ ভাগ যায় এই যুদ্ধযন্ত্র আর সময় সম্ভার তৈরিতে— যাঁদের শ্রমে এই সম্পদ তৈরি হয়, তাঁদের কাছে কিছুই ফিরে আসে না। শুধু তাঁরা যাতে অনাহারে, নিপীড়নে নিরুপায় হয়ে বিদ্রোহী না হন, সহিংস পথ না নেন, তার জন্য তাঁদেরই শ্রমের ফসলে সদা-সর্বদা বন্দুক উঁচানো থাকে। রাউলাট অ্যাক্ট থেকে আজকের UAPA, আমেরিকার Patriotism Act এবং বারংবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন সবই রাষ্ট্রের, শাসকদের, ক্ষমতাবানদের হিংসাকে বৈধতা দেবার জন্য আর তার যে কোনো বিরোধিতা অবৈধ, বে-আইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত করার উদ্দেশ্যে। 'সন্ত্রাসবাদে'র আতঙ্কে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে। একশো বছর পরে সাম্রাজ্যবাদের নবরূপে আবির্ভাব— কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়ন তার এক হাতে। আর এক হাতে ঘনায়মান বিক্ষোভ-প্রতিবাদ-বিদ্রোহকে প্রশমিত করার জন্য মানবাধিকার রক্ষা, তথ্যের অধিকার এর মতো কিছু আইনি ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের প্রতীক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আর পৃথিবী জোড়া সামরিক আগ্রাসনের পরিচালন কেন্দ্র পেন্টাগনে ৯/১১-র দুঃসাহসিক হামলা 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধের রণহুঙ্কারের সুযোগ করে দিল। ইতিমধ্যেই ইরাক থেকে শুরু হয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তেলের ভাণ্ডার কব্জা করার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মার্কিন তাত্ত্বিক হাচিনসন-এর কয়েক বছর আগে দেওয়া (১৯৯৭) সভ্যতার যুদ্ধ (War of Civilisations)-এর তত্ত্বে সজ্জিত সাম্রাজ্যবাদ ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে 'আগামী যুদ্ধে'র মনস্তাত্ত্বিক ও রণনৈতিক পটভূমি তৈরি করে ফেলেছে। ২০০১ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রস্তাবে (নং ১৯৭৩) তাতে সিলমোহর দিয়ে দেওয়া হলো। ঐ প্রস্তাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে 'সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত' তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সুনিশ্চিত করতে বলা হলো। আরো বলা হলো সন্ত্রাসবাদী কাজকে দেশের আইনে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ বলে চিহ্নিত করা এবং এই অপরাধের গুরুত্ব প্রতিফলিত করে এমন কঠোর শাস্তিদানও সুনিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের শাসকদের বাসনা ছিলই, সাম্রাজ্যবাদীদের তাদের মতো করে তাত্ত্বিক সমর্থনও জুগিয়েছে, ৯/১১ এর ঘটনা বিশ্ব জনমতকে অনেকটা বাগে এনে ফেলেছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিলমোহর শুধু নয়— নির্দেশই এসে গেলো। ফলে কর্পোরেট পুঁজির অবাধ চলাচলকে বাধা দেওয়ার যে কোনো চেষ্টাকে কঠোরতম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে চূর্ণ করার আইনি বর্ম ধারণে আর বাধা রইলো না।

এ দেশে যখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় বুঝিয়ে দিয়েছে সব কিছু আর আগের মতো চলবে না, ছত্তিশগড়ে সালোয়া জুদাম চালিয়েও যখন মধ্যভারতে টাটা-এসার-বেদান্তদের লুট সুনিশ্চিত করা যাচ্ছে না, এদেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি কংগ্রেস-বিজেপি তো এ ব্যাপারে এক কাট্টা থাকা সত্ত্বেও, লালগড়ে গোঁত্তা খেয়ে সিপিএমের লজ্জাও ভেঙেছে— UAPA-র ব্যাপারে 'সারা দেশই' নাকি ঐক্যবদ্ধ। রোদ থাকতে ধান শুকোতে দাও— প্রবাদ বাক্য মনে রেখে ২০০৮-এর ১৭ ডিসেম্বর, লোকসভা অধিবেশনের শেষ দিনে UAPA-র এক সংশোধন করে আরো 'কালো' করা হলো— সদ্য-সংঘটিত ২৬/১১-র মুম্বই হামলার রেশ তাজা থাকতে থাকতে। সঙ্গে পাশ করা হলো এই অ্যাক্ট এবং ফৌজদারি কার্যবিধিকে সংশোধন করে আগের কালা আইনগুলোর বেশ কিছু কালা ধারাও তার মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হলো।

আইনি সন্ত্রাস—

ক্ষমতাবানদের কায়েমী সন্ত্রাসকে টিকিয়ে রাখাই উদ্দেশ্য

একশো বছরের বেশি আগে উপনিবেশে নিজেদের সুরক্ষিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধের রাজনীতিকে অপরাধে— শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত করার যে চেষ্টা শুরু করেছিল, আজ তা আইনি সন্ত্রাসে পরিণত। সমাজ বিকাশের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে হিংসা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুক্ষেত্রেই নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। হিংস্রতার অস্ত্রে বহুগুণ বলীয়ান সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে হিংসার প্রয়োগে। অতি সম্প্রতি ইরাক থেকে লিবিয়া, কসোভো থেকে আফগানিস্তান— সর্বত্র নিজের পছন্দসই শাসন কায়েম করেছে, এবং তা বজায় রাখছে মাত্রাহীন হিংসার প্রয়োগে। এ হিংসা কি অরাজনৈতিক হিংসা? ভারতে বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব 'কালা' কানুন চালু আছে তা কি মানুষকে অনাহারে রাখা, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘটানো, অবহেলায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ মারাকে অপরাধে, শাস্তিযোগ্য অপরাধে, পরিণত করে? সমাজ কাঠামোর পাকে

পাকে জড়িয়ে থাকা এসব হিংসাকে টিকিয়ে রাখা, তা থেকে মুনাফা তোলা কি রাজনীতি নয়? এই রাজনৈতিক হিংসাকে কায়েম রক্ষার লক্ষ্যেই যাবতীয় কালা কানুন।

কালা কানুনগুলি তাই সর্বতোভাবেই নাগরিক, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ধারণাগুলির পরিপন্থী— অধিকার আন্দোলন তাই চিরকালই এর বিরোধিতা করে এসেছে, এখনও করছে, ভবিষ্যতেও করবে।

প্রতিরোধের রাজনীতি, স্বাধীনতার আকাbখা সংগঠিত অপরাধ?

নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির রমরমার সময় থেকে কালা কানুনগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য সামনে এসেছে— কিছু কিছু লক্ষণ আগে থেকেই ছিল। আগে থেকেই সাধারণ ফৌজদারি অপরাধে বিচারযোগ্য খুন-ডাকাতির মতো ঘটনা রাজনৈতিক কাজকর্মের অংশ হিসেবে সংঘটিত হয়ে থাকলে তা কোনো কালা কানুনে বিচার ও শাস্তি-যোগ্য ছিল। UAPA-সহ সমস্ত আইনগুলোতে কোনো অপরাধকে 'বেআইনি' কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে শাস্তির মাত্রা বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই 'নিরাপত্তা আইন'-এর তকমায় তথাকথিত 'সংগঠিত অপরাধ' (Organised Crime) প্রতিরোধের জন্য এক প্রস্থ কড়া আইন চালু করা শুরু হয়। মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ নিবারক আইন (MOCA-2000), কর্ণাটকে KOCA-2001, পশ্চিমবঙ্গে POCA-2001 (মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হলেও অধিকার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক জনমতের চাপে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়)— এরকম কয়েকটি আইন। পশ্চিমি দেশগুলি, লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশেও এরকম আইন এই সময় চালু হয়। ভারতে আগে থেকে আর একটি (সংগঠিত অপরাধ সংক্রান্ত) আইন Prevention of Illicit Trafficking in Narcotics & Psychotropic Substances Act-1988 চালু ছিল। এই নতুন এক প্রস্থ কড়া আইন, গত একশ বছর ধরে হিংসাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক হিংসা এবং নিরুপায় মানুষের প্রতিরোধকে চূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রের হাতে যতো আইনি অস্ত্র তুলে দিয়েছে, তাকে এক লাফে এক যোজন এগিয়ে নিয়ে গেল। এইসব আইনগুলিতে রাজনৈতিক কাজকর্ম রাষ্ট্র-নির্ধারিত 'হিংসা'র গণ্ডিতে প্রবেশ করলে তা আর রাজনৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হবে না, রাজনৈতিক কাজ চিহ্নিত ও বিচার হবে 'সংগঠিত অপরাধ' হিসেবে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও ভারতের অন্যত্রও বেশ কিছু মাওবাদী কার্যকলাপে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংগঠিত অপরাধ নিরোধক আইনে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের 'বিপ্লবী' কাজকর্মে যুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠন তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের দ্বারা, কোনো কোনো সময় রাষ্ট্রনায়কদের দ্বারা 'ক্রিমিন্যাল' বলে অভিহিত হয়েছেন— কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসরণ করতে গিয়ে করা ফৌজদারি আইনভঙ্গের কাজ সাধারণ অপরাধের সঙ্গে সমতুল্য করে দেখা, বিচার করা বা শাস্তি দেওয়া প্রক্রিয়া হিসেবে চালু ছিল না। এখন সেটাও হলো।

রাজনৈতিক কাজকর্মের 'হিংসা', ড্রাগ মাফিয়া, নারী-শিশুপাচারকারী, চোরাচালানকারীদের খুন জখম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা— সব কিছুকে একাকার করে ফেলা হলো নিরাপত্তা আইনের তকমা লাগানো কালা কানুনগুলোতে।

কালা কানুন সম্পর্কে যে কোন আলোচনায় অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরতে হলে যে দু'টি বৈশিষ্ট্যের উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, দুর্ভাগ্যের বিষয় বেশির ভাগ আলোচনাতেই তা অনুপস্থিত। এই বৈশিষ্ট্য দুটি হলো— *এক)* নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির বিশ্বায়নের সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং *দুই)* রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িত 'হিংসা'কে ড্রাগ মাফিয়া ও সংগঠিত অপরাধের সঙ্গে একাকার করে ফেলা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পতাকা এবং তার অনুমোদন নিয়েই ইরাককে মানব সভ্যতার অমূল্য নিদর্শন-সমেত সে দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে। ইরাক-লিবিয়া বা আফগানিস্তানের কোনো দেশপ্রেমিক মানুষ যদি নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে নামেন তিনি চিহ্নিত হবেন সন্ত্রাসবাদী হিসেবে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধের রাষ্ট্রসঙ্ঘীয় অনুমোদনে চরম শাস্তির যোগ্য। স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, উন্নত জীবনের জন্য মানুষের আকাbখা, সমাজবিকাশের— সামাজিক উত্তরণের যে কোনো চেষ্টাই হিংসাশ্রয়ী— এই অজুহাতে সন্ত্রাসবাদ এবং 'অন্তহীন যুদ্ধ-এর টার্গেট।

কালা কানুনের বিষয়ে আলোচনায় তার ধারা-উপধারার সাংবিধানিক বা আইনি বৈধতা, কঠোরতা এসব নিয়ে আলোচনা জরুরি— কিন্তু উপরোক্ত মূল দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা ব্যতিরেকে তা অনেকটাই অ্যাকাডেমিক হতে বাধ্য। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' আমেরিকা খোলাখুলিই ঘোষণা করেছে এ যুদ্ধে সে কোনো দেশের সীমা-সার্বভৌমত্ব এসব মানবে না। পাঁচের দশকের কোল্ড ওয়ারের যুগেও তারা মার্কিন স্বার্থরক্ষায় অপছন্দের দেশের রাষ্ট্রনায়কদের হত্যা করেছে, সিআইএ-কে দিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে— কিছুটা রেখে ঢেকে, গোপন অপারেশনে। আফগানিস্তান-পাকিস্তানে আমেরিকা যাদের শত্রু মনে করে, তাদের সন্ধানে যত্র তত্র, যখন তখন হানা দিচ্ছে তাদের কম্যাণ্ডোর দল বা রোবট বিমান 'ড্রোন', যাকে খুশি হত্যা করছে, একজনকে হত্যা করতে গিয়ে পঞ্চাশ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে, তাদের জনপদ, বসতি, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করেছে। ড্রোন হামলার আওতায় ইতিমধ্যেই এসে গেছে ভারত। প্রস্তুতি চলছে রোবট যুদ্ধের। পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে গত ক'মাসে ১৭৬ জন শিশুকে আমেরিকার ড্রোন হামলা হত্যা করেছে। ড্রোন হামলায় শিশু হত্যার সঙ্গে

সঙ্গেই শিশু অধিকার, শিশুশ্রম নিরোধ, শিশু সৈনিক বন্ধ করার মতো বিষয়ে কুম্ভীরাশ্রুও অব্যাহত।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধ, দেশে দেশে কালাকানুন এবং মানবাধিকারের জন্য ঢক্কানিনাদ নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়নের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত তা উপলব্ধি করতে না পারলে অধিকার আন্দোলন নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না — তা না পারলে অধিকার আন্দোলন রাষ্ট্রের দ্বারা আত্মসাৎ হওয়া বা বিভাজন ঘটানোর প্রক্রিয়াও আটকানো যাবে না।

পাঠ ও গ্রন্থনির্দেশ

1. The Terror of Law UAPA and the Myth of National Security–CDRO publication 2012
2. Extraordinary Laws in India–Compiled by Prakash Louis and R. Vashum. Published by Indian Social Institute, New Delhi 2002
3. No More TADAs Please–PUDR, Delhi. 2001
4. Towards A Police State–APDR, Kolkata, 2002
5. Origin of Rowlatt Legislation (Amritsar and Our Duties to India by B.G. Honniman, 1920)
6. Terrorism and International Law–I Bhishchenko & N. Zhadanov Progress Publishers, Moscow, 1984
7. Special Security Legislations and Human Rights–Report of four regional workshops Amnesty International, India December, 2002
8. Extraordinary Powers and Human Rights–Amitadyuti Kumar (Compiled in Human Rights In India Ed. Amit Bhattacharya and Bimal Kanti Ghosh)

৯. টাডা— নতুন মোড়কে রাউলাট অ্যাক্ট, এপিডিআর, কলকাতা ১৯৯৪

১০. গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রা : কেন্দ্রের পোটা থেকে রাজ্যের পোকা, এপিডিআর, কলকাতা ২০০২

ভারতের কালাকানুনগুলির একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলমাল ও সশস্ত্র রিরোধী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত

1. Rowlatt Act 1920
2. Explosive Substances Act 1908
3. Prevention of Seditious Meetings Act 1911
4. The Armed Forces Special Powers Act 1958
5. Disturbed Areas Act 1958
6. The Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 (Amended in 2004, 2008 and 2012)
7. Maintenance of Internal Securities Act (MISA) 1971
8. Disturbed Areas Special Courts Act 1976
9. National Security Act (NSA) 1981
10. Essential Services Maintenance Act (ESMA) 1981
11. Anti Hijacking Act 1982
12. The Suppression of Unlawful Activities (Safety of Civil Aviations) Act 1982
13. a) Terrorist & Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) 1985
    b) Terrorist & Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) 1985 allowed to lapse and TADA 1987 enacted
    c) Terrorist & Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) 1987 amended by Act no. 43 of 1993. After being periodically amended TADA allowed to lapse on 23.5.1995
14. a) Prevention of Terrorism Ordinance (POTO) Promulgated on 15 October 2001
    b) Prevention of Terrorism Act (POTA) Passed by joint session of Parliament on 2 April 2002
15. National Investigation Agency Act 2008

প্রধানত কমিউনিস্ট মতাবলম্বীদের একাংশ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত

16. Defence of India Act 1963

যে সব সাধারণ আইনের ধারাও রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে বহুল ব্যবহৃত

17. Indian Penal Code 1980
18. Indian Telegraphs Act 1885
19. The United Nations Security Council Act 1947
20. The Merchant Shippings Act 1948
21. Passports Act 1967
22. Press Act
23. Prevention of Illicit Trafficking in Narcotics and Psychotropic Substances Act 1988

রাজ্যস্তরে প্রণীত আইনসমূহ

1. The Andhra Pradesh Prevention of Activities of Bootleggers, Drug Offenders , Goondas, Immoral Traffick Offenders and Land Grabbers Act 1986
2. The Assam Preventive Detention Act 1980
3. The Bihar Control of Crime Act
4. The Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act 1980
5. The Jammu & Kashmir Public Safety Act 1978
6. The Jammu & Kashmir Prevention of Illicit Trafficking in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1988
7. The Karnataka Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Drug Offenders, Gamblers, Goondas, Immoral Traffick Offenders and Slum Land Grabbers Act 1985
8. The Maharastra Prevention of Communal, anti-Social and other Dangerous Activities Act 1980
9. The Maharastra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers and Drug Offenders Act 1981
10. The Tamilnadu Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Drug Offenders, Forest Offenders, Goondas, Immoral Traffick Offenders and Slum Land Grabbers Act 1982
11. The Maharastra Control of Organised Crime Act 2000
12. The Karnataka Control of Organised Crime Act 2001

আক্রান্ত অধিকার

অধিকার হননের কালা হাতিয়ার : ইউএপিএ

নারায়ণ সরকার

ভারতীয় সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে সমিতি গঠন, সমাবেশ ও মতপ্রকাশের যে মৌল স্বাধীনতা নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য জরুরি। এইসব স্বাধীনতা নাগরিকদের সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ সংঘবদ্ধভাবে প্রকাশ করতে, তাকে উন্নীত করতে, তার জন্য লেগে পড়ে থাকতে ও তাকে সুরক্ষিত করতে সক্ষম করে। এগুলি সাধারণ নাগরিকদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র তাদের মতপ্রকাশ করতেই দেয়না, মতামতগুলি সরকার ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের যতই সমালোচনামূলক হোক না কেন— সেগুলির প্রচারে প্রকাশ্য সমাবেশ ঘটতে দেয়। সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের যে সমস্ত স্বাধীনতার অধিকার প্রদত্ত হয়েছিল তা পরিকল্পিতভাবে খর্ব করা ও কালক্রমে ক্ষইয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ বিশেষ আইন জারি ক'রে। বর্তমান এদেশে চালু 'বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ আইন' বা 'ইউএপিএ' (UAPA) তার চরম কলঙ্কময় দৃষ্টান্ত।

পূর্বতন 'টাডা' (TADA) বা 'পোটা'-র (POTA) মতো 'ইউএপিএ' বা 'বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ আইন' নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ও সমিতি গড়ার স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ আরোপ করতে রাষ্ট্রকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। একশো বছরের আগে ১৯০৮ সালে 'ফৌজদারি বিধি সংশোধনী আইনে' (Criminal law Amendment Act, 1908) 'বেআইনি সংযোগ' ('unlawful association') কথাটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। ওই আইনে উল্লিখিত 'বেআইনি সংযোগে'র সংজ্ঞা অনুযায়ী তৎকালীন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কয়েকটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ক'রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করার প্রচেষ্টা করে। দুভার্গ্যবশত ১৯৪৭-পরবর্তীকালেও সরকারগুলি নাগরিকদের মৌলিক স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে বিরোধী বক্তব্য ও প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে ওই একই ক্ষমতা ব্যবহার করে, যদিও এই প্রতিবাদগুলির অনেকগুলিরই উৎস রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহার ও রাষ্ট্রের কাঠামোগত স্থায়ী অসাম্য, যা ভারতীয় সমাজকে উত্যক্ত করছে। মৌলিক স্বাধীনতাগুলি সীমিত করার জন্য রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপায় হলো মৌলিক অধিকারগুলির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য আইন পরিবর্তন করা, যাতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক বিরোধিতার কণ্ঠরোধ করতে পারে।

১৯৬৩ সালের সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী ১৯৬৭ সালে 'বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ আইন' (ইউএপিএ) বিধিবদ্ধ করার পথ তৈরি করেছিল। যদিও 'বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ বিল' (ইউএপিএ বিল) আগে দু'বার লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল— তৃতীয় লোকসভা ও চতুর্থ লোকসভায়— দু'বারই বিরোধিতার মুখে পড়ে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ১১ আগস্ট ১৯৬৭ লোকসভায় বিতর্কের সময় সাংসদ দয়াভাই প্যাটেল সংবিধানের ১৩(২) অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেন যা লোকসভাকে এই রকম আইন তৈরিতে বাধা দেয়। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে বা সংকুচিত করে রাষ্ট্র কোনো আইন তৈরি করবে না। ওই অনুচ্ছেদের বিরোধী কোনো আইন তৈরি হলে সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

'বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ আইন, ১৯৬৭' (ইউএপিএ, ১৯৬৭) সংশোধিত হয় ২০০৪ ও ২০০৮ সালে। সংশোধিত ইউএপিএ ২০০৪ আইনে 'টাডা' ও 'পোটা' থেকে নেওয়া বিভিন্ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যে দুটি আইন চরম নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

'বেআইনি কার্যকলাপ' ও 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে'-র দায়ে ইউএপিএ কোনো সমিতি বা সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দেয় সরকারকে। ইউএপিএ ১৯৬৭ স্বাধীন ভারতের লোকসভায় গৃহীত প্রথম কেন্দ্রীয় আইন যা কেন্দ্রীয় সরকারকে সংগঠন ও সমিতিসমূহ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। ১৯৯১ সালে 'সন্ত্রাস দমন অর্ডিন্যান্স' সংগঠন ও সমিতি নিষিদ্ধ করার আর একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে যা ২০০৪ সালে সংশোধনের মাধ্যমে ইউএপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইউএপিএ-তে যে দুটি অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সে দুটি হলো—'বেআইনি কার্যকলাপ' ও 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ'। ১৯৬৭ সালে ইউএপিএ-তে প্রথম 'বেআইনি কার্যকলাপে'র সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়। ২০০৪ সালের সংশোধনীতে এই সংজ্ঞা অনেকাংশে পরিবর্তন করা হয়। আইনের ২(ও) ধারায় বলা হয় যে, 'বেআইনি কার্যকলাপ' হলো—

> কোনো ব্যক্তি বা সমিতির কোনো কাজ, বাস্তব কাজকর্মের মাধ্যমে অথবা মৌখিক কথায় বা লিখিত বক্তব্যে অথবা সাংকেতিক ভাষায় বা প্রত্যক্ষভাবে কিংবা অন্যান্য উপায়ে যদি: (১) ভারতের ভূখণ্ডের কোনো অংশ কোনো কারণে বাদ দেওয়া বা বিচ্ছিন্ন করার দাবি সমর্থন করে বা এইরকমভাবে বাদ দিতে বা বিচ্ছিন্ন করতে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে প্ররোচিত করে; অথবা (২) ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত সংহতি অস্বীকার করে, তাকে প্রশ্ন করে ও ধ্বংস করে অথবা এইসব কাজে ইচ্ছা প্রকাশ করে;

(৩) ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে বা অসন্তোষ প্রকাশের প্রচেষ্টা করে।

এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, 'বেআইনি কার্যকলাপের' পরিধিতে অপরাধ করার জন্য কোনো হিংসাত্মক কাজে জড়িত থাকার প্রয়োজন নেই। বস্তুত এই সংজ্ঞা অনুসারে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য থেকে নাটক, গান, নাচ, ছবি আঁকা ইত্যাদি সমস্ত শিল্প-আঙ্গিকই অপরাধের রূপ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ যারা হিংসাত্মক কাজে জড়িত শুধুমাত্র তারাই নন, বরং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের কাছে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস আতঙ্কজনক তাদের বিরুদ্ধেও অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি ইউএপিএ-তে অপরাধ বলে গণ্য? দেশের ভূখণ্ডের কোনো অংশ ছেড়ে দেওয়া বা বিচ্ছিন্ন করার কথা বলা অপরাধ। তাতে অবশ্য সমস্যাগুলির অস্তিত্ব লোপ পায় না, যেমন, বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রশ্নে দেশের ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া বা জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূখণ্ডগত বিচ্ছিন্নতার দাবি। ইউএপিএ আইন আক্ষরিকভাবে মানলে, কোনো ভারতীয় নাগরিক এইসব বিষয় শুধুমাত্র আলোচনা করলেই আইন অনুসারে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। একমাত্র সরকারেরই চরম ও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এসব বিষয়ে বলা, আলোচনা করা এবং ইচ্ছেমতো কাজ করার। এই আইনের ১৩(৩) ধারায় খোলাখুলিভাবে এ বিষয়ে সরকারকে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ঃ "ভারত সরকারের সঙ্গে অন্য কোনো সরকারের সম্পাদিত চুক্তি, সমঝোতা বা মতৈক্য অথবা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তির আলোচনা এই ধারায় প্রযোজ্য হবে না।" অর্থাৎ ইউএপিএ অনুসারে বিচ্ছিন্নতার বিষয় নিয়ে যে কোনো গণতান্ত্রিক আলোচনার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে সরকার এবং এইভাবে উগ্র 'দেশপ্রেম' ও বিদ্বেষমূলক বিষাক্ত 'জাতীয়তাবাদ'-কে উৎসাহিত করে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের ওপর অপরাধের ছাপ মেরে দিচ্ছে কার্যকরভাবে।

উপধারা ২(ও)(৩)-এ বেআইনি কার্যকলাপের সংজ্ঞাটি আবার ফিরে দেখা যাক। ২০০৪ সালের সংশোধনীতে এই উপধারা ইউএপিএ আইনে যুক্ত করা হয়েছে যাতে ভারতের বিরুদ্ধে 'অসন্তোষ' প্রকাশের যে কোনো কাজকে অপরাধ বলে গণ্য করা যায়। 'অসন্তোষ' কথাটির বহুবিধ অর্থ হয়। ক্ষোভ বা উত্তেজনা প্রকাশ থেকে বিচ্ছিন্নতা বোধ এবং রাজনৈতিক বিরোধিতা থেকে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ। এই অস্পষ্ট কথাটি 'অনিচ্ছাকৃত' বা 'উদ্দেশ্যমূলক নয়' এমন অসন্তোষ প্রকাশকেও অপরাধ বানিয়ে তুলেছে। জাতিবর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতিসত্তাগত নির্যাতনের সমালোচনাকারীদের; ক্ষুধা ও অপুষ্টির সমস্যার সমাধানে সরকারি ব্যর্থতার সমালোচকদের; ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে আয় ও সম্পদের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও অসাম্য, শ্রমিকদের অধিকারকে পদদলিত করা, উচ্ছেদ ও ঘরছাড়া করে দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার ধ্বংসসাধনের সমালোচনাকারীদের 'অসন্তোষ' প্রকাশের জন্য এই উপধারায় তাদের সম্ভাব্য অপরাধী করে তোলা যায়। আবার, সংবিধানের যে সব ব্যবস্থা সংবিধানপ্রদত্ত সাম্য ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবত ভঙ্গ করেছে, সেগুলির সমালোচনা করাও 'অসন্তোষ' প্রকাশ বলা যায়।

কিন্তু ঘটনা এটাই যে, এমন সব ব্যক্তি যাদের কথা ও কাজ অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বা সমাজে অসন্তোষ ছড়াচ্ছে, তারা সবাই এই আইনে গ্রেপ্তার হননি। অথবা যে সব ব্যক্তি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন সবাই কারাগারে বন্দী হননি। রাষ্ট্রের পক্ষে এটা রীতিমতো কর্তব্যে অবহেলা মনে হতে পারে, কিন্তু ইউএপিএ আইনে তা যুক্তিসঙ্গত, কারণ কোন্ কাজ, কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ সংগঠন 'বেআইনি' ধার্য করা হবে সে বিষয়ে সরকারের একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। সংক্ষেপে, শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিরোধিতাকে দমন করার জন্যই এই আইনে 'বেআইনি কার্যকলাপের' বিষয়টির অস্তিত্ব রয়েছে— এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বেচ্ছাচারী, অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক। 'বেআইনি কার্যকলাপে'র শাস্তিদানে ভারতীয় নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ খণ্ডন করা হয়েছে, বিচ্ছিন্নতার বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারকে একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং নাগরিকদের অসন্তোষ প্রকাশের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ'

২০০৪ সালের সংশোধিত ইউএপিএ আইনে দ্বিতীয় যে অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটা হলো 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ'। 'পোটা' আইনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে হুবহু তাই ইউএপিএ ২০০৪ আইনে ১৫ ধারায় উল্লিখিত করা হয়েছে। ইউএপিএ-তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলে বিবেচিত হবে সন্ত্রাসবাদী কাজ সম্পর্কে সাধারণ ধারণার থেকে বহু দূরবর্তী এমন সব কাজকর্ম যেগুলি ইতিপূর্বে অন্যান্য বিভিন্ন আইনে অপরাধ বলে অভিহিত। ১৫ ধারায় 'সন্ত্রাসবাদী কাজ' বলা হয়েছে এগুলিকে—

(ক) বোমা, ডিনামাইট অথবা অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ বা দাহ্য পদার্থ বা আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র বা বিষাক্ত গ্যাস বা অন্যান্য রাসায়নিক অথবা অন্য কোনো বস্তুর সাহায্যে (জৈব, তেজস্ক্রিয়, পারমাণবিক শক্তি বা অন্য কিছু) অথবা অন্য কোনো উপায়ে—

১) কোনো ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু ঘটানো বা সেই

ব্যক্তিবর্গকে আহত করা; অথবা

২) সম্পত্তির ক্ষতি, ভাঙচুর বা ধ্বংসসাধন করা; অথবা

৩) দেশের মধ্যে বা বিদেশি রাষ্ট্রে জনজীবনে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা; অথবা

৪) ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তির অথবা ভারত সরকার বা কোনো রাজ্য সরকার বা তাদের কোনো প্রতিনিধির কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসসাধন করা; অথবা

(খ) অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের সাহায্যে বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ দেখিয়ে আতঙ্কে বিহ্বল করে বা প্রচেষ্টা চালিয়ে কোনো সরকারি কর্তাব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা করা; অথবা

(গ) কোনো ব্যক্তিকে আটক করে বা অপহরণ করে সেই ব্যক্তিকে খুন করার বা জখম করার হুমকি দেওয়া অথবা ভারত সরকার, কোনো রাজ্য সরকার বা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সরকারকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নিতে অথবা কোনো কাজ থেকে বিরত করতে বাধ্য করার জন্য কাজ করা।

উপরোক্ত সমস্ত 'সন্ত্রাসবাদী' কাজ আইপিসি, আর্মস অ্যাক্ট, এক্সপ্লোসিভস অ্যাক্ট, এক্সপ্লোসিভ সাবস্টান্সেস অ্যাক্ট ইত্যাদি অন্যান্য আইনে অপরাধ বলে অভিহিত। সুতরাং ওইসব অপরাধে ইউএপিএ-তে কাউকে অভিযুক্ত করা যাবে কিনা তা সরকার ও আইন-প্রয়োগকারীদের মর্জিমতো। খাপ বা জাত পঞ্চায়েতের 'বিচারে' তরুণ প্রেমিক যুগলের প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড অবশ্যই বীভৎস অপরাধ, যা আতঙ্কিত করে সেইসব মানুষকে যারা স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু ভারতে এই রকম কোনো অপরাধে ইউএপিএ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এ পর্যন্ত।

উপরে উল্লেখিত (খ) ও (গ) উপধারা দুটিতে জনগণের প্রতিবাদের অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত করা হয়েছে। উন্মত্ত পুলিশি তাণ্ডবের প্রেক্ষিতে অথবা পুলিশি দমন-পীড়ন যেখানে দৈনন্দিন বিষয়, পুলিশের দ্বারা বেআইনিভাবে আটক করা ব্যক্তিদের ছাড়ানোর জন্য এলাকার মানুষদের থানা ঘেরাও করে শক্তি প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। আবার হরিয়ানায় ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের প্রতিবাদসভায় পুলিশ গুলি চালালে, পুলিশ যাতে তাদের বিক্ষোভ সমাবেশে আর গুলি চালাতে না পারে সেজন্য বিক্ষোভকারীরা কয়েকজন পুলিশকে অপহরণ করে আটক করে রাখে। জনগণের এইরকম কার্যকলাপ ইউএপিএ আইনে অপরাধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রের নির্যাতন বা সন্ত্রাস সৃষ্টির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদের অধিকারকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরাও ওইসব কার্যকলাপকে 'সন্ত্রাসবাদী অপরাধ' বলে ঘোষণা করার অবাধ অধিকার পেয়ে গেছে।

ইউএপিএ আইনে শাস্তির ব্যবস্থা / ন্যূনতম শাস্তি সাত বছর!

ইউএপিএ-তে ১৩(১) ধারা ও ১৬ ধারায় শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩(১) (ক) যে কেউ বেআইনি কার্যকলাপ সংঘটিত করে বা তাতে অংশগ্রহণ করে;

(খ) যে কেউ বেআইনি কার্যকলাপের পক্ষে সমর্থনসূচক কথা বলে, তাতে উৎসাহ দেয় বা সাহায্য করে বা ওইসব কাজে প্ররোচিত করে;

সেই ব্যক্তি সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে, তাকে একই সঙ্গে জরিমানাও করা হবে।

১৬(১) ধারায় কেউ সন্ত্রাসবাদী কাজ করলে—

(ক) যদি সেই কাজের ফলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে জরিমানাসহ;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি পাঁচ বছরের কম নয় এমন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এই দণ্ডাদেশ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, একই সঙ্গে জরিমানাও করা হবে।

শুধুমাত্র অসন্তোষ বা ক্ষোভ প্রকাশের জন্য নাগরিকদের বেআইনি কার্যকলাপে অভিযুক্ত করার অধিকার যেখানে রাষ্ট্র ও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছে, সাতবছরের কারাদণ্ডাদেশ সেখানে চরম অন্যায়। রাজনৈতিক মতভেদ প্রকাশ করে নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সম্ভাব্য কারাদণ্ড আর একজন অভিযুক্ত ধর্ষণকারীর কারাদণ্ডের মেয়াদ একই! যারা এমনকি বেআইনি কার্যকলাপ 'সংঘটিত'ও করেনি, হয়তো শুধুমাত্র পরামর্শ দিয়েছে— সবার সমপরিমাণ শাস্তির ব্যবস্থা, সমাজ সম্পর্কে চিন্তা করাকেও 'অপরাধ' করে তুলেছে।

সন্ত্রাসবাদী কাজের ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তির হত্যা বা মৃত্যু না ঘটলেও, সর্বনিম্ন শাস্তি পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বর্ধিত হতে পারে ইউএপিএ আইন অনুযায়ী। ইতিপূর্বে প্রচলিত কোনো আইনে সর্বনিম্ন কোনো শাস্তির ধারণা ছিল না। শাস্তি দেওয়ার আগে বিচারক অপরাধ সংঘটনে অভিযুক্তের ভূমিকা ও ওই অপরাধের ফলে সমাজের ক্ষতি হওয়ার বিষয় বিবেচনা করবেন এটাই প্রত্যাশিত ছিল। ইউএপিএ এসব অগ্রাহ্য করে বিচারকের অধিকারে হস্তক্ষেপ ক'রে ন্যায়বিচারের ক্ষতি করেছে।

দ্বিতীয়ত, যারা প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদী অপরাধ সংঘটিত করেনি, তাদের ক্ষেত্রেও ইউএপিএ-তে সর্বনিম্ন পাঁচ বছর কারাদণ্ড সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা সন্ত্রাসবাদী কাজ করার প্রচেষ্টা চালায় বা সন্ত্রাসবাদীদের পরামর্শ দেয়, প্ররোচিত করে, উৎসাহিত বা সাহায্য করে, টাকা তুলে দেয়, প্রশিক্ষণ দেয়— তাদের সকলের

জন্য ১৭ থেকে ১৯ ধারায় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনসাধারণের মনে 'সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত নয়' এমন সব কাজকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সংজ্ঞায় জুড়ে দিয়ে এইসব ধারা সমস্ত রাজনৈতিক মতবিরোধকে স্তব্ধ করে দিতে সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

রাজনৈতিক মতবিরোধকে ইউএপিএ-তে বিপজ্জনক কার্যকলাপ গণ্য করে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়ার এক অভিনব পদ্ধতি হচ্ছে শাস্তি বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে ইউএপিএ ছাড়াও অন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্তকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায়। সুতরাং পুলিশের করণীয় হলো, ইউএপিএ ছাড়াও নির্দিষ্ট কয়েকটি আইনে স্তূপীকৃত মামলা সাজানো, যাতে অভিযুক্তের দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড সুনিশ্চিত হয়। 'বর্ধিত শাস্তি' বিষয়ক ইউএপিএ-র ২৩ নং ধারায় বলা হয়েছে—

(১) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো সন্ত্রাসবাদীকে বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে অথবা কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এক্সপ্লোসিভস অ্যাক্ট ১৯৮৪ বা এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট ১৯০৮ বা ইনফ্লেমেব্‌ল সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট ১৯৫২ বা আর্মস্ অ্যাক্ট ১৯৫৯ লঙ্ঘন করে অথবা কোনো ব্যক্তির কাছে অবৈধভাবে কোনো বোমা, ডিনামাইট বা নানারকম বিস্ফোরক বা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র, ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডের উপযুক্ত জিনিসপত্র বা যুদ্ধে ব্যবহৃত রাসায়নিক ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ন্যূনতম পাঁচ বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে— এই দণ্ডাদেশ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে— একই সঙ্গে জরিমানাও করা হবে।

(২) কোনো সন্ত্রাসবাদী বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি যদি উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কোনো আইনের কোনো ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার প্রচেষ্টা করেন বা লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত বা সাহায্য করেন, তাহলে উপধারা (১) অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তিকে ওই আইনি ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী বলে গণ্য করা হবে এবং শাস্তির ক্ষেত্রে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড'-এর রদবদল করে 'দশ বছরের কারাদণ্ড' দিতে হবে।

উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী, পুলিশ বা সরকারি কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি কোনো সন্ত্রাসবাদী ব্যক্তি বা কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বা গোষ্ঠীকে সাহায্য করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তির কাছে কোনো লাইসেন্সহীন অস্ত্র পাওয়া গেলে তার শাস্তি মাত্র ছয়মাসের কারাদণ্ড থেকে বেড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। ধারা ২৩(২) অনুযায়ী ওই ধারায় উল্লিখিত বিভিন্ন আইনের ব্যবস্থাদি শুধুমাত্র লঙ্ঘন করার জন্যই কোনো ব্যক্তি দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে! পুলিশ চার্জশিটে একাধিক আইন ভাঙার মামলা সাজালে শাস্তির পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের তরফে ইউএপিএ-র অপব্যবহারই প্রকট হয়ে ওঠে।

দরিদ্র মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত দু'টি বিষয় 'বর্ধিত শাস্তি'র ব্যবস্থায় অবহেলা করা হয়েছে। প্রথমত, নিষিদ্ধ অস্ত্রের তালিকায় বহুক্ষেত্রে গরিবদের জীবিকা বা পেশায় ব্যবহৃত জিনিসপত্র বা যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ কেরোসিন বা পেট্রল বিক্রির ব্যবসা করে থাকে, যার জন্য তাদের লাইসেন্স থাকে না। দ্বিতীয়ত, লাইসেন্সবিহীন অস্ত্রের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। কারণ শুধুমাত্র যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারাই লাইসেন্স নেওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অস্ত্র কিনতে পারে এবং সেই অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারে। অন্যদিকে, শোষকদের নিপীড়নমূলক কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করার জন্য গরিব, দলিত ও সমাজের অন্যান্য শোষিত মানুষজন মরিয়াভাবে 'অস্ত্র আইন' লঙ্ঘন করে বা করতে বাধ্য হয়।

এইভাবে ইউএপিএ ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বের অপরাধগুলিকে, যেগুলিতে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন রকম শাস্তি প্রদত্ত হতো, একই অপরাধের আওতার মধ্যে নিয়ে আসে। এই কাজে ইউএপিএ শাস্তির পরিমাণ প্রচণ্ড বাড়ায়, ভারতীয় সংবিধানে সর্বনিম্ন শাস্তির ধারণার প্রবর্তন করে এবং বিচার ব্যবস্থায় অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সংবেদনশীল ভারসাম্য বাতিল করে দেয়।

ইউএপিএ-তে সংগঠন নিষিদ্ধকরণ

ইউ এ পি এ অনুসারে রাষ্ট্র কোনো কারণ না দেখিয়েই কোনো সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। ৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সমিতি বা সংগঠনকে কেন্দ্রীয় সরকার 'বে-আইনি' সমিতি বা সংগঠন মনে করলেই তাকে 'বে-আইনি' ঘোষণা করতে পারে। তেমনই কোনো সংগঠনকে 'সন্ত্রাসবাদী' ঘোষণা করা যায় কেন্দ্রীয় সরকার সেই সংগঠনকে 'সন্ত্রাসবাদী' মনে করে বলেই (ধারা ৩৫)। ধারা ৩-এ বলা হয়েছে, বে-আইনি সংগঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংগঠন নিষিদ্ধ করার কারণ উল্লেখ করে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ক্ষেত্রে ৩৫-ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের এসব কিছু করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য ধারা-৩ অনুযায়ী (বেআইনি সংগঠনের বিষয়ে) সরকার 'জনস্বার্থে' কোনো তথ্য প্রকাশ করা উচিত নয় মনে করলে তা নাও করতে পারে।

ধারা-৩ অনুযায়ী সংগঠন নিষিদ্ধ করতে হলে আগে ট্রাইবুনালের অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত সংগঠন নিষিদ্ধ করার বিজ্ঞপ্তিগুলির কোনোটিতেই ট্রাইবুনালের অনুমোদন নেওয়া হয়নি এবং অনুমোদন ছাড়াই সেগুলি কার্যকর করা হয়েছে, কারণ ৩(৩) ধারা অনুযায়ী পরিস্থিতির বিচারে ও

সরকারের বিবেচনায় সংগঠনগুলির নিষিদ্ধকরণ তৎক্ষণাৎ কার্যকর করা 'জরুরি' ছিল। ৩৫ ধারা অনুযায়ী সরকার সরাসরি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নামের তালিকা প্রকাশ করে নিষিদ্ধ ঘোষিত করতে পারে।

ধারা-৩ অনুযায়ী কোনো সংগঠন দু'বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হতে পারে, কিন্তু ধারা ৩৫ অনুসারে কোনো সংগঠনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত করা যায়। ইউএপিএ-তে এ বিষয়ে কোনো পর্যালোচনা বা পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা নেই। এই আইনে ধারা-৩ মোতাবেক কোনো সংগঠনকে দু'বছরের জন্য নিষিদ্ধ করলেও, সরকার নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগঠনটি বে-আইনি কার্যকলাপে যুক্ত ছিল অভিযোগ ক'রে আরো দু'বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

৪, ৫ ও ৬ ধারায় বে-আইনি কার্যকলাপের জন্য নিষিদ্ধ সংগঠনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য এক সদস্যের ট্রাইবুনালের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য অভিযুক্ত সদস্যদের আবেদন করতে বলা হয়েছে। এই ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। ট্রাইবুনালের বিচারক নির্বাচন করেন সরকারি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ— হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির অনুমোদন লাগে না। এইভাবে এই ট্রাইবুনাল পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ধারা ৩৬ ও ৩৭ অনুসারে, 'সন্ত্রাসবাদী' চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ সংগঠনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার জন্য সংগঠনের সদস্যদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে হয়। ওই আবেদনের ওপর সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ইউএপিএ-তে উল্লিখিত নেই। সরকার আবেদন বাতিল করলে এক মাসের মধ্যে উক্ত সংগঠন এ বিষয়ে 'রিভিউ কমিটি'র কাছে দরখাস্ত করতে পারে। রিভিউ কমিটিতে চারজন পর্যন্ত সদস্য থাকতে পারেন— এর 'চেয়ারপার্সন' বা সভাপতি হবেন একজন হাইকোর্টের বিচারক বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। রিভিউ কমিটির অন্য সদস্যরা হবেন সচিব পর্যায়ের সরকারি আধিকারিক যারা আইনি বিষয়ে ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ। অর্থাৎ রিভিউ কমিটি তৈরি হবে প্রধানত সরকারি প্রশাসনের ব্যক্তিদের দিয়েই, এমনকি তাদের দিয়েই যারা ওই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার দায়িত্বে ছিলেন। এই কমিটির সদস্যদের নিয়োগ করা হবে পুরোপুরিভাবে সরকার কর্তৃক, যার ফলে নিষিদ্ধ সংগঠনগুলি ন্যায্যভাবে শুনানির সুযোগ পাবে কিনা সে বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠবেই। রিভিউ কমিটি তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কতদিন নেবে সে বিষয়ে ইউএপিএ-তে কোনো সময়সীমা নেই। সরকার নিষেধাজ্ঞা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সওয়াল করলে ইউএপিএ-র ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ সংগঠনটি সেখানে কোনো বক্তব্য রাখতে পারবে না। উক্ত সংগঠনের নিজের বা আইনি প্রতিনিধি মারফত মামলায় আইনের যুক্তিতর্ক তোলার কোনো অধিকার থাকবে না। নিষিদ্ধ সংগঠনটি শুধুমাত্র রিভিউ কমিটির কাছে দরখাস্তই পেশ করতে পারে। দরখাস্তটি শেষপর্যন্ত আইনত গ্রাহ্য মনে করলে রিভিউ কমিটি এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ দিতে পারে। নচেৎ কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় না। দরখাস্ত বাতিল হলে তার কারণ প্রকাশ করা হয় না। ইউএপিএ-তে সংগঠন নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে কোনো পুনর্বিবেচনার সুযোগ না থাকায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যত চিরকালের জন্য বহাল থাকে।

ইউএপিএ অনুযায়ী সংগঠন নিষিদ্ধকরণ নাগরিকদের সামগ্রিক জীবন, সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে জোরালোভাবে আঘাত করে। নিষিদ্ধ সংগঠনের শুধুমাত্র সক্রিয় সদস্যরা নন, ওই সংগঠনের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক থাকা যে কোনো ব্যক্তিই সরকারের আক্রমণের লক্ষ্য। ধারা ১০ অনুসারে ওই সংগঠনকে 'যে কোনো ভাবে সাহায্য' করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে দু'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে এবং যে কোনো 'হিংসাত্মক কাজ' করার জন্য সর্বনিম্ন পাঁচ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। এখানে হিংসাত্মক কাজ প্রকৃতপক্ষে কী ও তার দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ বা চরিত্র কিছুই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নেই। রাষ্ট্র বা সরকারি কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক ব্যাখ্যার ওপরেই তা নির্ভরশীল। দারিদ্রপীড়িত অনাহারে থাকা মানুষ যদি খাদ্যশস্য বোঝাই কোনো সরকারি ট্রাক লুঠ করে, তাদেরও এই ধারামতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। ৩৮ ধারা মতে নিষিদ্ধ সংগঠনের কোনো অসুস্থ সদস্যকে কোনো ডাক্তার চিকিৎসা করলে, কোনো আইনজীবী 'সন্ত্রাসবাদী' চিহ্নিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে মামলা লড়লে বা কোনো নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা কোনো বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক শিক্ষকতা করলে তাদের সবাইকেই নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য গণ্য করে নির্দিষ্ট শাস্তি দান করা যায়।

ধারা ৩৯ অনুযায়ী 'সন্ত্রাসবাদী' সংগঠনের সপক্ষে মতপ্রকাশ করা, সভা-সমিতিতে আলোচনা করা, সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বলা বা সরকারি নীতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা ইত্যাদি সমস্ত সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক অধিকারকে 'অপরাধমূলক কাজ' ঘোষণা করে এইসব অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (তিনি সংগঠনের সদস্য না হলেও বা 'হিংসাত্মক কাজে' যুক্ত না থাকলেও) জরিমানা সহ দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়।

সংবিধানসম্মত আইনি ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে ইউএপিএ পুলিশের গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে (ধারা ৪৩-ক ও ৪৩-খ), ১৪ এবং ৪৩-ঘ(১) ধারামতে ছোটবড় প্রতিটি 'অপরাধ'কে শাস্তিযোগ্য করে তুলেছে, ৪৩-ঘ(২) ধারায় আটক করে রাখার সময়সীমা বাড়িয়েছে, পুলিশ হেফাজতে রাখার আইনসম্মত বিধিব্যবস্থাকে

অগ্রাহ্য করেছে (ধারা ৪৩-ঘ(২), ধারা ৪৩-ঘ(৩) অনুযায়ী বিচারের সময় অভিযুক্তকে আদালতে উপস্থিত থাকার জন্য বিচারকের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা সীমিত করেছে, ৪৩-ঘ(৪) ধারায় আগাম জামিন পাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করেছে, ৪৩-ঘ (৫) ধারায় জামিন পাওয়ার ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, ৪৩-ঙ ধারায় বিচারাধীন অভিযুক্তকে 'অপরাধী' বলে ধরে নিয়েছে, ৪৪-ধারায় গোপন বিচারের ব্যবস্থা ও সাক্ষীদের পরিচয় গোপন রাখার ব্যবস্থা চালু করেছে, ৪৬-ধারায় আড়ি পেতে সংগ্রহ করা খবরকে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে পুলিশকে আদালতে উপস্থাপিত করতে দিয়েছে। ইউএপিএ-র এই সব ব্যবস্থা আইন প্রয়োগকারীদের হাতে সীমাহীন বাধাবন্ধনহীন ক্ষমতা তুলে দিয়েছে।

ইউএপিএ আইনে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করার অনুমোদন রয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বরিষ্ঠ আধিকারিকদেরই কেবলমাত্র পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারের নির্দেশ দানের ক্ষমতা দেওয়া আছে, 'নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ' তাঁর অধীনস্থ যে কোন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে সেই বিধিনিষেধ কার্যত বাতিল করে দিতে পারেন। এই ক্ষমতা প্রদান আদৌ লিখিতভাবে নাও হতে পারে, মৌখিকভাবে ক্ষমতা অর্পণ করা যায়! ইউএপিএ এখানে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫০ ধারাকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয়।

ফৌজদারি দণ্ডবিধি অগ্রাহ্য করে ইউএপিএ-তে গ্রেপ্তারের পরই পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়ে করা হয়েছে পুরো এক মাস বা তিরিশ দিন করা হয়েছে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই সময়ে আদালতে না তোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এইভাবে অভিযুক্তের আদালতে বিচারের সুযোগকে আইনত অস্বীকার করা হয়েছে। তিরিশ দিন পুলিশ হেফাজতে আটক থাকার পরেও তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক আদালতে আটকের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানাতে পারেন। পুলিশ হেফাজতে থাকার অর্থ অভিযুক্তর উপর প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। পুলিশ হেফাজতের সময়সীমার বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে ইউএপিএ অভিযুক্ত ব্যক্তির কণ্ঠরোধ করে, পুলিশ বা সরকারের পক্ষে অসুবিধাজনক কোনো বক্তব্য আদালতে পেশ করতে বাধা দেয় এবং অভিযুক্তকে ন্যায় বিচারের কোনো সুযোগ না দিয়ে আটকের সময়সীমা ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়, যা সংবিধান-প্রদত্ত মৌলিক স্বাধীনতাকে বাতিল করে দেয় এবং সংবিধান ও ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী গণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থা বা ন্যায়বিচারের পুরোপুরি বিরোধিতা করে। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বিনা বিচারে আটক করে রাখা নিষিদ্ধ এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে দশ বছর বা তার বেশি শাস্তি হতে পারে এমন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৯০ দিন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬০ দিন আটকের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা রয়েছে। ইউএপিএ-তে সমস্ত অপরাধের জন্যই, তা ক্ষুদ্র হলেও, ৯০ দিন আটক করে রাখা যায়। আবার ৪৩-ঘ(২) ধারায় এই সময়সীমা আরো ৯০ দিন বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এই আইনে পুলিশের ক্ষমতায় বাধা দেওয়া বা বিধিনিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা কার্যত আদালত বা বিচার ব্যবস্থার নেই। ইউএপিএ-তে অভিযুক্তের আগাম জামিন পাওয়ার অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে; এই আইনে জামিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আদালতে পুলিশের পেশ করা মামলার ডায়রিতে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে সেগুলিতে সত্যতা আছে বলে আদালত মনে করলে আদৌ জামিন দেওয়া যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ ধরে নিয়ে বিচার শুরু করাই ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ভিত্তি। সেজন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী আদালতে জামিন মঞ্জুর করাই রীতি, জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা ব্যতিক্রম। বোঝা যাচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তিকে রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত মনে করলে, বাস্তবত তার কণ্ঠরোধ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য তাকে আটক করে রাখার হাতিয়ার ইউএপিএ সরকার তথা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়েছে, যা সংবিধানকে ভিতর থেকে আঘাত করছে।

ইউএপিএ-র ৪৩-ঙ ধারায় বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী কাজে অভিযুক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না নিজেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে, ততক্ষণ তাকেই অপরাধী গণ্য করা হবে। এটা চরম বিপজ্জনক ও মানবাধিকার-বিরোধী এবং অবশ্যই একজন নাগরিকের সংবিধানিক অধিকার-বিরোধী। কারণ, সাধারণত কোনো অভিযুক্তের পক্ষেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো পথ খোলা থাকে না। তার ফলে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকের উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহ বিশ্বাসযোগ্যভাবে মামলাটি আদালতে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব থাকে না এবং মামলার ফয়সালা হয়ে গেছে ধরে নিয়ে পুলিশ ইচ্ছে করলে বন্ধ করে দিতে পারে এবং আটক হওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ হলেও সাজা-পাওয়া অপরাধীর মতো বছরের পর বছর আটক হয়ে থাকতে পারে।

ইউএপিএ অনুযায়ী, ফোন, ই-মেল বা মৌখিক কথাবার্তা থেকে পুলিশের আড়ি পেতে জোগাড় করা মন্তব্য বা তথ্য, কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে আদালতে পেশ করা যায়। এই সব মন্তব্য বা তথ্য খুব হালকা, নিছক কথার কথা, গুরুত্বহীন বা মামলার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও পুলিশ তার সুবিধামতো সাজিয়ে নিয়ে নিতান্ত নির্দোষ ব্যক্তিকেও আদালতে সহজেই অপরাধী হিসাবে তুলে ধরতে পারে— এটা ইউএপিএ-র সংবিধান অন্তর্ঘাতের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

এই লেখাটির জন্য সিডিআরও ('কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব ডেমোক্রাটিক রাইটস অর্গানাইজেসন্‌স) প্রকাশিত *'দ্য টেরর অব ল'—ইউএপিএ অ্যান্ড দ্য মিথ অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি'* গ্রন্থটি থেকে বিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আক্রান্ত নারীসমাজ

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র ভারতবর্ষেই এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি। সমগ্র নারীসমাজের ওপর বিরতিহীনভাবে একের পর এক ঘটে চলেছে আক্রমণের ঘটনা। এই প্রবন্ধ যখন লেখা চলছে তখনই হয়ত কোনো না কোনো নারী আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন। তথ্য ও পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে মহিলাদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, যৌন হেনস্থা ইভটিজিং ও নারী পাচারের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। সমাজের সর্বস্তরেই— ঝুপড়িবাসী, পরিচারিকা, গৃহবধু, অফিস-আদালতে কর্মরতা মহিলা ও অন্যান্য পেশায় যুক্ত মহিলারা, তা সে সাবালিকা বা নাবালিকা যাই হোক না কেন, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়ে চলেছেন পথে-ঘাটে, কর্মস্থলে, ট্রেনে-বাসে, থানার ভেতরে, পুলিশের ব্যারাকে, হাসপাতালে ও অন্যত্র।

শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যম নয় 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো' (এনসিআরবি)-র ২০১১ সালের বার্ষিক রিপোর্ট জানিয়েছে, ২০১০ সালে পশ্চিমবাংলায় মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মোট ২৬,১২৫টি অপরাধের ঘটনার বিপরীতে ২০১১ সালে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯,১৩৩-তে। প্রতিদিনে গড় অপরাধের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০টি। জাতীয় মহিলা কমিশন জানিয়েছে যে ধর্ষণের ঘটনা সারা দেশের গড় হারের দ্বিগুণ হারে ঘটেছে পশ্চিমবাংলায়। এ রাজ্যে ধর্ষিতাদের মধ্যে গণধর্ষণের শিকার ৪৪ শতাংশ। তার মধ্যে ১৯ শতাংশ নাবালিকা, ১৭ শতাংশ মানসিক-শারীরিকভাবে অসহায়। ধর্ষণের শিকার হওয়া মহিলাদের বয়স ৭ থেকে ৭২। ৮ শতাংশের ধর্ষণ হয়েছে হাসপাতালে ও ট্রেন থেকে নামিয়ে। ৪৪ শতাংশ ধর্ষণকারী এখনও ফেরার, ১৭ শতাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষিতার চরিত্র ও ধর্ষণের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, প্রায় ৩৯ শতাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষণকারীরা পূর্ব পরিচিত, ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ প্রথমে এফআইআর নিতে রাজি হয়নি— পরবর্তীকালে জনগণের চাপে পড়ে বা আদালতের আদেশে এফআইআর নিতে বাধ্য হয়েছে। ধর্ষণের বেশিরভাগ সংঘটিত হয় বিভিন্ন জেলায়, ছোট শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে। কমিশন ফৌজদারি আইনের ৩৫৭ ধারায় ধর্ষিতাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করেছে।

২০১২-তে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজে আলোড়ন তুলেছে বিশেষ করে পার্কস্ট্রীটের ধর্ষণকাণ্ড, পিঙ্কি প্রামাণিকের ঘটনা, হুগলি জেলার গুড়াপ থানার গ্রাম খাজুরদহ মিল্কিতে মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাদের হোম 'দুলাল স্মৃতি সংসদ'-এ গুড়িয়া নামের মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাকে ধর্ষণ ও হত্যা করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার ঘটনা, বিশ্বভারতী হোস্টেলের ঘটনা প্রভৃতি। উপরোক্ত ঘটনা সমূহের প্রত্যেকটি-ই আলাদা করে বিশদ বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

এমনটি আবার বলা ঠিক হবে না যে এর আগে পর্যন্ত অবস্থাটা মোটামুটি ঠিকঠাকই চলছিল। 'এনসিআরবি'-র তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে মহিলা নির্যাতনের সংখ্যা ছিল ১২,৭৮৫; ২০০৭-এ ১৬,৫৪৪; ২০০৮-এ ২০,৯১২ এবং ২০০৯-এ তা দাঁড়ায় ২৩,৩০৭-এ। এ ব্যাপারে আরও বিশদ তথ্য পরিসংখ্যানের জন্য দেখা যেতে পারে প্রবুদ্ধ বাগচী রচিত 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়'— 'মেয়েদের কথাকল্প', (সম্পাদনা সুধীর চক্রবর্তী) গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রবন্ধটি। এক রাজনৈতিক কর্মী অবশ্য মনে করেন ইদানীংকালে এই সব অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে, এর মানচিত্রও বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়ছে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াগুলিও। এর দায়িত্ব কিন্তু সরকার ও প্রশাসনের ওপরই বর্তায়। একদিকে নির্লিপ্ততা (যা আসলে পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতার প্রকাশ) অন্যদিকে শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেমন সাজানো ঘটনা বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, পোষাক আষাকের প্রতি দোষারোপ এবং চরিত্রের প্রশ্ন তুলে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আবার একজন অধ্যাপিকা ও নারী আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী-র মতে ২০০২ থেকে পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে। নারী নির্যাতনের ঘটনায় ইজ্জত-সতীত্ব শব্দগুলি সচেতনভাবে বাদ দেওয়াটা প্রয়োজন। ড্রেস কোড-এর প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ষণের প্রশ্নটি কোন মানসিক বিকৃতির প্রশ্ন নয়, সুযোগ-সন্ধানী বদমাইশদের কাজ। তাঁর মতে, অভিভাবকদের নিয়ে অবিলম্বে ফোরাম গঠন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন সরকারকে বাধ্য করা অর্থসাহায্য ও পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করতে, যেহেতু রাষ্ট্র তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। সেই সঙ্গে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের দাবিতে অবিলম্বে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। পুলিশ ও বিচারালয়কে এর আওতার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলেছেন যে নারী নির্যাতনের এই প্রক্রিয়া আগেও ছিল এখনও চলছে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে এটি এক সর্বভারতীয় প্রক্রিয়াও বটে। গোটা সমাজেও গ্রহণ লেগেছে, সামাজিক পচন-বিকলন আজ সর্বগ্রাসী। সমগ্র শাসকগোষ্ঠী আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এমনকি বৈদ্যুতিন সংবাদ-মাধ্যম মহিলাদের যে প্রতিরূপ তৈরি করেছে তা একাধারে খণ্ডিত বিকৃত; এর পেছনে পুঁজির ভূমিকাও বিশাল। অথচ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, লক্ষ্মী সায়গল, অরুণা আসফ আলীর

মত চরিত্রগুলিও আজ আর সামনে আনা হয় না। এই সমস্যার জটিলতা ও গভীরতা বিশাল— তৃণমূল স্তর থেকেই সচেতন প্রয়াস চালানো প্রয়োজন।

বস্তুত এটা যে একই সঙ্গে সর্বভারতীয় প্রক্রিয়া সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। গত ছমাসের মধ্যে গৌহাটি, ঝাড়খন্ড, হরিয়ানা, মণিপুর, কাশ্মীর ও অন্যান্য রাজ্যে ঘটে চলা ঘটনাগুলিতে ও দিল্লীতে বর্ষশেষের ঘটনায় তা চূড়ান্ত রূপ নিল ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশ বিহার অন্ধ্রপ্রদেশ আসাম ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে মহিলাদের উপর হিংসার ঘটনা এক মুখ্য বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে ১৯৭১ সালের থেকে ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে ৭৯১ শতাংশ, অথচ ধর্ষণের জন্য শাস্তির হার যা ১৯৭১ সালে ছিল ৪১ শতাংশ তা ২০১০ সালে দাঁড়িয়ে ২৭ শতাংশে। আরেকটি বৈশিষ্ট্যও আজকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। তা হল ধর্ষণকাণ্ডটি নিয়ে সমাজে আর আগেকার মত সামাজিক কলঙ্ক লেপন বা সোস্যাল স্টিগমা নেই বা অনেকটাই কেটেছে। ধর্ষিতা মহিলারা নিজেরাই প্রকাশ্যে এসে অভিযোগ দায়ের করছেন। তাদেরকে অচ্ছ্যুৎ করে দেবার পরিবর্তে তার পরিবার-বন্ধু-প্রতিবেশী এবং সমাজের একটা অংশও তার প্রতি সহানুভূতি বা সমানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাদের অনেকেরই মনে পড়বে কয়েক দশক আগে তপন সিংহ পরিচালিত 'আদালত ও একটি মেয়ে' চলচ্চিত্রের কথা। এমনকি নব্বই-এর দশকে তৈরি ঋতুপর্ণ ঘোষের 'দহন' ছবিটি-তেই সমাজের অন্য মানসিকতার ছবি ফুটে উঠেছিল। আজকের পরিস্থিতি সেদিক থেকে অনেকটাই ইতিবাচক সন্দেহ নেই।

এর পশ্চাদপটে রয়েছে পরিবার-সমাজ-শিক্ষাক্ষেত্র-কর্মক্ষেত্র-রাষ্ট্র ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে মহিলাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সমতার অধিকারের জন্য ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের কর্মকাণ্ড। স্বভাবতই পুরুষতন্ত্র বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যা আবার একই সঙ্গে জাতপাতের ও সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে বহুধাবিভক্ত তা মহিলাদের কষ্টার্জিত অধিকার ও স্বাধীনতার উপর খোলাখুলি ও সংগঠিত ভাবে শারীরিক ও মতাদর্শগত আক্রমণ নামিয়ে আনছে।

১৬ ডিসেম্বরের রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে দিল্লীতে যে বিক্ষোভের চেহারা দেখা গেল তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এর আগে দিল্লী কেন, ভারতের কোন মহানগরীতেই নারী সমাজের ওপর হিংসার ইস্যুতে প্রতিবাদ এরকম ব্যাপকতা ও তীব্রতা নিয়ে আছড়ে পড়তে দেখা যায় নি। এই বীভৎস নারী নির্যাতনের মোকাবিলা করতে বেশ কিছু দাবি বা চিন্তাভাবনা সামনে এসেছে— যেমন ফার্স্ট ট্র্যাক আদালতে ধর্ষণের মামলাগুলোর দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তি, অথবা গার্হস্থ্য জীবনে ও প্রকাশ্যে ভারতীয় নারীরা যে যৌন নিগ্রহের সম্মুখীন হন, তার মোকাবিলা করতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পথ খুঁজে বার করতে সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান— এসবই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নেই। একই ভাবে পশ্চিমবাংলাতেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সংগঠিত এক মিছিলেও পিতৃতন্ত্রের অবসান, মহিলাদের নিরাপত্তা ও সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রণয়ণের বেশ কিছু দাবি পেশ করা হয়েছে— যার মধ্যে রয়েছে সমস্ত ধর্ষণকারীদের দ্রুত এবং নিশ্চিত শাস্তির দাবি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী ধর্ষিতার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে তাদের পদত্যাগের ব্যবস্থা করা, ধর্ষিতার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ গঠন করা এবং হাসপাতালে রোগ সংক্রান্ত ফরেনসিক তদন্তের জন্য যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তোলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সমস্যাটা হলো যে রাজনৈতিক দলগুলি, পুলিশ, এমন কি বিচারবিভাগও মহিলাদের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী নয়। এমনকি যখন তারা মহিলাদের সুরক্ষা দেবার কথাও বলে তখনও তারা মেয়েদের পোষাকবিধি নানারকম শর্ত আরোপিত করে, মহিলাদের বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে থাকার বিরোধিতা করে। প্রকারান্তরে এগুলি পিতৃতন্ত্রকেই আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে মাত্র। তাই আজকের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে অন্যতম দাবি হওয়া উচিত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, তার মধ্যে সরকার পুলিশ দপ্তর বিচার বিভাগ, মহিলাদের সুরক্ষা দিতে বাধ্য থাকবে— তাদের অর্জিত সমস্ত স্বাধীনতাকে বজায় রেখেই— তা সে গৃহ-অভ্যন্তরেই হোক আর রাস্তায়ই হোক, প্রকাশ্যে দিবালোকেই হোক বা রাত্রিবেলাই হোক— নির্ভয়ে যাতে তারা মাথা উঁচু করে এই সমাজে বাস করতে পারে।

দুই

একজন রাজনৈতিক কর্মী সঠিকভাবেই লিখেছেন যে 'দামিনী'কে সামনে রেখে দিল্লীর যে গণউত্থান তা যেন সমুদ্রমন্থনের মতো অমৃত ও গরল— দুটিকেই সমানভাবে তুলে এনেছে একই সাথে। আপাদমস্তক নারীবিদ্বেষী সামন্ত ও পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের ধ্বজাধারীরা আসরে নেমে পড়েছে সক্রিয়ভাবে। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবৎ প্রথমে বললেন যে মহিলাদের ওপর অপরাধ সংঘটিত হয় ইন্ডিয়াতে, ভারতে এটা হয় না। কিছুদিন পরই তিনি আবার মন্তব্য করেছেন যে বিবাহ হলো এক চুক্তি তা ততদিনই টিকে থাকবে যতদিন স্ত্রী গৃহস্থালির কাজকর্ম ও স্বামীর প্রতি যথোপযুক্ত যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই চুক্তিকে মান্যতা দেবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অশোক সিংঘল শহরের জীবনধারার জন্য 'পশ্চিমী মডেল'কে দায়ী করেছেন। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বাবুলাল গৌর বলেন যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্ত্রী তার স্বামীকে 'পরমেশ্বর' হিসাবে পবিত্র জ্ঞান করে, সে জন্যই

বিবাহ হলো নিছক চুক্তির ওপরে আরও কিছু। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির সাংসদ কৈলাস বিজয় ভাসিয়া বলেছেন, লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে যাওয়ার কারণে সীতাও রাবণের হাতে ধরা পড়ে। 'গডম্যান' আসারাম বাপু ঘোষণা করেছেন, দিল্লীতে গণধর্ষণের শিকার তরুণীটিও এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়ী। কারণ প্রথমত তরুণীটির 'মধ্যরাতে' বাসে ওঠা উচিত হয়নি। এবং যখন বাসে উঠলো তখন ধর্ষণকারীদের ভাই বলে সম্বোধন করা ও তার 'ইজ্জত' রক্ষার জন্য তাদের পায়ে পড়ে প্রার্থনা করা উচিত ছিল। এমনকি তার অনুগামীদের প্রতি প্রদত্ত ভাষণেও তিনি ধর্ষণ-বিরোধী কঠোর আইনের বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন। মহারাষ্ট্রের মাফিয়া নেতা রাজ ঠাকরে দিল্লীর গণধর্ষণের ঘটনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে যা খুঁজে পেয়েছে তা এই যে, ধর্ষণকারীরা হলো বিহারী। আর সুষমা স্বরাজের মন্তব্যটি ইতিমধ্যে বহুলপ্রচারিত যে 'মেয়েটি' এখন জীবন্ত লাশ। মনে রাখা প্রয়োজন স্বল্পকাল আগেই এনডিএ-র আহ্বায়ক শারদ যাদব মহিলাদের 'রক্ষাকর্তা' হিসেবে খাপ পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকার প্রশংসা করেছিল।

কংগ্রেস সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী প্রতিবাদী ছাত্রী-মহিলাদের আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, সুন্দরী মহিলারা ছাত্রী সেজে মুখে রঙ মেখে হুজুগে মেতেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস প্রধান বোত্সা সত্যনারায়ণ খোলাখুলিভাবে নারীবিদ্বেষী মন্তব্য করতে পিছপা হন নি।

রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারপন্থী নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ এবং তৃণমূল সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার দুজনেই পার্ক স্ট্রীটের গণধর্ষণে আক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ও অবমাননাকর মন্তব্য রেখেছেন।

সিপিএম নেতা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আনিসুর রহমান বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চরম অরুচিকর বাক্য প্রয়োগ করেছেন এই ডামাডোলের মধ্যেই। এইভাবেই তিনি বজায় রাখলেন শ্যামলী গুপ্ত, বিনয় কোঙার, অনিল বসুদের রেখে যাওয়া ট্রাডিশন।

এ তো গেল প্রায় সমস্ত মূলধারার রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের কথা। প্রশাসন যন্ত্রও এ ব্যাপারে খুব পিছিয়ে নেই। তারা সরাসরিভাবে মহিলাদের সম্পর্কে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগে বিরত থাকলেও পিতৃতন্ত্রের অনুশাসনের জোয়াল মহিলাদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে। দিল্লী পুলিশ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে শুরু করেছে, ভয়ের কিছু নেই। মহিলারা আত্ম বিশ্বাস রাখুন, পুলিশ প্রশাসনকে জানান। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে ফিরুন।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্যা সমাধানে প্রস্তাব দিয়েছেন, সমাজের এই অর্ধেক অংশের বাইরে কাজের সময়টি সূর্যাস্তের পর আর থাকা উচিত নয়।

ঠিক এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক ঝলক টাটকা বাতাস বহন করে নিয়ে এলো এক সাহসী বার্তা। এক ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডের কাছে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পক্ষ থেকে মেয়েটির পিতা বলেছেন যে তিনি তাঁর কন্যা নিয়ে গর্বিত। লজ্জা পাওয়ার মতো কিছু সে করেনি। এবং তিনি চান যে দুনিয়ার সকলে তার নাম জানুক, যাতে তার সাহসী লড়াই থেকে অন্য মেয়েরা অনুপ্রেরণা পায়। সত্যিই মহিলারা যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাস্তায় নেমেছেন তা তো অতি বাস্তব। আন্দোলন দিল্লীর বুকেই সীমাবদ্ধ থাকে নি— রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়েছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রতিরোধ আন্দোলন। এখানেই শেষ নয়, নারী পুরুষ নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহ এই দায়িত্ব সাগ্রহে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে নেপাল, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ব্রিটেন ও আমেরিকাতেও।

ধর্ষণের সংস্কৃতি

ধর্ষণ হলো বর্তমান ভারতের মূলধারার সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য স্বরূপ গভীরে শিকড় গাড়া নারীবিরোধী মনোভাব ও কাঠামোগত বৈষম্যের চরম সহিংস ও ঘৃণ্য প্রকাশ। বিচারব্যবস্থা সহ গোটা ভারতীয় রাষ্ট্র এই মানসিকতার মোকাবিলা করা তো দূরের কথা, বরং ঐ মানসিকতার রক্ষক রূপেই প্রায়শ নিজেদের প্রকাশ করে। রাষ্ট্রীয় হেফাজতে ধর্ষণের ঘটনার হার যে খুব বেশি— এই ঘটনাই তা প্রমাণ করে। আজকের ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমেই এই বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠছে যে কাশ্মীর থেকে গুজরাট, ছত্তিশগড় থেকে দেশের অন্যান্য স্থানে রাষ্ট্রীয় হিংসার অবধারিত বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে নারীদের উপর নেমে আসা ভয়াবহ যৌন হিংসা। ধর্ষণের সংস্কৃতিকে সযত্নে পালন করে চলেছে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ-মন্ত্রী-আমলা-পুলিশ প্রশাসন-বিচারবিভাগ— সর্বত্রই এই বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে শুধুমাত্র আজ নয়, বহুকাল থেকেই। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সংবাদপত্রগুলিতে এর অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

অন্য আরেকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। তা হলো, ভিন রাজ্য বা প্রদেশ থেকে কাজ করতে আসা বহিরাগত শ্রমিকদেরই এজন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা। দূরদর্শনে এক সাক্ষাৎকারে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত বলেছেন যে এই সমস্ত বহিরাগতরা আক্রমণ করে সহজে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলে পুলিশের পক্ষে এই অপরাধগুলিকে দমন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দিল্লীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত পুলিশ কর্তারাও মনে করেন, এই বহিরাগতরাই ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, কারণ তারা পরিবার পরিজনদের ছেড়ে অনেক দূরে থাকতে বাধ্য হয় । ধর্ষণ যে আসলে যৌন ইচ্ছার বা কামনা-বাসনার ফলশ্রুতি নয় বরং তা আসলে মহিলাদের প্রতি

এর পর ৮২ পৃষ্ঠায়

ধর্ষণ : আক্রান্ত নারী

মিতা দত্ত

ধর্ষণ নিয়ে গত এক মাস ধরে সংবাদপত্র-টেলিভিশন-রাস্তাঘাট-কলেজ-অফিস-বাসে আলোচনা চলছে। যে ভয়ানক ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড হয়েছে দিল্লীতে, কোনো নিন্দাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাতে একটা ভালো জিনিসও হয়েছে, ধর্ষণ নিয়ে আলোচনা চলে এসেছে সামনে, গণ-পরিসরে। তা আলোচনার, আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠেছে।

আগেও ধর্ষণ নিয়ে আন্দোলন হয় নি এমন নয়। ধর্ষণ নিয়ে আন্দোলনের কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায় মনোরমার কথা, মণিপুরের মায়েদের কথা। যাঁরা নগ্ন হয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন সামরিক বাহিনীর হাতে তাঁদের মেয়েদের ধর্ষণের প্রতিবাদে।

মনে পড়ে ভানোয়ারি দেবী মামলার কথা। রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে সরকারি প্রকল্পের কাজ হিসাবে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়। সেটা ১৯৯২ সাল। সেই মামলা নিয়েও বেশ হইচই হয়েছিল। পাকিস্তানে মুখতারি মাই-এর ঘটনাও এসেছিল সামনে।

সংবাদমাধ্যমে এসেছিল জঙ্গলমহলে মেয়েদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের কথাও। নারী কিনা তা বোঝার জন্য নারীকে বিবস্ত্র করার কথা জানা গেছে। এসেছে সরাসরি ধর্ষণের অভিযোগও। এসব নিয়েও প্রতিবাদ হয়েছে। লালগড় আন্দোলনের কারণ হিসাবে এগুলি একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। হেতাল পারেখ-এর মামলাটা একটু অন্য ধরনের, তাতে মেয়েদের নিরাপত্তা বা ক্ষমতায়নের চেয়ে অনেক বেশি জোর পড়েছিল খুনি ও ধর্ষকের ফাঁসির ওপর।

এই ঘটনাগুলির মধ্যে একটা মিলের দিক আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেই নারীটি (মনোরমা অবশ্য জীবিত ছিলেন না, তাঁর হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মণিপুরের নারী সমাজ)।

সাম্প্রতিক আন্দোলন

কিন্তু এগুলির সঙ্গে আজকের তফাতও আছে। ঐসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ হয়েছিল নির্দিষ্ট ঘটনার, মণিপুরের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর হাতে অত্যাচারের, লালগড়ে পুলিশি অত্যাচারের। কিন্তু এবারের আন্দোলনের কেন্দ্র সাধারণভাবে ধর্ষণই। আর তাতে যোগ দিয়েছেন যারা তাদের অনেকেই সাধারণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের লোক নন। আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ, নারীরা, ছাত্রছাত্রীরা। আর সাধারণভাবে ধর্ষণের বিষয়টি চলে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে।

আন্দোলনে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ, সরব হওয়ার ঘটনাটি খুবই ভালো লক্ষণ। পাশাপাশি এটাও বলে রাখা দরকার যে, যারা সরব হয়েছেন তাঁরা সাধারণভাবে সমাজের উপরের দিকের মানুষ। দিল্লীর অত্যাচারিত মেয়েটির সঙ্গে তাঁরা একাত্মতা বোধ করতে পেরেছেন, জঙ্গলমহলের নারীদের সঙ্গে বা মণিপুরের মেয়েদের সঙ্গে, ঝুপড়িবাসী নারীদের সঙ্গে তাঁরা সেই একাত্মতা বোধ করতে পারেন না। দিল্লীর রাজপথ মেয়েদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠলে তাঁরা চিন্তিত হন, অনাথ মেয়েদের হোস্টেল বা ইটভাটায় কী হচ্ছে সে নিয়ে তাঁরা ততটা ভাবিত না।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও (কোন্ আন্দোলনেই বা সীমাবদ্ধতা থাকে না!) ধর্ষণ বিরোধী, নারী নির্যাতন বিরোধী এই আন্দোলন এ দেশকে মেয়েদের বাসযোগ্য করে তোলার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ— এতে সন্দেহ নেই। এতে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা ঘটেছে সেটা হলো ধর্ষণ, নারী নির্যাতন পর্দার আড়াল থেকে সামনে এসে গেলো, আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো। নির্যাতিতা নারী ভাবতে পারলেন, তিনি একা নন। কারণ ধর্ষণের মানসিক যন্ত্রণার দিকটির একটা প্রধান দিক হলো নারী একা হয়ে যান। পরিবার ঘটনাটিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, সমাজ পেছনে ফিসফাস করে, পুলিশ কেস নিতে চায় না, বিচারশালায় নারীর 'চরিত্রবিচার' হয়। সব মিলিয়ে তিনি যেন ক্রমাগত ধর্ষিতা হতে থাকেন। মনে হয়, ধর্ষক নয়, তিনিই কাঠগড়ায়।

কাঠগড়ায় ধর্ষিতা নারী!

তবে এটা হলো ঘটনার এক দিক। অন্য দিকে পুরনো নাটকের পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। কেউ বলছেন, এক হাতে কি আর তালি বাজে? মেয়েরা ঠিকঠাক পোষাক পরে না। রাতে বেরোনোরই বা কি দরকার? জিন্স বা পশ্চিমা পোষাক বা ধর্ষিতার চরিত্রের বিরুদ্ধে বলছেন কেউ কেউ। আর এদের মধ্যে আছে ধর্মীয় নেতা, মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ইত্যাদি সবাই।

প্রস্তাব উঠেছে, মেয়েদের কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

কিছু দিন আগে খবরের কাগজে হিন্দী বলয়ের এক কলেজের কথা পড়েছিলাম। কো-এডুকেশন কলেজ, ছাত্রাবাস আছে। মেয়েদের ও ছেলেদের। হোলির সময় ছাত্রদের অসভ্যতা মাত্রা ছাড়ায়, বিশেষ করে ছাত্রীদের উপর নানা ধরনের আক্রমণ। অধ্যক্ষ এর প্রতিরোধে এক ব্যবস্থা নিলেন। ছাত্রীরা ঐ দুদিন হোস্টেল থেকে বেরোবে না। ফলও মিললো। ছাত্রীদের

অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হলেন। সবাই খুশি। কোনো প্রশ্ন উঠলো না। কিন্তু কিছুদিন পরে নতুন অধ্যক্ষ এসে ব্যবস্থাটিকে উল্টে দিলেন। ছাত্রীদের হোস্টেল নয়, ছাত্রদের হোস্টেল থেকে ঐ দুদিন কেউ বেরোতে পারবে না। এতেও কাজ হলো। কাজও হলো, আর ন্যায়বিচারও হলো। মেয়েগুলো তো কোনো দোষ করেনি, তাহলে তাদের কয়েদ করা কেন?

আজ যখন মেয়েদের উপর আক্রমণ করা রুখতে অনেকে বলছেন, মেয়েরা রাতে রাস্তায় বেরোনো ছেড়ে দিক, কী দরকার রাত করে বাড়ি ফেরার, রাতে সিনেমা দেখতে যাওয়ার, তখন আমার ঐ কলেজের কথা মনে পড়ে গেল। বেরোনো যদি বন্ধ করতেই হয়, তাহলে তো মেয়েদের নয়, বরং ছেলেদের বেরোনো বন্ধ করার প্রস্তাব আসতে পারে। না, আমি সেই প্রস্তাব দিচ্ছি না। যারা মেয়েদের আটকে রাখার প্রস্তাব দিচ্ছেন, তাঁদের প্রস্তাবের অন্যায় দিকটাকে দেখানোর চেষ্টা করছি মাত্র।

বাস্তব সমাধান!

ন্যায়-অন্যায়ের কথা না বলে অনেকে বাস্তব সমাধানের পথ হিসাবে মেয়েদের আটকানোর কথা বলেন। এটাও ঠিক নয়। মনে করুন, আপনি কোথাও কাজ করেন, যেখান থেকে বাড়ি ফিরতে আপনার রাত নটা বেজে যায়, কিংবা আপনি একজন গৃহবধূ, অসুস্থ আত্মীয়কে দেখে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতে একদিন আপনার বেশ রাত হয়ে গেল। রাস্তাঘাটে কোনো মেয়ে নেই। বাসে আপনি একমাত্র মহিলা, ট্রেনেও তাই। তাতে আপনি বেশি স্বস্তি বোধ করবেন, নাকি যদি দেখেন ট্রেনে-বাসে অনেক নারী, কনডাক্টর নারী, ড্রাইভারও— তাতে? সত্যি বলতে কী, নারীরা আরও বেশি করে বাইরে এলে তাতেই সামাজিক পরিসরে নারীদের নিরাপত্তা বাড়াবে। আর সামাজিক পরিসরে বেশি নারী আসার অর্থ নারীর ক্ষমতায়ন।

চার দেয়ালের মধ্যে

কিন্তু রেপ বা যৌন নির্যাতন তো শুধু পাবলিক স্পেসে হয় না, অনেকটাই হয় চার দেয়ালের মধ্যে। সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, বেশির ভাগ ধর্ষণই হয় চার দেয়ালের মধ্যে। সাধারণত তা করে থাকে পরিবারের পুরুষ বা পরিবারের ঘনিষ্ঠ পুরুষ। আর শিকার হয় মূলত শিশু বা কিশোরীরা। তাদের ক্ষেত্রে কী বলবেন আমাদের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সেই অভিভাবকরা? সেই শিশুরাও কি বাড়িতে ঐ সময় থেকে ভুল করেছিল, ভুল পোষাক পড়েছিল? নাকি অন্য কোনো অপরাধ তাঁরা আবিষ্কার করবেন ঐ শিশুদের মধ্যে? কিংবা যে শিশুটি পেটের দায়ে অন্য পরিবারে ভৃত্যের কাজ করতে বাধ্য হয়? বোধহয় বলবেন, এদের জন্ম নেওয়াটাই ভুল হয়ে গিয়েছিল।

বোধহয় নয়, এমনটাই বলা হয়ে থাকে। সবসময় সব কথা অবশ্য মুখে বলা হয় না, সাংবাদিক ডেকেও না। কিন্তু সমাজ ধর্ষিতাদের এমন এক বার্তাই দেয়। সব দোষ যেন তারই, দায় তারই।

না বলা এই সব কথা প্রমাণ করা মুশকিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণ বিস্তর। যেমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিশু বা কিশোরীটি কাউকে বলে না তার ওপর বলপ্রয়োগের এই কথা— মাকেও না। আসলে শিশু তার জীবনের এই ক' বছরেই সমাজকে অনেকটা চিনে ফেলেছে। সে কেমন করে যেন জেনে গেছে যে মা এর সমাধান তো করতে পারবেনই না, অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থাও করতে পারবেন না, মাঝখান থেকে হয়ত তাকেই দুষবেন, তার সীমিত চলাফেরা আরও সীমিত হয়ে যাবে। শিশু হয়তো বুঝবে না যে মা এমনটা করবেন তাঁর একান্ত অসহায়ত্বের কারণে। নইলে যে তাঁর সন্তানের দিকে তাকিয়ে হাসবে সমাজ। একঘরে না করলেও এ নিয়ে আলোচনা বেশি হলে কি তাঁর মেয়ের (এবং অন্য মেয়েদেরও) আর বিয়ে হবে!

প্রয়োজন আসলে এই অবস্থার পরিবর্তনের। যাতে একটি শিশুও বুঝতে পারে তার ওপর কোনো অত্যাচার হলে তার প্রতিবিধান হবে। পরিবার, সমাজ তার পক্ষে দাঁড়াবে। তবেই তো সেই শিশু চিৎকার করে বলবে তার কষ্টের কথা। তার এই চিৎকারে সে যদি রক্ষা নাও পায় রক্ষা পেয়ে যাবে অন্য অনেক শিশু— ঐ দানব যাদের শিকার করত ভবিষ্যতে।

শিশুর ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য, সে কথা প্রযোজ্য নারীর ক্ষেত্রেও।

ওরা অভিযোগ করে না কেন!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গল্প, সবাই পড়েছেন, ছিনিয়ে খাই নি কেন? অভুক্ত মানুষ, সামনে দিয়ে প্রচুর খাদ্য পাচার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা ছিনিয়ে খাচ্ছে না। তারপর একদিন তাদের কিছু খাদ্য জুটলো, আর তার পরই তারা খাদ্যভাণ্ডার লুঠ করলো। আসলে খাদ্য যে তারাও পেতে পারে, এই বিশ্বাসটুকু, এই জোরটা, তৈরি হওয়া দরকার, তবেই তারা ছিনিয়ে নেওয়ার বল পাবে। এখানেও খানিকটা সেরকম। তারা সবলা, এই বোধ তৈরি করা দরকার। তারা প্রতিবাদ করতে পারে, প্রতিবাদ করলে তাদের চরিত্র হনন না করে অত্যাচারীর শাস্তি হবে, সমাজ-রাষ্ট্র-পরিজন তাদের পাশে দাঁড়াবে— এই বিশ্বাস গড়ে তোলা দরকার। আর এসবের জন্য দরকার একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন, অন্যদিকে সুষ্ঠু প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা।

ধর্ষিতা নারীর চরিত্র হনন। এটা একটা চালু ব্যাপার। আদালতে উকিল তার চরিত্রে কালি তো ছেটাবেই। তার আগে পুলিশ প্রশ্ন করবে, তার চরিত্র নিয়ে, তার গতিবিধি নিয়ে। আর এ ছাড়াও বৃহত্তর সমাজও প্রশ্ন করবে, কখনো সরাসরি, কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো বন্ধুর বেশে, কখনো কৌতূহল নিবারণের আড়ালে। আর এই প্রশ্নাবলীর পেছনে আছে সেই কথাটি, যেটি

একজন সরাসরিই বলে দিয়েছেন। এক হাতে তো তালি বাজে না! অথচ, কী আশ্চর্য, ধর্ষণের সংজ্ঞাই তো তাই। যেখানে এক পক্ষই ধর্ষণ করেছে, অন্য পক্ষ প্রতিরোধ করেছে। তাই তো তালি বাজে নি। সঙ্গম নয়, হয়েছে ধর্ষণ।

একটা কথা প্রায়ই বলা হয়। ধর্ষণ খুনের চেয়েও বড়ো অপরাধ। একদিক দিয়ে কথাটা সত্যি। এক মহিলা যেমন বললেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুন হয়ত ক্ষমার্হ হতে পারে, তার পেছনে একটা যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে— যেমন আত্মরক্ষার্থে খুন। কিংবা সেই বস্তিবাসী মহিলাদের হাতে অত্যাচারী ধর্ষকের খুনের ঘটনা। কিন্তু কোনো ধর্ষণের পেছনেই এমন কোনো যুক্তি দেখানো যায় না।

কিন্তু সমাজ যখন বলে ধর্ষণ খুনের চেয়েও বড়ো, তার পেছনে আর একটা কথা থাকে। ধর্ষিতা মহিলার জীবন শেষ হয়ে গেছে। তিনি আর পুরোপুরি বেঁচে নেই।

এই ধারণাটার বোধহয় পরিবর্তন দরকার। কোনো রাজনৈতিক কর্মীকে যখন পুলিশ অত্যাচার করে, তাঁর শরীর ও মনের ওপর চরম আঘাত হানে, তারপরও যদি তিনি বেঁচে যান, তিনি জীবন্মৃত হয়ে থাকেন না, পুরোপুরিই বাঁচেন, মাথা উঁচু করে বাঁচেন, তাঁর ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন।। ধর্ষিতা নারী যদি প্রাণে বেঁচে যায় তবে সেও মাথা উঁচু করে বাঁচবে, যদি সমাজ তাকে সম্মান দেয়। তার দেহের আঘাতের চিকিৎসার পাশাপাশি তার মনের আঘাতেরও চিকিৎসা লাগবে, শুশ্রুষা লাগবে। হয়তো সবটা ক্ষত নিরাময়ও হবে না। তা সত্ত্বেও সে পুরোপুরিই বাঁচতে পারে। আমরা যেন না বলি, এর চেয়ে মৃত্যুই ভালো ছিল। বরং তাঁর শুশ্রূষায় সাহায্য করি!

ধর্ষণকে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো বলার মধ্য দিয়ে সমাজ নারীকে দুর্বল করে দেয়। এর পেছনে আছে 'সতীত্বের' ধারণা— যেখানে একটি নারীর মূল্যায়নে তার শরীর ও কৌমার্যই সব চেয়ে বড় কথা। শরীর ও 'সম্মান' রক্ষার তাগিদে নারী বাধ্য হয় নানান বিধিনিষেধ মেনে নিতে। একা বেরোবো না। রাতে বেরোবো না। এই পেশা মেয়েদের জন্য বোধহয় ঠিক হবে না। অবিবাহিত থাকা বিপজ্জনক, তাই না চাইলেও বিয়ে করে ফেলো। এমনি অনেক বিধিনিষেধ। এই ধরনের মূল্যবোধ তাই নারীকে এগোতে দেয় না। আটকে রাখে কখনো বোরখার ঘেরাটোপে, কখনো গৃহবধূর ঘেরাটোপে, কখনো 'ভালো-মেয়ে' হওয়ার ঘেরাটোপে।

ধর্ষণ কি বাড়ছে?

আলোচনায় ঢোকার আগেই হয়তো ধর্ষণ সম্পর্কে কিছু সংখ্যাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন ছিল। ধর্ষণ কি বাড়ছে? কোথায় ধর্ষণ বেশি, কোথায় কম। ধর্ষণ কি পশ্চিমা সভ্যতার অবদান? ধর্ষণ কি গ্রামে বেশি, না শহরে? কারা ধর্ষণ করে? কারা ধর্ষিতা হন? ধর্ষিতারা কি প্রতিকার চান? ইত্যাদি প্রভৃতি।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, এ সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণায় আসা কঠিন। কারণ ধর্ষণ সবচেয়ে আন্ডার-রিপোর্টেড একটি ঘটনা— যত ধর্ষণ হয় তার তুলনায় অনেক কম ধর্ষণ 'কেস' হিসাবে সামনে আসে। বেশির ভাগই ধামাচাপা থাকে, কখনো পরিবারের মধ্যে, কখনো সেই নারী বা শিশুর নিজের কাছেই। তাই কোনো একটি দেশে বা সমাজে ধর্ষণের রিপোর্ট যদি কম হয় তার দুটো ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, সে সমাজে ধর্ষণ কম হচ্ছে (অর্থাৎ সেখানে নারীর নিরাপত্তা বেশি)। আর দুই, সে সমাজে ধর্ষিতারা মুখ খোলেন না (অর্থাৎ সে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন কম, সামাজিক অবস্থা বেশি খারাপ)। একই দেশের বিভিন্ন সময়ের তুলনার ক্ষেত্রেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, সরকারি হিসেবে ধর্ষণের সংখ্যা বাড়তে থাকা সবসময়ে খারাপ নয়। এমন হতেই পারে যে বেশি বেশি সংখ্যায় ধর্ষিতা নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে বলছেন ও প্রতিকার চাইছেন বলেই সরকারি হিসেবে ধর্ষণের সংখ্যা বাড়ছে। সেক্ষেত্রে ধর্ষণ হয়ত বাড়ছে না, কিন্তু ধর্ষিতা নারীরা যখন এগিয়ে আসছেন তখন সমাজের ওপরও বাড়তি দায় এসে যায় এগিয়ে এসে এই নারীদের পাশে দাঁড়ানোর। ধর্ষণের বিরুদ্ধতা করার। সমাজ থেকে এই ক্ষত দূর করার চেষ্টা করার।

এছাড়াও বিভিন্ন দেশের আইনে, বা একই দেশের বিভিন্ন সময়ের আইনে, ধর্ষণের সংজ্ঞা বিভিন্ন হওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশের (এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ের) ধর্ষণের সংখ্যা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা কঠিন হয়। যেমন যে দেশে বিবাহের মধ্যে ধর্ষণকে আইনত ধর্ষণ বলে চিহ্নিত করা হয় এবং বিবাহিত নারী তার প্রতিকার দাবি করে, সে দেশে অংকের হিসাবে ধর্ষণের সংখ্যা বেশি দেখালেও তা নারীর তুলনামূলক খারাপ অবস্থা সূচিত করে না। বিভিন্ন দেশে ধর্ষণের তুলনামূলক হিসেব অংকের হিসাবে দেখতে গেলে তাই বেশ গোল বাধে।

তবে এত গোলমালের মধ্যে যাওয়ার আগে সাধারণভাবে ধর্ষণের ও মেয়েদের ওপর যৌন নির্যাতনের হার কত সে নিয়ে বলা যাক।

ভারতে ধর্ষণের কিছু তথ্য

২০০৭ সালে ভারত সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন— স্টাডি অন চাইল্ড অ্যাবিউস ২০০৭। তাতে বলা হয়, সম্ভবত ভারতের শিশুদের ৫৩ শতাংশের বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার, আর তাদের অনেকেই এই ব্যাপারটি কাউকে বলে না। মাত্র ৬ শতাংশ শিশু এ কথা বড়দের জানায়, আর বাকি ৪৭ শতাংশ মুখ বুজে থাকে।

শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনকারী এই দানবরা কারা? অর্ধেক ক্ষেত্রেই এরা পরিবারের লোক, বা পরিবারের ঘনিষ্ঠ বা এমন লোক যাকে শিশু বিশ্বাস করত।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী,

সেবছর ভারতে ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ২৩,৫৮২। রাজধানী দিল্লী ধর্ষণেরও রাজধানী। সে বছর দিল্লীতে ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৪৫৩, পুরো গুজরাট রাজ্যের চেয়ে বেশি। আগেই বলেছি, আন্ডার-রিপোর্টিংয়ের কারণে রাজ্যে রাজ্যে সংখ্যার বিচারে তুলনা করলে ভুল হতে পারে। তবুও তথ্যের খাতিরে বলি, বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণের সংখ্যার হিসাবে ফারাক বিস্তর। সিকিমে ১৬ থেকে মধ্যপ্রদেশে ৩৪০০। এখানে আরও বলে রাখা দরকার, ধর্ষণের সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে স্থান মধ্যপ্রদেশের পরেই। সংখ্যাটি ২৩৬৩।

২০১১ সালেই টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটা রিপোর্ট অনুসারে নারী নির্যাতনের নিরিখে ভারতবর্ষের অবস্থান অত্যন্ত খারাপ। সেবছর আন্তর্জাতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০ শতাংশ ভারতীয় পুরুষ স্বীকার করেছেন যে তারা কখনো না কখনো কোনো নারীকে জোর করে ভোগ করেছে। ৬টি উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে করা এই সমীক্ষায় ভারত আছে সবার নিচে। বাকি দেশগুলিতে নারী নির্যাতনকারী পুরুষদের সংখ্যা ৯ শতাংশের কম। ব্রাজিলে তা ২ শতাংশ। শুধু তাই নয়, এই সমীক্ষা অনুযায়ী ৬৫ শতাংশের বেশি ভারতীয় পুরুষ মনে করে, পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারীদের উচিত মারধোর খেয়ে মুখ বুজে থাকা। তারা মনে করে, কখনো কখনো নারীরা এমন কাজ করে যাতে মার খাওয়াই উচিত।

এমন নয় যে ভারতীয় পুরুষরা এমনিতেই বেশি উগ্র প্রকৃতির। ঐ সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাড়ির বাইরে তাদের অন্যরকম মূর্তি। অন্য দেশগুলোর তুলনায় কম সংখ্যকই পুরুষই বাড়ির বাইরে ডাকাতি, অস্ত্র হাতে মারামারি মতো ঘটনায় জড়ায়। (এখানে বলা ভালো, সমীক্ষা যাদের ওপর করা হয়েছিল তাদের বেশির ভাগই দিল্লী এলাকার)।

আগেই বলেছি, ধর্ষণের সব ঘটনা রিপোর্ট করা হয় না। তার পরিমাণ কত সেটা অনুমান করাও কঠিন। তবে এটা বলা যেতে পারে যে সংখ্যাটা খুব কম হবে না। কারণ, এর আগেই দেখেছি যে শিশুরা বেশিরভাগই যৌন নির্যাতনের কথা কাউকে বলে না, মাত্র ৬ শতাংশ বলে। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বের দেশ ইংলন্ডের সরকারি রিপোর্টও বলছে, ৭৫ থেকে ৯৫ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয় না। ফলে এমনটা অনুমান করলে ভুল হবে না যে ভারতের মতো দেশে এই হার আরো কম হবে। অর্থাৎ যে সব ধর্ষণের কথা আমরা জানতে পারি তা হিমশৈলের দৃশ্যমান অংশটুকু মাত্র।

ধর্ষণ: নানা দেশে

বিভিন্ন দেশের হিসেব নিয়ে সমস্যার কথা আগেই বলেছি। এবার বিভিন্ন দেশের ধর্ষণের রিপোর্ট কেমন দেখা যাক। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুসারে, ইজিপ্টে ১ লক্ষ জনসংখ্যায় ০ থেকে ০.১, জাপান, কানাডা, ভারত, কাতার, সংযুক্ত আমিরশাহীতে ১ থেকে ২, পশ্চিম ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে ১০ থেকে ২৫-এর মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৫-৩০। তবে এর থেকে বিভিন্ন দেশে ধর্ষণের প্রকৃত চিত্রের আভাস বিশেষ পাওয়া যাবে না। বরং ধর্ষণের আন্ডার-রিপোর্টিং কোন্ দেশে কত বেশি, সেটাই বোঝার সুবিধা হয়।

উপসংহার

এসব আলোচনার মধ্যে তো ধরাই হলো না সেই শিশুদের, যাদের বেশ্যাবৃত্তিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যৌবন আসার আগেই। কখনও কিডন্যাপ করে নিয়ে এসে, কখনো আবার পরিবারের লোকের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে 'কিনে' এনে। সেগুলো নাকি 'স্বেচ্ছায়' যৌন সংসর্গ!

আর একটা কথা বলে শেষ করবো। ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন শুধু ধর্ষিতা নারীর ওপরই অত্যাচার নয়। এরকম প্রতিটি ঘটনা সমস্ত নারীর পায়ে আর একটি করে বেড়ি পড়িয়ে দেয়। এখানে যাবি না, জিনস পরবি না বা বোরখা পরবি, যত কাপুরুষই হোক একটি পুংলিঙ্গের মানবসন্তান ছাড়া রাস্তা চলবি না— শহরগ্রামের রাস্তাই হোক, বা জীবনের রাস্তা। এই বেড়ি খোলার লড়াই তাই নারীর ক্ষমতায়নের লড়াই, অর্ধেক মানবজাতির, মানুষ হয়ে ওঠার পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াই।

আক্রান্ত নারীসমাজ....

৭৮ পৃষ্ঠার পর

ঘৃণার প্রকাশ, ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি উপায় মাত্র— এই মূল সত্যটা সকলেই আড়াল করতে চাইছেন।

একটি সংবেদনশীল নির্বাচিত সরকারের পক্ষে যেভাবে এই জনজাগরণের সামনাসামনি হয়ে বক্তব্য শুনে দায়িত্বপূর্ণভাবে আলাপ আলোচনা চালানো উচিত ছিল এই সরকার সম্পূর্ণ তার বিপরীত পথে হেঁটেছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর মধ্যে এই মৌলিক বিষয়টি অনুপস্থিত। কোন মন্ত্রী বা শাসকদলের কোনো নেতা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মতো শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে পারে নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকাও আগাগোড়াই অত্যন্ত নিন্দাজনক থেকে গেছে আন্দোলনের গোটা পর্যায় জুড়ে।

গত তিন দশকে ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল পুলিশি হেফাজতে মথুরা ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয়টি মণিপুরে থাংজম মনোরমার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর। তৃতীয় পর্যায়ে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক হিংসার বিষয়টি এই প্রথম অত্যন্ত জোরালোভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।

কৃতজ্ঞতা : শাশ্বতী ঘোষ, নবারুণ ভট্টাচার্য, অনিমেষ চক্রবর্তী ও কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যারা দিল্লীর ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার রাস্তায় সোচ্চার হয়েছিলেন।

সূত্র: এমএল আপডেট, ১ ও ৮ জানুয়ারি ২০১৩

আক্রান্ত নারী

বামপন্থী দৃষ্টিকোণে ধর্ষণ ও যৌন আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন

সোমা মারিক

ধর্ষণের বিরুদ্ধে বর্তমান আন্দোলন

ইতিহাসবিদ হিসাবে জানি যে বিভিন্ন কাজকর্মের যে ফল হয় প্রায়ই সেটা আকাChIত ফল হয় না। ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে এই জন্য নয় যে গভীর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তার বাস্তবায়ন হয়েছে, বরং তা ঘটে নানা ঘটনাপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে। আজও তাই। আমাদের প্রজন্মের সমাজকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ নিয়ে প্রচার আন্দোলন করছেন। ধর্ষণ নিয়ে আইন ও দৃষ্টিভঙ্গির বদল এবং অন্যান্য নানা দাবি করে আসছেন তাঁরা। কিন্তু আমাদের সেই বারংবারের প্রচার আন্দোলন নয়, ইরম শর্মিলার এক দশকব্যাপী মহাকাব্য সুলভ প্রতিবাদ নয়, সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিল একটিমাত্র ঘটনা। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে বাসে ধর্ষণের ঘটনা। আমরা জানি, বিরাট সংখ্যক মানুষ বাইরে বেরিয়ে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন, সরকারের তরফ থেকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করেছেন। বারবার এবং অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা। ফলে আজ আমাদের প্রয়োজন:

এই ভয়ানক ক্রোধ কেন আর আমরা তার সঙ্গে সম্পর্কিত হবো কেমনভাবে, সেটা বোঝা। এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার কারণ আছে— কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নারীবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি আর চলমান আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি এক হয় না।

আমাদের ভাবতে হবে, নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, এখান থেকে আমরা কোথায় যাব? আমাদের দীর্ঘকালীন দাবিগুলি কী হবে?

আলোচনা করতে হবে, কোন পথে আন্দোলনের বিকাশ ঘটানো যায়।

এই ক্রোধ ভারতের জনতার ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার ফল। এই জনতার মধ্যে শুধু শোষিতরা নয়, ভালো থাকা মধ্যবিত্তরাও আছে— ইউপিএ, এনডিএ, যুক্তফ্রন্ট— এদেশের সব জমানাই যাদের সুযোগসুবিধার দিকে ভালোমতন নজর দিয়েছে। এই ক্রোধ, এই প্রত্যাখ্যান এর আগে আন্না হাজারের প্রতি সমর্থনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। এ কথার মধ্য দিয়ে আমি অবশ্য আন্না হাজারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করছি না। আমি এটা দেখাচ্ছি যে তিনি যে জন-সমর্থন পেয়েছিলেন তার কারণ তাঁকে মনে হয়েছিল মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলির ক্রমাগত দুর্নীতি, অপরাধমূলক কার্যকলাপ ও হিংসার একটা বিকল্প। তাঁর নিজের প্রবণতা যাই হোক— যেটা ছিল বেশ কর্তৃত্ববাদী— তাঁর পিছনে যে সামাজিক ভিত্তি ছিল, তাঁর আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লেও সেই সামাজিক ভিত্তি শেষ হয়ে যায় নি।

আর এর অর্থ হলো, আমরা যখন ধর্ষণ ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব তখন শুধু আইন নয়, আমাদের আলোচনা করতে হবে রাজনীতি নিয়ে। ধর্ষণের রাজনীতির দুটি বিশিষ্ট মাত্রা আছে। একটা পার্টি স্তরে, আর একটা গভীরতর সামাজিক স্তরে। সব পার্টি আর তাদের মুখপাত্ররা, তাদের তাত্ত্বিক, মতাদর্শগত গুরুরা বুঝতে চেষ্টা করছে বর্তমান সংকটকে তারা কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে তাদের কাজে লাগাতে পারে। যেহেতু দিল্লী আর কেন্দ্র, দুজায়গাতেই কংগ্রেস ক্ষমতাসীন, তাদের খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তারা শান্তির জন্য চেষ্টা করছে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, ফোলা ফোলা চোখের সোনিয়া গান্ধিকে টিভি-তে হাজির করছে (দেখো, এই ট্র্যাজেডিতে উনিও কাঁদছিলেন)— মনমোহন সিং অবশ্য এতে বাদ সেধেছেন— টিভির ক্যামেরা তখনও চলছে সেটা না বুঝে তিনি পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন— সব ঠিক তো?

সংঘ পরিবার তো অবশ্যই এই ইস্যু থেকে সুবিধা লুঠতে চেষ্টা করছে। এটা করা হয়েছে বিভিন্ন কণ্ঠে। এর মাধ্যমে তারা জনগণের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন। সরসংঘচালক বলেছেন, ইন্ডিয়ায় ধর্ষণ হয়, ভারতে হয় না। ''আমাদের ঐতিহ্যে'' ফিরে চলো, তাহলে আর ধর্ষণ হবে না। অন্যদিকে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মতাদর্শগত তাত্ত্বিক স্বপন দাশগুপ্ত, যিনি পশ্চিমা বিশ্লেষণের ধরন ব্যবহার করেন, তিনি বলেছেন যে উদারীকরণের ফলে আত্মবিশ্বাসী এক নবীন ভারতের উদ্ভব হয়েছে যারা দাবি করে, ভিক্ষা চায় না। নরেন্দ্র মোদিই কেবল এদের রোল মডেল হতে পারেন, কারণ তিনিও প্রতিষ্ঠানবিরোধী।

ধর্ষকদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের দাবি উঠেছে। ২০০২ সালে আদবানি এই দাবি তুলেছিলেন, তবে শুধু বিশেষ বিশেষ ধর্ষণের ক্ষেত্রে। তার অনেক আগেই সাভারকার বলেছিলেন, মুসলিমদের সঠিক শিক্ষা দিতে মুসলিম নারীদের বড় সংখ্যায় ধর্ষণ করা দরকার। গুজরাটে এর প্রয়োগ হয়েছে। ২০০২ সালেরও আগে সুরাটে (১৯৯২) হিন্দুত্ববাদীরা শুধু যে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করেছিল তাই নয়, তারা সেটার ভিডিও করেছিল। এক দশক পরে নরেন্দ্র মোদি যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন করা হয়েছে ধর্ষণ, যৌন হিংসা ও খুন। ঐ গণহিংসার পেছনে মাথা হিসাবে কাজ করেছিলেন যে বাবু বজরঙ্গী, মায়া কোদনানি, তারা আজ দোষী প্রমাণিত। আর মোদিই ঐ গণহিংসার কাণ্ডের পর কোদনানিকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন।

যখন বলা হয় শুধু মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রচার করতে, বা শুধু আইনের পরিবর্তনের উপর জোর দিতে, তখন আসলে অন্য

কতগুলি মাত্রা ভুলে যেতে বলা হয়। কাদের আমরা আইন পাল্টাতে বলছি? সেই পার্টিগুলিকে, যারা গণহিংসা ও ধর্ষণকে সমর্থন করেছে। সেই সব পার্টিকে, যারা শুধু যে অপরাধীদের আশ্রয় দেয় তাই নয়, তারা অপরাধী তৈরি করেছে, তাদের মধ্যে এমন অপরাধীরাও আছে যাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন উৎপীড়নের অভিযোগ আছে— যারা এমএলএ, এমপি ও মন্ত্রী।

জাতি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্ষণ, হেফাজতে ধর্ষণ

কংগ্রেস ভোট বাঁচাতে ব্যস্ত, বিজেপি নতুন ভোট যোগাড়ে ব্যস্ত— তার বাইরেও আরো অনেক রাজনীতি এতে জড়িত। শ্রেণী, জাত ও লিঙ্গ জটিল সম্পর্কে জড়িত। অরুন্ধতী রায় দেখিয়েছেন, ধর্ষণ ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ। পুলিশ গ্রাম আক্রমণ ক'রে গণধর্ষণ চালায়। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের আক্রমণ করে আর আক্রমণের অংশ হিসাবে দলিত নারীদের ধর্ষণ করে। এখানে আমরা কিছু চিত্র দেখবো যেগুলি আমাদের মন থেকে মোছা যায় না।

আসাম রাইফেলস্-এর লোকদের হাতে মণিপুরের থাংজাম মনোরমার ধর্ষণ (২০০৪)। এই অপরাধের জন্য কারোর সাজা হয়নি। অপরাধীদের আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে— যে যে এলাকায় এই আইন বলবৎ আছে সেখানে সামরিক বাহিনীর লোকদের দেশের সাধারণ আইনের আওতায় বিচার করা যাবে না।

সোপিয়ান ধর্ষণ ও নিলুফার ও আসিয়া হত্যা (কাশ্মীর ২০০৯। সেটা ধামাচাপা দেওয়া হয়, ধর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করা হয়। জোরদার সংগ্রাম আন্দোলন চললেও কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় নি।

২০১১ সালে আদিবাসী সামাজিক আন্দোলনের কর্মী সোনি সোরি-কে সিপিআই(মাওবাদী) হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁকে বিবস্ত্র করা হয়েছে, তাঁর যোনিপথে ও গুহ্যদ্বারে পাথর ঢোকানো হয়েছে। দান্তেওয়ারার এসপি অঙ্কিত গর্গ, যিনি এসব করার আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে গত বছর ২৬ জানুয়ারি সাহসিকতার জন্য পুলিশ মেডেল দেওয়া হয়েছে। সোনি সোরি এখনো রাইপুর জেলে, সেই একই পুলিশ বাহিনীর হাতে।

ধর্ষণ সাম্প্রদায়িকতার অংশ। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু পরবর্তী শিখ-বিরোধী দাঙ্গার সময় যে হিংসা চলে, তাতে শিখ নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছিল। তাতে প্রধান অভিযুক্তদের মধ্যে আছে জগদীশ টিটলার, এইচ কে এল ভগত, সজ্জন কুমার ও অন্য কংগ্রেস নেতারা। আরএসএস ও তাদের বিভিন্ন সংগঠন জাল, সংঘ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হাতে অনেক মুসলিম বিরোধী, ক্রিশ্চান বিরোধী সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হয়েছে। সেগুলির মধ্যে আছে সুরাট ১৯৯২, যেখানে ধর্ষণের ঘটনা ভিডিও করে দেখানো হয়েছে। আছে গুজরাট ২০০২, যেখানে বিরাট সংখ্যায় ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছিল।

উচ্চবর্ণ ও মধ্য বর্ণের লোকদের হাতে দলিত নারী ধর্ষণ। এর মধ্যে পড়ছে খাইরলানজি ধর্ষণ ও গণহত্যা (২০০৬)

দিল্লীতে যে প্রতিবাদ হয়েছে তা সঠিক। অরুন্ধতী রায় অন্য রকম বলেছেন, কিন্তু, দ্য হিন্দু-তে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী নিহত মেয়েটি দিল্লীতে কাজ করলেও আসলে এসেছিল গ্রাম থেকে। তার রোজগার যা ছিল তাতে তাকে মধ্যবিত্তও বলা যায় না। তাই মধ্যবিত্ত নারীদের বড় উপস্থিতি ছিল বলে যে 'বাম' যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে, এই প্রতিবাদ মধ্যবিত্ত প্রতিবাদ, তাকে প্রশ্ন করা চলে। মধ্যবিত্ত শব্দটি এমনিতেই অনির্দিষ্ট। শহরের কারখানার বাইরে অন্যত্র যারা চাকরি করে তাদের নিজেদের মধ্যবিত্ত ভাবার পক্ষে একটা মতাদর্শগত চাপ দেওয়া হয় শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে। মার্কসবাদী শ্রেণীগত ধারণা নয়, জামাকাপড়, 'সংস্কৃতি' ও অন্যান্য বিষয় এখানে কাজ করে। তাই শাসক শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ পুরনো পেটি বুর্জোয়া, পেশাজীবী ও ম্যানেজাররা ও সমস্ত চাকরিজীবীদের এই মধ্যবিত্তদের মধ্যে ধরে নেওয়া হয়। এই প্রতিবাদ মধ্যবিত্ত প্রতিবাদ বলে একে প্রান্তিক করে দেওয়ার চেষ্টা করলে কংগ্রেস(আই) নেতাদের জায়গায় পৌঁছে যেতে হবে যে এই প্রতিবাদীকারীদের কোনো বাস্তববোধ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু একটা বিষয়ে অরুন্ধতী রায় ও অন্যরা যা বলেছেন সেটা গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। এক্ষেত্রে ধর্ষকরা নিচু শ্রেণীর লোক, আর তা ঘটেছে দক্ষিণ দিল্লীতে। এ কথার মধ্যে দিয়ে আমি এমন বলতে চাইছি না যে ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি এই বিষয়টি তুলছি, কারণ দলিত নারীরা, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী নারী ইত্যাদিরা যখন ধর্ষিত হন তখন এমন সোরগোল তোলা হয় না। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রম বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নারী সমাজকর্মীরা ভালোই জানেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে ইটভাটায়) নারী শ্রমিকদের কাজ পেতে হলে, কাজ বজায় রাখতে হলে কনট্রাক্টর ও ওভারসিয়ারদের যৌন পরিষেবা দিতে হয়। এমনকি বর্তমান সংজ্ঞায়ও যেহেতু ধর্ষণ বলতে বোঝানো হয়েছে চাপ দিয়ে যৌনমিলন, এগুলিও তাই ধর্ষণই, তবে এগুলো কখনোও অভিযোগ হিসাবে আসে না। আমরা, নারী আন্দোলনের কর্মীরা, এমন মিটিং মিছিল দেখতে অভ্যস্ত যেখানে একশো জনের উপস্থিতি হলেই তা ভালো উপস্থিতি বলে ধরে নিতে হয়। তাই এই বিষয়টি নিয়ে যারা রাস্তায় নেমেছিলেন তাদের আমি দোষ দেবো না। আমি শুধু বলতে চাই যে আমরা যদি প্রতিটি ঘটনায় মুখ না খুলি তবে একটা শ্রেণীগত/জাতিগত/ সম্প্রদায়গত পক্ষপাত এসেই যাবে। আর, আমরা যদি ধর্ষণের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন না হই, তাহলে বুঝতে পারব না কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি কেন ধর্ষণের জন্য প্রাণদণ্ড চাইছে— তবে খুব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ষকের গায়ে থাকে খাকি উর্দি। সৈন্যদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য

আছে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট, পুলিশকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়— এদের বাঁচানো চাই। এই ধরনের কেস হাতে নিলে আমরা কয়েকজন মাত্র অপরাধী বা বিকৃতকামদের ছাড়িয়ে যাই, রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমতাবান এলিটদের হাতে নারী শরীরকে ব্যবহার করা হিসাবে দেখতে পাই ধর্ষণকে।

আগে অংশগ্রহণ, পরে সমালোচনা

কিন্তু সমালোচনামূলক উক্তি কখন করা যাবে সেটা বোঝা জরুরি। আমরা যা দেখলাম সেটা জনগণের ক্রোধের বিরাট প্রকাশ, সরকারের নেতিবাচক ঔদাসীন্যর বিরুদ্ধতা। এই আন্দোলনের অংশ হতে হবে আমাদের, রাস্তায় নামতে হবে, প্রধানত তরুণতরুণী যারা রাস্তায় নেমেছে, তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তারপরই কেবল আমাদের সমালোচনার অর্থ তাদের বোধগম্য হতে পারে। অন্যভাবে বললে, আমাদের প্রথম কাজ হলো আন্দোলন গড়ার কাজটা চালিয়ে যাওয়া। সমস্ত গতানুগতিকতাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কর্তৃপক্ষ ধর্ষণের বিষয়টা দেখছেন, ধর্ষকদের শাস্তির ব্যবস্থা করছেন, আমরা তাই এখন বাড়ি ফিরে যেতে পারি— এধরনের লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

একবার, দুবার, তিনবার যখন আমরা রাস্তায় নামবো, তারপর আমরা প্রশ্ন করবো, এর পর কী? আর তখনই উঠবে তত্ত্বের প্রশ্ন, রণনীতি ও রণকৌশলের প্রশ্ন।

এরপর কী কী বাস্তব দাবি রাখা দরকার, সে প্রশ্নটি করার জন্য আমাদের শুরু করতে হবে ভারতে ধর্ষণ ও যৌন আক্রমণের সমগ্র চিত্র থেকে, এবং আইন ও প্রশাসনে তার প্রতিচ্ছবি কীরকম, তা থেকে।

২০১০ সালে ২২ হাজারের বেশি ধর্ষণ ঘটেছিল। ২০১১ সালে সংখ্যাটা ২৪ হাজারের বেশি। কিন্তু এগুলো হচ্ছে নথিভুক্ত ধর্ষণের সংখ্যা। এর চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ধর্ষণ অ-নথিভুক্ত। আইনি বিশেষজ্ঞরা বলেন যে অনেক ধর্ষণেরই কোনো রিপোর্ট করা হয় না। অনেক অভিযোগ করা হয় না বা অভিযোগ তুলে নেওয়া হয় ''পরিবারের সম্মানের'' কারণে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ অভিযোগটি ঠিকমতো নেয় না। ডাক্তারি পরীক্ষাও অনেক সময় নথিভুক্ত হয় না, যার ফলে বর্তমান আইনে অপরাধীর শাস্তি হয় না। আর শেষত, বর্তমান আইনগুলি অনেক বিষয়কে প্রান্তিক করে রেখেছে। আইন হলো সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি। আমাদের সমাজে তিন ধরনের স্তরবিভাজনের প্রভাব গভীর— শ্রেণীগত, লিঙ্গগত, জাতপাত-গত ও সম্প্রদায়গত। আর এগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করে। ধর্ষণকে দেখা হয় সম্মান, সতীত্ব ও মর্যাদা হানি হিসাবে। এটাকে নারীর ওপর হিংস্র আক্রমণ হিসাবে দেখা হয় না। ফলে, ধর্ষণের সংজ্ঞা এমনভাবে নিরূপণ করা হয় যাতে লিঙ্গ-যোনির যৌন মিলন না হলে নারীর অন্যান্য যৌন অঙ্গে যে আক্রমণই হোক না কেন, তাকে ধর্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় না। তার ওপর আবার বিবাহের মধ্যে কোনো ধর্ষণ হয় না বলে মনে করা হয়। অন্য কথায়, কোনো নারীর যোনিপথে যদি পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেমনটা হয়েছে সোনি সোরির ক্ষেত্রে, তাতে ধর্ষণের অভিযোগ আনা যাবে না। বর্তমান আইনের আওতায় বড় জোর যৌন লাঞ্ছনার অভিযোগ আনা যাবে।

তাঁকে তাঁর কথা অনুযায়ী তাঁকে বিবস্ত্র করা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান আইন অনুসারে সেটাকে শুধু বলা যাবে ''নারীর শালীনতার উপর আঘাত''। আর দান্তেওয়ারার তৎকালীন পুলিশ সুপার অঙ্কিত গর্গ, যাকে বীরত্বের জন্য পুলিশ মেডেল দেওয়া হয়েছে, তাকে যদি এইসব অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়াও হয়, কী শাস্তি দেওয়া হবে? আইন অনুসারে, লাঞ্ছনা ও নারীর লজ্জার ওপর আঘাতের জন্য নিম্নলিখিত শাস্তি দেওয়া যায়:

> ভারতীয় অপরাধ আইনের ৫০৯ নং ধারা— অপরাধী যদি কোনো কথা বা শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি বা কিছু প্রদর্শনের মাধ্যমে নারীর লাঞ্ছনা করে— আর তা করে এমনভাবে যাতে সেই শব্দ নারীর শ্রুতিগোচর হয় বা ঐ অঙ্গভঙ্গি বা প্রদর্শিত বস্তু নারীর দৃষ্টিগোচর হয়, বা নারীর প্রাইভেসিতে আঘাত করে, তাতে এক বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে, তার সাথে জরিমানাও হতে পারে।
>
> ভারতীয় অপরাধ আইনের ৩৫৪ ধারায় নারীর লাঞ্ছনার উদ্দেশে নারীর ওপর আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই অপরাধকে ধর্ষণের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়। শাস্তি: দু বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা বা দুটোই।
>
> ভারতীয় অপরাধ আইনের ৩২৩ নং ধারায় ইচ্ছাকৃত আঘাতের (নন-কগনিজিব্‌ল) জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি: এক বছর পর্যন্ত জেল বা ১০০০ টাকা জরিমানা বা দুই-ই।

তাহলে দেখা গেল, সর্বোচ্চ চার বছরের জেল হতে পারে, আর হতে পারে অনির্দিষ্ট অংকের জরিমানা।

বাস্তবে কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হলেও, জরিমানা ছাড়া কিছু হবে বলে মনে হয় না।

এবার অন্য কিছু বিষয়ে আসা যাক, যেখানে শ্রেণী, জাতপাত ও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানে যেসব আইনি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখানে নারীর শালীনতা নিয়ে আলোচনা করছি, নারীর লাঞ্ছনা নিয়ে আলোচনা করছি। কোনো একটি স্তরবিভক্ত সমাজে পিতৃতন্ত্র সমাজের সব নারীর ওপর সমান আঘাত হানে না। রাজস্থানের সাথিন ভানওয়ারি দেবী ছিলেন নিচু জাতের, কুমোর। তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছিল, কারণ তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচার চালাচ্ছিলেন। আমি তাঁর মামলার বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না। কিন্তু তাঁর মামলাটি থেকে পুলিশের

ও ম্যাজিস্ট্রেটের সংবেদনশীলতার অভাব দেখা গেছে, আদালতের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে। জেলা সেসন্স বিচারক বললেন— উচ্চবর্ণের পুরুষরা দলিতকে ধর্ষণ করে না!!! রাজ্য সরকারিভাবে হাইকোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু ঘটনার ১৫ বছর পর, ২০০৭ সাল অবধি হাইকোর্টে মাত্র একটি শুনানি হয়েছে।

এই ডিসেম্বরে আর একটি মামলার রায়ে দিল্লীর জেলা বিচারপতি জে আর আরিয়ান বললেন, "ভারতীয় অপরাধ আইনে বিবাহের মধ্যে ধর্ষণ বলে কিছু হয় না। অভিযোগকারী যদি অভিযুক্তের আইনি স্ত্রী হয়, তাহলে অভিযোগকারীর সঙ্গে অভিযুক্তের যৌনমিলন জোর করে বা স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তা ধর্ষণ হবে না।" সহজ করে বললে, বিবাহের পর স্বামীর ক্ষেত্রে নারীর নিজের শরীরের ওপর কোনো অধিকার থাকে না। স্বামী যখন ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা, তার শরীর ভোগ করতে পারে।

ধর্ষণের শিকার যারা তাদের কোনও স্তরবিভাগ করা যায় না, যাতে বলা যায় যে দলিত নারী বা শ্রমজীবী নারীদের ধর্ষণ মধ্যবিত্ত নারীদের ধর্ষণের চেয়ে বেশি ঘৃণ্য, কিন্তু দিল্লীর এই ঘটনা দেখিয়ে দিল যে অন্য স্তরবিভাজন আছে। হাজার হাজার (শুধু দিল্লীতেই ২০১২ সালে ৫৭২টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে) ঘটনার মধ্য থেকে একটি ঘটনাকে আলাদা করে বেছে নিয়ে সংবাদমাধ্যম ও মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলি সচেতনভাবে নিয়মিত ঘটনা হিসাবে যে ধর্ষণ ঘটে তা থেকে নজর সরাতে চেয়েছে। আমাদের দাবিগুলিকে, আমাদের আন্দোলনকে এগুলির কথা মাথায় রাখতে হবে।

ন্যায়বিচার ও সামাজিক শৃঙ্খলা

যে বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিকদের মাথা গলানো দরকার তা হলো প্রতিশোধ, অপরাধীর ফাঁসি বা ক্লীবকরণ নিয়ে আলোচনা থেকে নজর সরিয়ে ঘটনার শিকার নারীর দিকে নজর ফেরানো, ধর্ষণের কারণ অনুসন্ধানের দিকে নজর ফেরানো। প্রথমত, আমাদের দেখতে হবে কোন্ ধরনের সমাজে আমরা বাস করি, যে সমাজ ক্রমাগত ধর্ষক তৈরি করে। অপরাধের শাস্তি দাবি করাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন আমরা ব্যক্তি অপরাধী ও তাদের শাস্তির কথা বলি, বরখা দত্ত ও অর্ণব গোস্বামীদের সামনে আনা ঘটনাগুলিতে থাকে নিচু শ্রেণীর ধর্ষকদের হাতে ব্যক্তি নারীর ঘর্ষণের ঘটনা— এতে পুরো চিত্রটা দেখা হয় না। এর অর্থ, একদিকে এইসব লোক কেন হিংসার দিকে যায় সেটা বের করার চেষ্টা করছি না, আর অন্য দিকে এর অর্থ এই যে রাষ্ট্র বা ক্ষমতাবান সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সৃষ্ট, তাদের হাতে পরিপুষ্ট, পরিচালিত ধর্ষণের ঘটনা আমরা আড়াল করছি। এর সবচেয়ে পরিষ্কার প্রমাণ হয়তো পাওয়া যাবে সম্প্রতিকালে সংবাদমাধ্যমের নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থনের মধ্যে— মায়া কোদনানি ও বাবু বজরঙ্গিকে যে আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে তা অগ্রাহ্য করা হয়। গুজরাটে ধর্ষণে কিছু যায় আসে না, কারণ নরেন্দ্র মোদি পরপর তিনবার নির্বাচনে জিতেছে আর মোট জাতীয় আয় বেড়েছে।

ধর্ষিতা নারীদের পক্ষে প্রচার চালানো, আঘাতকে অতিক্রম করতে তাদের সাহায্য করাটাও দরকার। আমরা যখন ন্যায়বিচারের কথা বলি তখন তাই আমাদের প্রথমে জোর দিতে হবে নারীটি যাতে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারেন সেই ন্যায়বিচারের ওপর, আর দ্বিতীয়ত জোর দিতে হবে ধর্ষণের সামাজিক কারণগুলিকে পাল্টানোর উপর। শুধু শাস্তির মাধ্যমে ন্যায়বিচার নয়, অনেক ধর্ষকদের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র দীর্ঘ বন্দীদশা দেখে প্রীত হওয়া নয়।

শেষত, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে বামপন্থী সমাজকর্মীদের নিজেদের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে জড়িত হওয়া উচিত। এর ওপর জোর দেওয়া উচিত যে শোষিতদের মধ্যেও ধর্ষণ ও যৌন উত্যক্ত করার ঘটনা হওয়া চলবে না। আমরা যদি কোনও ধর্ষণকেই ছাড় দিতে না চাই আর পাশাপাশি শোষিতদের ব্যাপকতম শ্রেণী-ঐক্য চাই, সেক্ষেত্রে শোষিতদের মধ্যে আমাদের প্রচারকে নিয়ে যেতে হবে। শাসক শ্রেণী পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বললে শুধু চলবে না, পিতৃতন্ত্র কেমন করে শ্রমজীবী মানুষকেও প্রভাবিত করে সেটার ওপর জোর দিতে হবে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। বামপন্থীদের একটা বড় অংশ একসময় যেমন করত সেইরকম এই কাজগুলি করতে অস্বীকার করলে, নারীবাদী অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারস্যাপার বলে এগুলিকে অবহেলা করলে শোষিতদের মধ্যে পিতৃতন্ত্র থেকে যাবে ও পুনরুজ্জীবিত হবে।

ধর্ষণের উপর দক্ষিণপন্থী ডিসকোর্স

আমরা যখন প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনাকে আলাদাভাবে দেখি, সতীত্বহানি ও মর্যাদাহানির ওপর জোর দিই, তখন রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রায়ই নজর থেকে সরে যায়। দিল্লীর ধর্ষণের ঘটনা ও গণরোষের কারণটাই ধরা যাক। ধর্ষণটি ঘটেছিল একটি বাসের ভেতর। ছজনের একটি দল বাসটির দখল নিয়েছিল। পুলিশ ঠিক কী করছিল? গণ পরিবহনের একটি গাড়ি যখন বলা যায় হাইজ্যাক করা হলো পুলিশ তখন কী করছিল? তাদের এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য হাতগুলিকে বরং দেখা গেল গণ-প্রতিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। জলকামানের ব্যবহারের কথাই শুধু বলছি না। দিল্লীর একটা প্রধান এলাকা বন্ধ করে দেওয়া হলো। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে মেট্রোতে যাওয়া যাচ্ছিল না। এ সবই করা হলো সুরক্ষার নামে। কাদের সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছিল? সাধারণ নাগরিকের তো নয়— মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে নারী তারও নয়, তাঁর গুরুতর আহত বন্ধুটিরও নয়।

ধর্ষণ থেকে যৌন আক্রমণের আইনের পরিবর্তনের দাবিটা ব্যাখ্যা করা সবচেয়ে সোজা আর তা করা সবচেয়ে কঠিন। ইতিমধ্যে যেসব ঘটনার কথা বলেছি এবং নকশাল বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসবাদী বা মাওবাদী বলে অভিযুক্ত

তরুণীর যোনিপথে লাঠি বা অন্য জিনিস ঢোকানো ইত্যাদি যে সব ঘটনার কথা আমরা জানি সেগুলির ভিত্তিতে বলা যায় যে আমরা যদি এগুলির জন্য যথেষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে ন্যায়বিচার হবে না। কিন্তু তা করা কঠিন, কারণ সমাজের মানসিকতাই গভীরভাবে পুরুষতান্ত্রিক। ধর্ষিতা হলে ধরে নেওয়া হয় যে তা মৃত্যুর চেয়েও বড়ো দুর্ভাগ্য।

যে নারী ইতিমধ্যেই বিয়ের আগে বা বিবাহের বাইরে সতীত্ব ও মর্যাদা ''হারিয়েছে'', তার ক্ষেত্রে ক্ষতি খুব বেশি হয়েছে বলে মনে করা হয় না আর তাই সেক্ষেত্রে অপরাধীকে খুব বেশি শাস্তি দেওয়ার দরকার নেই বলে মনে করা হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিবাদী পক্ষের উকিলরা অভিযোগকারীর পুরনো যৌন ইতিহাস তুলে ধরে তার সাক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলত। এটা বন্ধ করতে ২০০৩ সালে ভারতের সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তন করা হয়। অভিযুক্ত দোষী কিনা তা স্থির করার সময় এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়লেও শাস্তিবিধানের সময় এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে না। ধর্ষণের মামলায় শাস্তিবিধানের সময় কিছু স্টিরিওটাইপের বিরূপ প্রভাব পড়ে। যেখানে নারীর ব্যবহার সেই স্টিরিওটাইপের সঙ্গে মেলে না, সেখানে ধর্ষক কম শাস্তি পায়।

যৌন আক্রমণ, এই ধারণাটি তৈরি হলে এবং শাস্তির জন্য পরিষ্কার গাইডলাইন তৈরি হলে ধর্ষক সামাজিক ভাবে উন্নত অবস্থায় থাকলেও বা ধর্ষিতা স্টিরিওটাইপের সঙ্গে না মিললেও ধর্ষক/আক্রমণকারীদের ছেড়ে দেওয়া কঠিন হবে। পার্ক স্ট্রীট ধর্ষণের মামলায় এটা খুব পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে। এখনও এক তৃণমূল নেতা খোলাখুলিভাবে বলছেন যে এটা ধর্ষণের ব্যাপারই নয়, যৌনকর্মী ও তার খরিদ্দারের মধ্যে ঝামেলা। এই হাস্যকর কথার একমাত্র 'কারণ' এই যে মহিলাটি একটি বারে বেশ রাতে মদ্যপান করছিলেন।

অন্যভাবে বললে, তিনি একজন আদর্শ নারী নন। এক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড, কেমিক্যাল কাস্ট্রেশন বা এসব আইনি পদক্ষেপ নয়, আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নৈতিক শাস্তিদান ব্যবস্থাই ধর্ষিতা নারীটির ন্যায়বিচার পাওয়ার ভালো গ্যারান্টি।

২০১১ সালে আমাদের দেশে ২৪,২৪৬টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, আর শুধু পশ্চিমবঙ্গে ৯ হাজারের বেশি ধর্ষণের মামলা ঝুলে আছে। এর থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা— পুলিশ, অসামরিক প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার অবস্থা— বোঝা যায়। পুলিশ এফআইআর নিতে, সময়ে চার্জশিট ফাইল করতে অনিচ্ছুক, অনেকসময় তাদের ব্যবহার বৈরিতামূলক। ডাক্তারি পরীক্ষা সবসময় ঠিকমতো করা হয় না, তার ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়। মামলাগুলো চলে একেবারে শম্বুক গতিতে। আমরা আগেই বলেছি, এমনকি ভানওয়ারি দেবীর মামলার মতো বহুলপ্রচারিত মামলায়ও শুনানি চলেছে অতি দীর্ঘকাল ধরে। আর এখানে আমরা আবার লক্ষ্য করি যে শ্রেণী ও জাতপাত একমাত্র ব্যাপার না হলেও, মামলা কতদূর যাবে, কীভাবে চালানো হবে তার সাথে এর সম্পর্ক আছে। আমি এখানে জোর দিয়ে বলতে চাই যে, দিল্লীর ঘটনায়, পার্ক স্ট্রীটের ঘটনায় ছাত্ররা, তরুণতরুণীরা যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু আমরা চাই শ্রেণী, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব নারী যেন সমান সুরক্ষা পান। এর অর্থ, মধ্যবিত্ত নারীর মতো অসংগঠিত ক্ষেত্রের নারীর ধর্ষণ নিয়েও এমনই কড়া প্রচার চালাতে হবে। আর তাদের ওপর ক্রমাগত চাপ না দিয়ে গেলে মূলধারার পার্টিগুলো কিছু করবে না। পুলিশ, বিচারব্যবস্থাও করবে না।

এই চাপ তৈরি করতে হবে, সমাজতান্ত্রিক রণনীতির সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আজ আমরা দেখছি, নারীদের ওপর পাইকারি হারে আক্রমণ হচ্ছে। আর এসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, ইন্ডিয়ায় ধর্ষণ হয়, ভারতে হয় না। অর্থাৎ তা হয় পশ্চিমা শিক্ষিত নারীদের ওপর। তথ্য হিসাবে, এটি ভুল। কারণ মোট ধর্ষণের এক-চতুর্থাংশ হয় গ্রামে। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, এতে ধর্ষণের দায়টা চাপিয়ে দেওয়া হয় নারীর ঘাড়ে। তারাই অন্ধকারের পর বাইরে বেরিয়ে বা ভুলভাল পোষাক পড়ে ধর্ষণ ডেকে আনে। আর অবশ্যই হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম ও ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ হিসাবে যে ধর্ষণ চালায় সেটিকে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়। সেটা তো 'বদলা নেওয়া'।

আরেকজন, গডম্যান নামে পরিচিত আশারাম বাপু, তিনি বলেছেন যে একহাতে তো তালি বাজে না। অর্থাৎ, পুরুষই ধর্ষণ করে তা নয়, নারীটিরও দায়িত্ব আছে।

পরিবারের মধ্যে ধর্ষণ

কেমিক্যাল কাস্ট্রেশনের দাবি করা হচ্ছে এই যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে সত্যিকারের পুরুষমানুষরা নয়, বিকৃতকাম মানুষরাই ধর্ষণ করে। এই চিন্তার বিরোধিতা করা দরকার। ধর্ষণ কিন্তু যৌনতার বিষয় নয়। এটি পুরুষের ক্ষমতা প্রদর্শনের বিষয়। শাস্তি হিসাবে কাস্ট্রেশনের কথা ভাবা হয় এই ধারণা থেকে যে বাজে লোকদেরই তো শাস্তি দেওয়া হবে, তাহলে তাদের ধর্ষণ করার ক্ষমতাটাই কেড়ে নেওয়া হোক না কেন। দিল্লীর ধর্ষণের ঘটনায়, আগেই দেখিয়েছি, ধর্ষকরা ছিল নিচু শ্রেণীর। এখন এরকম একটা ধারণা চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আর মারাঠি উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজ ঠ্যাকারে বলেছেনও যে গরিব অভিবাসীরাই দোষী। দেখ, এই লোকগুলো যৌনক্ষুধায় ভোগে। তাই তারা ধর্ষণ করে। এভাবে শ্রেণী ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে লক্ষ্যবস্তু স্থির করা হয়, স্থির করা হয় কাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ।

জাতীয় অপরাধ রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ২০১১ সালে ২২,৫৪৯টি ক্ষেত্রে (২৪,২০৬টির মধ্যে, ৯৪ শতাংশ) ধর্ষিতারা ধর্ষণকারীদের চিনতো। পিতা বা পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরা জড়িত ছিল ১.২ শতাংশ ক্ষেত্রে (২৬৭)। প্রতিবেশীরা জড়িত ছিল ৩৪.৭ শতাংশ ক্ষেত্রে (৭৮৩৫)। আত্মীয়রা জড়িত ছিল ৬.৯ শতাংশ ক্ষেত্রে (১৫৬০)।'' তাই বলা যায়,

ধর্ষকরা আমাদের চারপাশে। যে সমাজ মহিলাদের মূল্য দেয় না সেই সমাজ তাদের তৈরি করেছে। আর 'টিপিক্যাল' ধর্ষক একটা বিভ্রম মাত্র। তাতে শ্রেণী-বর্ণ-সম্প্রদায়ের পছন্দমতো ছাপ মেরে দেওয়া যায়।

কিছু দাবি

এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার ফলে অন্যদের পাশাপাশি (মৈত্রী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগঠিত অনেক মহিলা) আমরাও কিছু দাবির তালিকা তৈরি করেছি। দাবিগুলির মধ্যে আছে:

প্রতিটি রাজ্যে প্রতিটি জেলার প্রতিটি মহকুমায় ফাস্ট ট্রাক কোর্টের মাধ্যমে ধর্ষণ কেসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধর্ষণ মামলার বিচার করতে হবে

ভৌগোলিকভাবে বা অন্যভাবে দুর্গম মহকুমায় যেখানো সেসন্‌স আদালত নেই সেখানে সেই আদালত প্রতিষ্ঠা করা। পাশাপাশি প্রতিটি মহকুমায় যৌন আক্রমণের বিচারের জন্য ফাস্ট ট্রাক্ট কোর্ট থাকা দরকার।

মাঝে মাঝেই সমস্ত স্থানীয় ভাষায় এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে যে, নারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত যৌন হিংসার মামলায় রাষ্ট্র আইনি প্রক্রিয়ার দায়িত্ব বহন করবে, যাতে করে এই হিংসার শিকার যারা, বিশেষ করে যারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর, তারা আইনি বিচার চাইতে পারে।

যৌন আক্রমণের শিকারদের যাতে একঘরে করে রাখা না হয় তার জন্য কোড অফ কনডাক্ট থাকা দরকার। মামলা চলাকালীন বা অন্য কোনো সময় কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, অন্য রাজনৈতিক নেতা, সরকারি চাকুরে বা সংবাদমাধ্যম যদি যৌন হিংসার শিকার যিনি তার চরিত্র হনন করে তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিচার করা উচিত।

পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাত কাটানোর জন্য পুলিশ ও বিচারকদের নিচের স্তর থেকে উপরের স্তর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নারীপুরুষ নির্বিশেষে জন্য লিঙ্গগত ও যৌন বিষয়ে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা আনার কর্মসূচি অবশ্য প্রয়োজনীয়, যাতে করে বিচারব্যবস্থা লিঙ্গ-বান্ধব হয়, যৌন হিংসার শিকারদের কলঙ্ক না থাকে।

নারী পুরুষ নির্বিশেষে পুলিশদের মানবাধিকার ও নারীর অধিকার নিয়ে কঠোর ট্রেনিং দিতে হবে। যে পুলিশরা অর্ধ-নারী, ট্রানস-নারী, ট্রানস-পুরুষদের ওপর যৌন আক্রমণ নিয়ে কাজ করবেন তাদের তো আরো কড়া ট্রেনিং প্রয়োজন।

সব স্তরের পুলিশ ও বিচারকদের লিঙ্গগত সংবেদনশীল করার কর্মসূচির মধ্যে থাকতে হবে বিকলাঙ্গতা নিয়ে একটি অংশ, যাতে করে পুলিশ ও বিচারকদের বিকলাঙ্গ নারী ও বালিকাদের অসুবিধা সম্পর্কে একটা ধারণা হয় ও সে সম্পর্কিত বিষয়ে সংবেদনশীলতা আসে, ব্যবস্থাটি বিকলাঙ্গ-বান্ধব হয়ে ওঠে, এ নিয়ে স্টিগমা কমে আসে, এদের প্রতি নঙর্থক মনোভাব ও উদাসীনতা কমে, তাদের ওপর যৌন হিংসার ঘটনায় ঠিকমতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কীভাবে আমরা এসব করব?

দিল্লীর প্রতিবাদ থামিয়ে দেওয়া হলো। প্রতিবাদকারীদের মাওবাদীদের সঙ্গে, সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তুলনা করা হলো। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভাষা ধার করে দিল্লীর পুলিশ কমিশনার তাদের ওপর আক্রমণকে বললেন— কোল্যাটারাল ড্যামেজ। রাষ্ট্রের এই শ্রেণীগত দিকটাকে যে আছে সেটা যদি আমরা না বুঝি তাতে তা চলে যাবে না, আমরা শুধু নিজেদের ভুল বোঝাবো। আমরা অবশ্যই সংস্কার চাইতে পারি। কিন্তু সংস্কারের মাধ্যমে আমরা একটা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ পাব এরকম বিভ্রান্তিতে যেন আমরা না ভুগি। সংস্কার পেতে হলে আমাদের রাস্তায় নামতে হবে, আরো লোককে নামাতে হবে, লড়াই করতে হবে। ভার্মা কমিশন কেন এখন তৈরি করা হলো। এনসিআরবি-র তথ্য আগে থেকেই রাষ্ট্রের কাছে আছে। বছরে কতগুলি ধর্ষণ ঘটে সেটা ওরা আমাদের চেয়ে ভালো জানে। কিন্তু তাতে ওরা কিছু করে নি, এখন করলো। তার কারণ, বিপুল জনতা পথে নেমেছে। আমরা যদি পরিকল্পিতভাবে আন্দোলন না করি, যদি ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাই, কিংবা দিল্লীর মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে গেলে, ধর্ষকের ফাঁসি হয়ে গেলে খুশি হয়ে ফিরে যাই, দিল্লীর অন্য ৫৭১টি ধর্ষণের ঘটনা ভুলে যাই, ভুলে যাই পশ্চিমবঙ্গের ৯০০০টি ঝুলে থাকা মামলার কথা, তাহলে দীর্ঘকালীন বিচারে ভালো কিছু পাওয়া যাবে না।

মীনা কান্দাসামি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, "ধর্ষণের মামলায় অনেক বিচারকই এমন ব্যবহার করেন যেন তাঁরা খাপ পঞ্চায়েত প্রধানদেরই এক অবতার। দু বছর আগে একটি নাবালিকার গণধর্ষণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এইচ এস বেদি ও জে এম পাঞ্চাল বলেন, "অভিযোগকারী যে সবসময় পুরো ঘটনাটির সত্য বিবরণ দেবে এটা ধরে নেওয়া যায় না"। ঐ বেঞ্চ নির্লজ্জের মতো বলেন, "ধর্ষণের মামলায় অভিযোগকারীর সাক্ষ্যকে নির্জলা সত্য বলে ধরা যায় না।" বিচারকদের মনের এই সন্দেহ আর এক ধরনের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। ব্যবস্থা আপনাকে বলছে, খুলে বললে আপনার মর্যাদাহানি হতে পারে, কারণ আপনার কথা বিশ্বাস করা হবে না। শুধু ধর্ষকরাই বিকৃতকাম, এমনটা ভাবলে এই ব্যবস্থা যা ধর্ষক তৈরি করে, তার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসাবে ধর্ষণকে উৎসাহ দেয়, সেই ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করা হয়। এই সংগ্রামকে আমাদের মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামের, আরও ভালো সামাজিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামের অংশ করে তুলতে হবে।

২০১২ সালের ডিসেম্বর ও ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লীর ধর্ষণ কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আলোচনা ও বক্তৃতা থেকে এই লেখাটি তৈরি করা হয়েছে। ফলে ঐ সব আলোচনা ও বিতর্কের ছাপ পড়েছে লেখাটিতে।

লেখাটি র‍্যাডিক্যাল সোশালিস্ট ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া। অনুবাদ আমাদের।